শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—

সুহৃদ্বরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

কানাগলির কাহিনী (উপন্যাস)

বাংলা উপন্যাসের ধারা (আলোচনা)

ভূমিকা

যাদের জীবন নিয়ে এ বইখানা লেখা, তাদের জীবনের কথা লেখার অধিকার আমার আছে কিনা জানি না। কারণ, আমি তাদের একজন নই; তাদের অন্তরের মর্মমূলে প্রবেশের দ্বার আমার কাছে রুদ্ধ। তবু আমার বিশ্বাস যে-সব ক্ষেত্রে সাহসের সঙ্গে অনধিকার-চর্চা করা চলতে পারে, এটি তার মধ্যে একটি। যাদের অস্তিত্বের উপর এ-দেশের অস্তিত্ব নির্ভর করে, আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি দিয়ে তাদের জীবনকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করা উচিত নয় কি ?

যাদের নিয়ে এ-বই লেখা এ-বই তারা কোনদিন পড়বে না। যে-দিন বই পড়ার যোগ্যতা তাদের হবে, সেদিন তারা নিজেদের কথা নিজেরাই লিখে নিতে পারবে।

যাঁদের জন্য এ-বই লিখেছি, তাঁদের অনেকের হয়তো মনে হবে, এ-বই-এর ভাষা অত্যন্ত বেশী সাদাসিধে আর অনাড়ম্বর; আবার অনেকের হয়তো মনে হবে, বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষা যথেষ্ট সাদাসিধে নয়। এ বিষয়ে কোন মান নির্দিষ্ট করা খুব দুরূহ কাজ। আমার চরিত্ররা বাস্তবে যে ভাবে কথা বলে আমি তা' আংশিকভাবে অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে-ভাষায় তারা চিন্তা করে, যে-শব্দ যে অর্থে তারা ব্যবহার করে, তা অনুমান করা খুব শক্ত; তা তাদেরই ভাষায় প্রকাশ করা আরও শক্ত। যে-কাজটা করা সম্ভব, সেটা হল তাদের মনের ভাষাকে আমাদের চেনা ভাষায় অনুবাদ করা কাজেই যদি কোথাও কোন পাঠকের আশঙ্কা হয় এইভাবে ওরা চিন্তা করতে পারে কিনা, তবে তাঁকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করব যে, এ কৃত্রিমতাটুকু আসলে অনুবাদের অপরিহার্য ত্রুটি।

এ বই-এ অনেকে হয়তো লেখকের নীতিজ্ঞানের দারুণ অভাব দেখে শঙ্কিত, দুঃখিত ও মর্মাহত হবেন। তাঁদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে স্থান-কাল-নিরপেক্ষ কোন আদর্শ সমাজ-নীতি আছে বলে আমার জানা নেই। প্রত্যেক মনুষ্য গোষ্ঠীই সচেতন বা অচেতন ভাবে তাদের জীবন যাত্রার প্রয়োজন

অনুযায়ী সমাজ-নীতি নির্ধারণ করতে চেষ্টা করে। সমাজের উপর-তল হয়তো তাদের উপর ভিন্ন কোন নীতি-বোধ চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তখন সংঘাত বাধে।

এ-সবই সুবিখ্যি আমার নিজের মত। বলছি এই জন্য যে এ-বই পড়তে পড়তে পাঠকের যদি খুব খারাপ লাগে তো তিনি অন্ততঃ এ কথা ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারবেন যে তাঁকে দুঃখ দেওয়া লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না।

আর এক কথা। এ বই-এর সমস্ত চরিত্র ও ঘটনাই কাল্পনিক, কিন্তু আজগুবি নয়। যা আমি দেখিনি, বা যা দৃষ্ট-বস্তুর থেকে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় না, তেমন কোন জিনিস নিছক কল্পনা করতে ভাল লাগে বলেই আমি সংযোজন করিনি। বই-এর চরিত্রদের ধ্যান ধারণা, অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতাজাত সিদ্ধান্ত,—সবই তাদের নিজস্ব। কোন চরিত্রের পিছনে লেখকের মতামত লুকিয়ে আছে এ-কথা ধরে নিয়ে লেখকের প্রতি অবিচার না করতে অনুরোধ জানাই।

কলকাতা—২২-৩-'৫৮

অচ্যুত গোস্বামী

সেই পুরোনো গল্প,—এক যে ছিল গ্রাম। অনুমান হয়, কবিরা গ্রামের যেমন বর্ণনা দেন, সে-গ্রামটা তেমনি ছিল। সন্ধ্যা-বেলা দোয়েল-শ্যামা-কোকিলের ডাক, আমের মুকুলের গন্ধ, এ-সব ছিল। পথে পথে হাতখানেক পুরু হয়ে বিছিয়ে থাকত শিউলী-বকুলের ঝরা ফুল, তাতে কাজের লোকদের পথ চলতে খুবই অসুবিধা হত। এই বর্ণনার পরে অবিশ্যি ফুট্‌কি দিয়ে পাতার নিচে ডেরা কেটে লিখতে হয়, সেই গ্রামে আরও ছিল মশার ঘুমপাড়ানি গান, বাগানে বাগানে ছিল মনুষ্য-পুরীষের নাক-ঝাঁঝানো মদির সুবাস। এ সবই অনুমান করা যায় মাত্র, চোখে দেখার উপায় নেই।

গ্রামটা ছিল সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলের নোনা-জলের খালের পাড়ে। গ্রামের চাষীদের উপর নোনা-জলের একবার দয়া হয়েছিল। বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল বৃষ্টিতে আর জোয়ারের ধাক্কায়, আর নোনাজল পড়েছিল ঢুকে। সেই থেকে গ্রামটা রয়েছে নোনাজলের তলায়। রাতের বেলা জল দিয়ে হেঁটে গেলে পায়ে পায়ে আগুন গড়িয়ে চলে।

নোনাজল ঢোকায় চাষীরা কান্নাকাটা করেছিল, কিন্তু হতাশ হয়নি। জমিদার অভয় দিয়ে বলেছিলেন, 'তাতে কী হয়েছে? আসুক শীতকাল। দোব বাঁধ মেরামত করে।'

সেবারের শীতকালে কিন্তু জমিদার বাঁধ মেরামত করার সময় পেলেন না। তাঁর আপন বোনের সাক্ষাৎ খুড়তুত দেওরের ভায়রাভাই-এর জ্যাঠতুত শ্যালকের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল এত বড় ব্যাপারে তিনি উপস্থিত না থেকে পারলেন না। এমনি কপাল, পরের বছরও ঠিক সময় মত একটা প্রতিবন্ধক এসে উপস্থিত হল। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আপন শ্যালকের বৌদির নিজের বোনের মেয়ের পুতুলের বিয়েতে তিনি আট্‌কা পড়ে গেলেন। অবিশ্য আট্‌কা পড়েছিলেন পুতুলের

বিয়েতেই, না পুতুলের হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, তা কর্মচারীরা ঠিক করে বলতে পারল না।

তৃতীয় বছর জমিদারের বুদ্ধির গোড়ায় জল গেল। বজ্জাত চাষীরা প্রতি বছর তাঁর কাছে ধর্ণা দিয়ে বলছে, তারা অন্নের অভাবে মরে যাচ্ছে। তিনি খবর নিয়ে জানলেন, দুটো চারটে মরছে ঠিকই, কিন্তু এতদিনেও গাঁয়ের সব লোক মরে সাফ হয়ে যাচ্ছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন, গাঁয়ের লোকেরা তাঁকে ফাঁকি দিয়ে বাঁধ মেরামত করিয়ে নিতে চায়। রেগে আগুন হয়ে তিনি কর্মচারীদের দিয়ে বলে পাঠালেন, বাঁধ-টাধ মেরামত করা হবে না। যদি দেখা যায়, এর পর থেকে লোক মরার হিড়িক বেড়েছে, তো তিনি বুঝবেন, তার মধ্যেও বজ্জাতদের মতলব আছে।

বাঁধ মেরামতের টাকাটা দিয়ে তিনি ঘোড়ার উপর বাজী রাখলেন। আঁক কষে দেখলেন, তাতে তিনি সত্ত্ব সত্ত্ব অনেক বেশী ফল পাবেন।

আরও বছর পাঁচ ছ' কাটল। জমিদারের অনুমানই ঠিক হল। অনেক চাষী মতলব করে তাঁর মনে বিবেক দংশনের ক্ষত সৃষ্টি করার মতলব নিয়ে টেঁসে গেল। তাঁর উপর অভিমান করে' অনেকে গাঁ ছেড়ে পালিয়েও গেল, যেমন স্ত্রীরা বাপের বাড়ী যায় স্বামীদের উপর অভিমান করে। তবু তিনি টললেন না এতটুকু। মন লোহার মত শক্ত না হলে কি আর এত বড় জমিদাবী শাসন করা যায়?

তখন একদিন গাঙের পাড়ে একখানা নৌকা এসে ভিড়ল। আর নৌকা থেকে নামলেন অল্পবয়সী একটি মানুষ। তাদের মতই কালো, কিন্তু মুখখানা একটু বেশী চকচকে। পোযাক-পরিচ্ছদ সাধারণ, কিন্তু একটু বেশী পরিচ্ছন্ন। তাদের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর করে কথা বলেন; আর কথার মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

মুখে মুখে দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে কথাটা রটনা হয়ে গেল যে ইনিই এ-অঞ্চলের নতুন জমিদার। আগের জমিদার ছেলেপুলে না রেখে মারা গিয়েছেন; আর

উত্তরাধিকার আইনের কোন্ এক রন্ধ্র-পথ দিয়ে দূরসম্পর্কের আত্মীয় ইনি তাঁর খালি জুতোটার মধ্যে পা গলিয়ে দিয়েছেন।

শশাটা, কলাটা, মূলোটা, যে যা পারল, দর্শনী নিয়ে এসে নতুন জমিদারের চারপাশে ভীড় করে দাঁড়ালো। দর্শনীগুলো দেখে জমিদার ব্যাঙ্গ করে বললেন 'তোরা তো বেশ লোক রে! নৌকার মাঝি যদি নিতে রাজী হয়, তো আমার গরুগুলোর একবারের নাস্তা হয়ে যাবে।'

তারা হাতজোড় করে কাতরভাবে বলল, 'আজ্ঞে বাবু, মোরা মোটা লজরও দিতে জানি। মোদের বাঁধটা মেরামত করে দিন।'

জমিদার ঘাড় নেড়ে হেসে বললেন, 'তা হয় না রে। এখানে ফিসারি হবে। মাছের অভাবে কোলকাতার লোকেরা মাংস চিবুতে গিয়ে দাঁত ভেঙে ফেলছে। তাদের মাছ দিতে হবে। তবে তোদের আমি উপকার করতে পারি। নিবি?'

'হুজুর মা বাপ!'

'না—রে। উপকার করার লোক অনেক পাওয়া যায়; উপকার নিতে পারে এমন লোকের বড় অভাব। তোরা ভেবে দ্যাখ্।'

অনেক ভেবে-চিন্তেও তারা উপকার না নেওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেল না।

অতএব একদিন তারা পৈতৃক বাসভূমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল কাঞ্চন মণ্ডলের সঙ্গে, আর বাসা বাঁধল তাঁরই দেওয়া একখণ্ড জমির উপর, বেতুই গাঁয়ে। সে আজ প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা।

জমিদার বললেন, 'সুন্দরবনে হঠাৎ হাজার পাঁচেক বিঘে জমি পেয়েছি বলেই ভাবিস্নে যে আমি জমিদার। ঐটুকুন্ জমিতে কি জমিদার হওয়া চলে? আমিও তোদের মত চাষীর ছেলে। আমার বাপ লাঙল চষত। তবে আমি যে জমিদার হব তাতে কোন সন্দেহ নেই। এইখানটায় লেখা আছে।' .গাঁ

বলে নিজের কপালটা দেখিয়ে দিলেন। আবার বললেন, 'তোদের উপ: দেখে করব বলেছিলাম, না? জানিস্, উপকার পেতে হলে উপকার দিতে হয়?' কালে

তারা জানত না, কিন্তু তাদের জানতে হল। তাদের সাহায্যে বর্ধিষ্ণু ইন্দ্রের ছেলে কাঞ্চন মণ্ডল ডাকসাইটে জমিদার কাঞ্চন রায়ে পরিণত হলেন

হয়ে তারা অনেক খুন করল, অজস্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুট-তরাজ, জবরদখল, প্রভৃতি একটানা চালিয়ে গেল বিশ পঁচিশ বছর ধরে। বাকিটুকু কাঞ্চন রায় নিজেই করলেন। দলিল-দস্তাবেজ জাল করা, মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করা, জায়গামত ঘুষ দেওয়া ইত্যাদি।

তারপর জমিদার বললেন, 'তোদের জন্য কি জমিদারী হয়েছে, বোকার দল? জমিদারী হয়েছে এইটের জোরে।' বলে নিজের মাথাটা দেখিয়ে দিলেন।

'তবে তোদের যা বলেছি তা দোব। মরার আগে জমি-টমি দিয়ে তোদের চাষী হিসেবে স্থিতু করে রেখে যাব। আর ক'দিন সবুর কর্।'

জমিদারী সম্প্রসারণ কিন্তু একসময় হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ইংরেজ বাহাদুর একসময় তাঁর সরকারী কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হলেন। এ অঞ্চলের অরাজকতা দূর করার জন্য কালো-মুখো পুলিসের বদলে লাল-মুখো সার্জেণ্ট পাঠালেন। তখন হঠাৎ কাঞ্চন রায়ের মনেও ধর্মভাব জেগে উঠল। মানুষকে খন একদিন মরতেই হবে, তখন জমি-জমি করে হা-পিত্যেশ করে দুর্লভ মানব-জনমটা অপচয় করাটা কি ঠিক? মরে যাওয়ার পরে মাটী তো সংগে নিয়ে যাওয়া যাবে না! তখন তো যেতে হবে খালি হাতে, খালি গায়ে। এমন-কি পরণের কাপড়খানাও তো ফেলে রেখে যেতে হবে।

জমির উপর মায়া কমে গেল বলে তাদের জমি দেওয়ার কথাটা তাঁর এখন আরও কম মনে পড়তে লাগল। এমনি করে এল যুদ্ধ এবং তেরশো পঞ্চাশ। কিছুদিনের জন্য তাদের এ-অঞ্চলটা ছেড়েই চলে যেতে হয়েছিল। যারা একজন সাধারণ লোককে জমিদার বানিয়ে দিয়েছিল, তাদের অনেকেই মরল পথে পথে, তাদের খেতে পেয়ে। অনেকে দূরে পালিয়ে গেল, আর ফিরে এল না। প্রত্যয়ে বন থেকে যারা এসেছিল, তাদের দু-চারজন মাত্র টিকে রইল। মুখে রইল তাদের ছেলেরা,—বিশ, ত্রিশ, কি জোর জন চল্লিশেক। নতুন জমিদ ছেলেদের বৌরা, আর যারা এই সেদিন পৃথিবীতে এল, একপাল ...ীর দল।

বেতুই গাঁয়ে তাদের তিনপুরুষ চলছে, এখনো তারা জমির স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু এসব তো গেল আগের কথা। এবার তবে গল্পটা বলছি, শুনুন।

এক

আট দশ দিন ধরে সমানে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের দিকে তাকালে মনেও হয় না যে বৃষ্টি কোনদিন থামবে। আকাশ যেন ফুটো হয়ে গিয়েছে। ফুটো মেরামত করবে এমন মিস্ত্রির অভাব ঘটেছে স্বর্গে।

এ বছর বর্ষা সুরু হয়েছে অনেক দেরীতে, ভাদ্রমাস পড়লে। সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে কয়েক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এতদিন পর্যন্ত আকাশ থেকে সমানে আগুন ঝরছে। জমিদার আর মহাজন আর বড় বড় কারবারীরা তো এখনো একটানা বলে চলেছে, এ বছর সব মাটী হল, বছরটা বড় খারাপ যাবে। খুব খারাপ যে কেন যাবে বলরামেরা ঠিক বুঝতে পারছে না। এ ক'দিনের বৃষ্টিতেই রোয়া ধানগুলো বেশ ছোপ নিয়ে উঠেছে। বৃষ্টির পরিমাণ যথেষ্ট হলে মাছও খুব যে খারাপ হবে, তা নয়। কথাটা ভাল করে জানার জন্য বলরামরা ভাগবত কাকার কাছেও গিয়েছিল। শনি থেকে মঙ্গল পর্যন্ত সব ক'টা গ্রহের নাম করে ভাগবত কাকা যা বলেছে, তার অর্থ এরকম ওরকম দুইই হতে পারে। কাজেই বছরটা ভাল যাবে কিনা সে-বিষয়ে মনে সন্দেহ রয়ে গিয়েছে।

দু' পাশে জল, মাঝখানের একটা সরু বাঁধ ধরে বলরাম চলছিল। লম্বা চওড়া চেহারা বলরামের, মুখখানা বড় আর ভরাট। তবে চোখ-জোড়া ছোট ছোট, আর নাকটা একটু ভোঁতা। একটু রাগী রাগী মনে হয়, কিন্তু আসলে সে রাগী নয়। খাটো করে কাপড় পরেছে, আদুল গা। বৃষ্টিটা একটু জোরে এল দেখে বলরাম কোমর থেকে গামছাটা খুলে নিয়ে মাথায় জড়িয়ে নিল। বর্ষাকালে রাত্রিবেলা মাথাটা ভিজে থাকলে সর্দি লাগতে পারে। বৃষ্টির জোর দেখে ইন্দ্রের কথা মনে পড়ল।

শাস্ত্রে আছে, ইন্দ্রদেবের ঘড়া ভর্তি নাকি জল থাকে। ইন্দ্রের হাতী, যার নাম ঐরাবত, সেই জল শুঁড় দিয়ে টেনে নিয়ে ছিটাতে থাকে। তাইতেই বৃষ্টি নামে। কথাটা সত্যি কিনা জানার উপায় নেই। শাদা চোখে অবিশ্যি দেখা যায় জল থেকে মেঘ হয়, মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে বাতাস, তারপর কড়াৎ কড়াৎ বিদ্যুৎ গর্জায় আর বৃষ্টি নামে। কিন্তু তাই বলে দেবতার কথাটা অবিশ্বাস করাটা ঠিক নয়। বৃষ্টি দেবতার কাজ যদি না-ও হয়, তবু বিশ্বাস করলে ক্ষতি নেই। আর যদি সত্যিই বৃষ্টিটা দেবতার কাজ হয়, আর কেউ সেটা অবিশ্বাস করে, তবে দেবতা রাগ করবেন। ভীষণ রাগ করবেন। কাজেই বিশ্বাস করাটাই ভালো, বিশ্বাস করাটাই নিরাপদ।

বাঁধ থেকে নেমে জলে পায়ের কাদা ধুয়ে বলরাম আলা-ঘরে, মানে ভেড়ীর অফিস ঘরে, উঠল। দেখল, ম্যানেজার সটান শুয়ে আছেন। তা তো থাকবেনই। আয়েসী লোক এতক্ষণ অবধি বসে থাকবেন কেন বৃষ্টির গানের আমেজটা নষ্ট করে?

জায়গাটা জলকর অঞ্চল। গড়িয়া ষ্টেসনের পশ্চিম দিকে শহর, পুব দিকে পাড়াগাঁ। পুব-উত্তর কোণ ধরে মাইল দুই-তিন এগিয়ে এলে বেতুইওয়াড়া ভেড়ী পড়ে, সেখানে বলরাম কাজ করে। আশে-পাশে আরও অনেক ভেড়ী আছে; চলে গিয়েছে একেবারে ক্যানিং অবধি; তারপর ক্যানিং ছাড়িয়ে সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'বলরাম এলি? দে তো হাত পা-টা একটু টিপে দে। কেমন ব্যথা ব্যথা বোধ হচ্ছে যেন।'

'সারাদিন ঘরে বসে থেকেও আপনার গায়ে বেথা হল মানজারবাবু? মোরা তো চৌপর দিন খাটতেছি তবু বেথা হয়নিকো।'

'তোরা আর আমরা কি এক নাকি?' ম্যানেজার রেগে বললেন।

বলরাম ম্যানেজারের একখানা পা কোলের উপর তুলে নিয়ে টিপতে সুরু করল। আর সময় কাটানোর জন্য আরম্ভ করল একটা গল্প।

রাত প্রায় এক পহর হয়েছে। টিম্‌টিম করে লণ্ঠন জ্বলছে ঘরে। চিমনিটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এর মধ্যেই প্রায় কালো হয়ে এসেছে।

ঘরে একরাশ জিনিসপত্র। রান্নাঘরটা একই সঙ্গে বলে রান্নার বাসন-কোশন আর কারবারের খাতা-পত্তর সবই অল্প জায়গার মধ্যে ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে।

ম্যানেজারের বিছানাটা তেল-চিটচিটে। কি আর করবেন—কপাল-দোষে আঘাটায় এসে পড়েছেন! এখানে তাঁর দরকারমত আরামের ব্যবস্থা আর কে করে?

পরনের কাপড়খানা যথাসম্ভব উঁচুতে তুলে দিলেন গণেশবাবু, বলরামের যাতে পা টেপার সুবিধা হয়।

বলরাম আপন মনে বলে চলেছে, 'তা'পরে বুঝলেন মান্‌জারবাবু, তিরিশ বিঘে জমির উপর সেই পেকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীর সামনে বাগান। তার সামনে পেকাণ্ড মাঠের মধ্যি বসেছে যাত্রাগানের আসর। দশ হাজার লোক শুনতেছে চুপচাপ। ছুঁচটা ফেল্‌লেও টের পাওয়া যায়, এত চুপ সকলে। এর মধ্যি কত্তাবাবু এসে ডাঁড়ালেন। কী চেহারা—যেন সাক্ষেৎ মহাদেব। ধবধবে গৌরবন্ন। পরনে গরদের ধুতি। গলায় পৈতে। সারাদিন পূজো করেছেন। এই দশ হাজার মুনিষকে নিজ হাতে নতুন কোড়া কাপড় বিইলেছেন। খেইয়েছেন নিজে দেখে শুনে। কত্তাবাবুর পেটে কিন্তুক জলের ফোঁটাটিও পড়েনিকো। রাত ইদিগে দশটা। বুঝলেন মান্‌জারবাবু, জমিদার বলে এঁকে।'

উত্তরে গণেশবাবু বললেন, 'হাত একটু আস্তে চালা রে বাবা বলরাম। শেষে পায়ে ব্যথা ধরে গেলে ওষুধ পাব কোথায় এই পাণ্ডববর্জিত দেশে?'

'তবে এবার হাতে দি?'

কিন্তু পায়ে এদিকে বেশ সুড়সুড়ি লাগছে গণেশবাবুর।

'না—না। পায়েই দে। পায়েই চিবুনিটা বেশী কিনা। তবে আর একটু আস্তে।'

'তা'পর, শুনুন মান্‌জারবাবু। কী আশ্চয্যি ব্যাপার! কত্তাবাবু ঠায় ডেঁইড়ে আছেন। পেছন থেকে হাত ধরে টান্‌তেছে বাবুর ছোট্ট মেয়ে। টুকটুকে নক্ষীটি যেন। মানে, খেতে ডাক্‌তেছে। বাবু কিন্তুক গেলেন নিকো। তাঁর যেতে মন লিচ্ছে না; মন বলতেছে, কী যেন একটা বেঘাত ঘটেছে।

ঘুরতে লাগলেন, উদিগ থেকে ইদিগ। শেষে এসে দাঁড়ালেন এক বামুভনের সামনে। বামুভনের শিন্ন চেহারা, গাযে বস্‌তর নেই, খড়ি উড়ছেছে। বাবুকে দেখে বামুভন তো ভয়ে জুবু-থুবু। কত্তাবাবু মিষ্টিগলায় জিজ্ঞেস করলেন, "বামুভন, তুমি খেয়েছ ?"

বামভন ভয়ে ভয়ে হাতজোড় করে বলে, "খেয়েছি বাবু।"

বাবু বললেন, "সত্যি করে বল। কোন ভয় নেই।"

"বাবু, আমি তিন দিনের উপোষী।"

আর কি! তখুনি আদেশ হয়ে গেল। কর্মচারীরা ভয়ে অজ্ঞান। দশহাজার লোকের মধ্যি কেউ বাদ গেলনি, বামুভন বাদ গেল কি করে? তা'পর কত যত্ন বামুভনকে! খাওয়ান হল, কাপড় দেওয়া হল, মেয়ের বিয়ের জন্যি টাকা দেওয়া হল। আচ্ছা বলুন তো মান্‌জারবাবু, সেই দশহাজার লোকের মধ্যি কত্তাবাবু বুঝলেন কি করে যে বামুভন খাযনিকো?'

গণেশবাবু আর পারছিলেন না। এবার পাশ ফিরে শুয়ে একটা হাই তুলে বললেন, 'বুঝেছিলেন, না হাতী। এবারে হাতটাই একটু টিপে দাও তো বাছাধন।'

গণেশবাবু ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। হাতখানাকে টেনে এনে নিজের তলপেটের সঙ্গে লাগিযে নিল বলরাম। গণেশবাবুর আগের কথার প্রতিবাদের ঝোঁকে হাতে একটু চাপ দিল। গণেশবাবু ক্যাঁক্ করে উঠলেন।

বলরাম বলল, 'আপনি তো দ্যাখেননি সেই জমিদারকে, তাই এমন বল্‌তেছেন। আমি যে নিজের চোকে দেখেছি। বাগাঘাটের কাছে তাঁর বাড়ী। আহা! কী সুখেই ছিলাম সেখানে!'

'তবে আবার ফিরে এলে কেন এমন আঘাটায?'

'এসেছি কি সাধে। বাপ বেঁচে ছেল ত্যাখন। কিছুতে ছাড়লনি। তাই চলে এলাম।'

এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে মাথায় একটা চুপড়ি বসিয়ে বার-তেরো বছরের একটি ছেলে আলায় এসে ঢুকল।

'কি রে কাঁঠাল?' বলরাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'মাম্মা ডাকতেছে তোমাকে, বলাকাকা।'

'ক্যানে রে?'

'জানিনি।'

মামা মানে অটবী। জানিনি মানে জানে, কিন্তু বলবে না; কান মলে মেড়া বানাতে হয় আজকালকার দিনের ইঁচোড়ে পক্ক ভেঁপো ছোঁড়াগুলোকে।

'মান্‌জারবাবু, যাচ্ছি তবে।'

'যাচ্ছ? কেন?'

'গাঁয়ের নোকেরা ডাকতে নেগেছে। একবারে ঐ পথেই ছপ্‌পরে চলে যাব। মুগুরি টেইঙে দিচ্ছি, ঘুইমে থাকুন।'

ছপ্‌পর হল, ভেড়ীর মধ্যে পাহারা দেওয়ার জন্য চালা তুলে রাখা হয়, সেগুলো। মশারি, বিছানা সব ঠিকঠাক করে দিয়ে বলরাম বলল, 'লাইটটা দিন বাবু। যাচ্ছি এবারে।'

ম্যানেজারবাবুর মন খারাপ হয়ে গেছে। বাইরে অঝোরে টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। এর মধ্যে গা-টেপাটা নেহাৎ মন্দ লাগছিল না। কোলকাতার বাড়ীতে থাকলে এতক্ষণ বাড়ীর মেয়েরা কত আরামের ব্যবস্থা করে দিত। এখানে পুরুষ মানুষের রুক্ষ হাতের ছোঁয়া, তাও দুর্লভ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

'টর্চ? না, টর্চ পাবিনা আজকে। যে সাপ দেখেছি আজকে আলা ঘরের মধ্যে! বাপ্‌রে! অমনি যা বাবা, অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে বেশ পথ দেখতে পাবি।'

সত্যি আজ বিকেলে আলা ঘরের চালায় একটা সাপ উঠেছিল ইঁদুর ধরতে। গণেশবাবু মারার জন্য জিদ ধরেছিলেন। মেটে সাপ বলে ওরা মারতে রাজী হয়নি। মেটে সাপ নাকি বাস্তু সাপ—মারে না।

বলরাম বালিশের তলা থেকে টর্চটা টেনে নিয়ে বলল, 'ঘরের মধ্যি মুগুরির তলায় শুয়ে বাবুর সাপের ভয়! আর রাত-ভোর বাঁধের উপর দিয়ে চলব, মোদের সাপের ভয় নেই!'

বলরাম বেরিয়ে গেল। ম্যানেজার মনে মনে ভাবলেন, আচ্ছা, এর শোধ তুলব পরে।

ভেড়ীর মাঝখান দিয়ে আলার থেকে বরাবর একটা বাঁধ সোজা গিয়ে ঢুকেছে গাঁয়ের মধ্যে। এ বাঁধটা সরু, কাদায় ভর্তি, দু'পাশে ঘন হোগলার বন। আবার আলার থেকে দক্ষিণের বাঁধ ধরে পূবের বাঁধে পড়ে ভেড়ীটার অনেকটা অংশ প্রদক্ষিণ করেও গাঁয়ে ঢোকা যায়। বলরাম সোজা রাস্তা ধরল।

গাঁয়ে ঢুকতে প্রথমেই মোড়লের বাড়ী। অন্ধকার। মোড়ল বোধ করি এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। পরের বাড়ীটাই অটবীর। অটবীর ছোট্ট ঘরখানায় আটদশ জন লোক ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে।

'ডেকেছিস কেন রে অটবী?' বলরাম কাছে এসে জিজ্ঞেস করল।

একটু বেঁটে, কিন্তু চওড়া তাগড়াই চেহারা অটবীর। এ গাঁয়ে শারীরিক শক্তিতে সেই বলরামের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। কাজেও সে কম পটু নয়। দু'জনের মুখ কিন্তু দুরকমের। বলরামের মুখ লম্বা, গম্ভীর। অটবীর মুখ গোল, বিস্তৃত ঠোঁটে এক টুকরো চাপা হাসি যেন লেগেই আছে। যেন বিদ্রূপ করছে সব-কিছুকে।

'ডেকেছি?—ও, হ্যাঁ,—আমরা বেরুচ্ছি কিনা আজ রেতে, তাই ডেকেছি। সাথে যাবে তো তৈরী হয়ে নাও।'

এই কথা যে বলবে তা বলরামের আগেই জানা। তবু বলার ধরণ দেখে পিত্তি জ্বলে গেল। কোনরকমে রাগ সামলিয়ে বলল, 'জানিস্ নে পরের চাকরি করি? বাঁধে ডিউটি দিতে হবে সারা রাত। তবু ইসব ঠাট্টা মস্করার মানে কি?'

'মানে আবার কি? মুনিষের মন জানব কি করে বল? একসময়ে ভয়ে একটা কাজে না গেলেও আর একসময় তো সাহস করে যেতে পারে। না কি বল যজ্ঞেশ্বরকা'?'

অনেক দূরে জড়ো-সড়ো হয়ে বসা যজ্ঞেশ্বরকাকা কি বললেন বোঝা গেল না।

বলরাম আরও রেগে বলল, 'ও-সব বলে মোকে চটাতে পারবে না।

তোমাদের চুরি-চামারির মধ্যি আমি নেই। য্যাতই চুরি কর, মাটির ঘর পাকা ঘর হবেনি কোনদিন।'

'তা ঠিক। ইসব কাজে বড় ঝুঁকি। পাণটা যেতে পারে যে কোন সময়ে।'

একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলরাম আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

অটবীর সঙ্গে কথা বলার সময় অত রাগ দেখালো বলরাম। কিন্তু বেরিয়ে এসে সে যখন বাঁধ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে একটা গানের কলি ভাজছে। আসলে বলরাম মোটেই রাগেনি। অত সহজে রাগ তার হয় না; রাগ কখনো হলেও রাগ সে সামলিয়ে চলতে জানে। তবে রাগ সে মাঝে মাঝে দেখায় বৈকি? সেইজন্যই লোকের ধারণা সে একটু বদরাগী মানুষ। তা লোকের মনে এরকম একটু ধারণা না থাকলে লোকে তাকে মান্য করবে কেন? বলতে গেলে এ-গাঁয়ের প্রধান লোক তো বলরামই। অটবী তো সেদিনের ছোকড়া: তাকে তো সে গণনার মধ্যেই আনে না। এমন কি গাঁয়ের মোড়ল সুধন্যও তো নামেই মোড়ল; গুণের বিচারে তার কাছে সুধন্য কিছুই নয়।

সে চুরি করে না বলে ওরা চোরের দল তাকে পাঁচ কথা শোনায়। শুনাক না। যার যার কর্মফল তাই নিয়েই তাকে মৃত্যুর পর যমরাজের কাছে যেতে হবে। চুরিটা করে তারা যে পাপ কোরছে, বলরাম তা বয়ে নিয়ে যাবে না। আবার চুরি না করে বলরাম যে পুণ্য কোরছে তাও ওরা কেড়ে নিতে পারবেনা। তবে আর ভাবনার কী আছে?

ঘটনাটা হল, অটবীরা আজকে দল বেঁধে মাছ চুরি করতে যাবে কোন এক ভেড়ীতে। ওদের কাছে এটা এমন কিছু একটা নতুন কাজ নয়। আর তারা মাত্র অল্প ক'ঘর বাসিন্দা বলে এসব কাজ সাধারণতঃ সবাই মিলে মিশে করে। যারা সমর্থ তারা আসল বিপজ্জনক কাজে যায়, অন্যেরা অন্যভাবে সাহায্য করে। এমনকি মেয়েরা খুব ভোরে উঠে যাবে সেই মাছ বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে। সবাই মিলে এ কাজ করে বলে তারা বলরামকেও ডেকেছিল কর্তব্য হিসাবে। যদিও সবাই জানে, বলরাম বহুদিন থেকেই এ ব্যাপারে নিরুৎসাহী। বিশেষ

করে ঘরের কাছের ভেড়ীতে বাঁধা মাইনের চাকরি পাওয়ার পর থেকে এ কাজ সে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।

রাত এখনো বেশী হয়নি। সোজাসুজি নিজের নির্দিষ্ট ছপ্‌পরের দিকে তাই আর গেল না বলরাম। বাঁধ ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে উঠল প্রতিবেশী আর একটি ভেড়ীর আলাঘরে। এ ভেড়ীটা ছোট, বিঘে পঞ্চাশের। কালীবাবু ইজারা নিয়েছেন বলে তারা উল্লেখ করে কালীবাবুর ভেড়ী বলে। আলাঘরে রয়েছেন একজন বাবু, নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। আর রয়েছে এক অল্পবয়সী ছোকড়া। হিন্দুস্থানী দারোয়ানটা বেরিয়ে গেছে পাহারা দিতে। বলরাম সোজা ভিতরে ঢুকে ছোকড়ার পাশে শুয়ে তাকে একেবারে বুকে চেপে জড়িয়ে ধরল।

ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে ছোকড়াটি বলল হাসতে হাসতে চাপা গলায়, 'মোকে বৌ পেয়েছো নাকি বলাদা ?'

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। ক'দিন ধরে অবিরত বৃষ্টি পড়ে পড়ে বাঁধের অবস্থা যা হয়েছে! অনেক জায়গায় বাঁধ ভেঙে গিয়েছে, অনেক জায়গায় মাটী বসে গিয়েছে। রাস্তা তাই কখনো উঁচু, কখনো নিচু; কোথাও কাদায় পা ডুবে যায়, কোথাও এমন পিচ্ছিল যে পা পাতা যায় না। ভাঙতে ভাঙতে বাঁধ কোথাও বা করাতের ফলার মত আকৃতি নিয়েছে,—পা ফেলতে একটু ভুল হলে পতন অনিবার্য।

সেই বৃষ্টি আর সীমাহীন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এমনি রাস্তা ধরে চলেছে চোরের দল। দীর্ঘ, রাত্রির মতই কালো, রুক্ষ দেহগুলো কোমরে জড়ানো একফালি গামছা ছাড়া একেবারে অনাবৃত। প্রত্যেকের হাতে একখানি করে বর্শা, বর্শার আগায় প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিষ একটা পুটলীতে করে বাঁধা। পাশাপাশি যাওয়ার মত রাস্তা নেই, একজন একজন করে সারি ধরে তারা চলেছে। যেমন নিঃশব্দ তাদের গতি, তেমনি দ্রুত। রাস্তা যত খারাপই হোক, পদস্খলন হলে চলবে না। তারা চলেছে কোন-না-কোন ভেড়ীর উপর দিয়ে, আর অত রাত্রে ভেড়ীর বাঁধ ধরে যাতায়াত আইনতঃ নিষিদ্ধ। তারা যদি একটুকু শব্দ করে তো অমনি পাঁচ সেল সাত সেলের টর্চের আলো জ্বলে উঠবে শব্দ লক্ষ্য

করে। যে-অন্ধকারটা এখন নিরেট আর নির্জীব বলে বোধ হচ্ছে, বহু মানুষের পদশব্দে সে অন্ধকার ভেঙে যাবে খান খান করে। বন্দুক গর্জে উঠবে, শন্‌ শন্‌ শব্দ করে অন্ধকার ভেদ করে ছুটে আসবে বল্লম।

ভাগ্য ভাল। তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। এ-সব কাজে তারা অভিজ্ঞ। তেমনি তাদের উপস্থিত বুদ্ধিও।

খালের ধারে এসে তারা একটি সালতিতে উঠল। সালতি হল তিন তক্তার তৈরী লম্বা সুঁচোলো এক ধরণের ডিঙি জাতীয় নৌকা—ভেড়ী-ভাড়ার কাজে সচরাচর ব্যবহার হয়। তারা এখন ছ'জন—দশ বারোজন তৈরী ছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যান্ত অটবী সংগে নিয়েছে ছ'জনকে অনাবশ্যক দল ভারী করাটা বিপদ ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে অন্যেরাও যথারীতি ভাগ পাবে,—সেই ব্যবস্থাটাই চলে আসছে।

সালতিতে চরে তারা একটু সহজ হয়ে বসল। একটা ত্রিপল ছিল সালতিতে। ত্রিপলটা মাথার উপর দিয়ে বিছিয়ে দিয়ে তারা ঘন হয়ে বসল। প্রত্যেকের মুখে জলে উঠল একটা করে বিড়ি।

সালতি বয়ে চলল। খানিক দূর গিয়ে সালতি এসে ভিড়ল একটা গৃহস্থ বাড়ীর ঘাটে।

'ভূষণদা, ও ভূষণদা', অটবী হাঁক দিল। দু' তিনবার হাঁক দেওয়ার পরে নারী-কণ্ঠে সাড়া মিলল, 'বাড়ী নেই। তোমরা কে গা?'

'কে কথা বলতেছো। একবার ইদিগে এসতে আজ্ঞে হয়। মুখখানা একবার দিকি।'

আবার চুপচাপ। শেষে দেখা গেল সাত আট বছরের একটি মেয়ে প্রকাণ্ড একখানা সাড়ীতে শরীর জড়িয়ে আসছে। হাতে লম্ফ, মাথায় একটা মাথালি।

কাছে এসে বলল, 'বাবু বাড়ী নেইকো। কে কথা বলতেছ গো তোমরা?'

অটবী বলল, 'আর তোমার মার বুঝিন্‌ বাত হয়েছে? এটুকুন পথ হেঁটে এসতি পারেনি? তা যাক্‌গে যাক্‌, বলগে, অটলের দল এয়েচে, দুটো পয়লা লম্বরের মাস দিতে হবে।'

মেয়েটি ফিরে গেল, এবং আবার ফিরে এসে বলল, 'মা বলল, মদ টদ এখন মিল্‌বেনি, ঘরে নেই।'

'মা-শালীকে বলগে যে আমরা অচেনা লোক নয়। আমরা ঘর সার্চো করব।'

মেয়েটি আবার ঘুরে এসে বলল, 'লগদ দাম লাগবে কিন্তুক।'

এবার আর অটবী মুখ খিস্তি না করে পরলে না, 'তোর মা-মাগী তো বড্ড জ্বালালে দেখছি। জিজ্ঞেস করে আয় তো, পিরীতের লোকের অভাব হয়েছে নাকি? এস্‌তে হবে নাকি ঘরে? কবে আবার আমরা লগদ দামে তোদের পচা মাল কিনি র‍্যা, অ্যা?'

মেয়েটি আবার ফিরে গেল। এবার সত্যিই দুটো বোতল নিয়ে এসে ওদের হাতে দিল, দেওয়ার সময় বলল, 'আর কক্ষনো মাকে গালাগাল দেবে নি, বুঝেছ?'

শুনে উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে উঠল। সালতি চলতে লাগল। যেটুকু সময় চলল তার মধ্যেই দু বোতল মদ তলানি সুদ্ধ যথাস্থানে চালান হয়ে গেল। গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি একটা জায়গায় সালতি বাঁধা হল। এবার সুরু হল গান।

'না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে—'

এমনি গুটি চার পাঁচ কলি কখনো খাদে, কখনো উঁচু গলায়, নানা সুরে এবং বেসুরে অশ্রান্ত ভাবে ভেসে আসতে লাগলো তিন জোড়া গায়কের মুখ থেকে। কখনো তাল কাঁপল, কখনো গিঠকিরি চলল। পরস্পরের সুর কখনো এক সংগে মিলল, কখনো মিলল না। কিন্তু তাতে গায়কদের গভীর ভাবাবেগের কোন হ্রস্ব-দীর্ঘ হল না। রাধার বিরহের সেই চির-নতুন করুণ গীতি মূর্ছিত হয়ে পড়তে লাগল গাঙের খালের পাড়ে পাড়ে। আকাশ তো ক'দিন ধরে বিরহের আবহাওয়া তৈরী করেই রেখেছিল। খালের জলের মধ্যে কতখানি ব্যথা জাগল তার একটানা ধ্বনি-তরঙ্গের মধ্যে তা বোঝা গেল না। কেবল নিকটবর্তী গাছের কয়েকটি পাখী এত ব্যথা সইতে না পেরে প্রতিবাদ জানাতে জানাতে দূরে চলে গেল।

রাত আন্দাজ গোটা আড়াই পর্যন্ত এই গীত চর্চা চলল। এবারে শেষ যাত্রা। আর খানিক দূর গিয়ে সালতি ভিড়িয়ে তারা ডাঙায় উঠল। সেখান খাল থেকে একটা নালা বেরিয়েছে। নালার পার দিয়ে তারা ভেড়ীটার গায়ে এসে উঠল। নালা যেখানে ভেড়ীতে গিয়ে পড়েছে সে জায়গাটাকে গৈ-মুখ বলে। সেখানে বাঁশের তৈরী একটা যন্ত্র বসানো আছে যাতে খালের জলের মাছ জোয়ারের সঙ্গে ভেড়ীতে গিয়ে ঢুকবে, কিন্তু ভেড়ীর মাছ বেরিয়ে আসতে পারবে না। জোয়ারের সময় গৈ-মুখে আটল বিছিয়ে রাখা হয়, তাতে অনেক মন-উদাসী মাছ এসে ধরা পড়ে। এবারের কোটালে প্রচুর মাছ হচ্ছে এই সংবাদ পেয়েই তারা আজ এসেছে।

এখন আর কেউ সোজা হয়ে হাঁটছে না। কোটালের সময় গৈ-মুখের সামনে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা থাকবে, এ একেবারে নিশ্চিত। কোন রকমে বাঁধে উবু হয়ে উঠেই তারা তাড়াতাড়ি ও পিঠে নেমে গেল। দু'জন রইল বাঁধের ঢালের সংগে লেগে শরীর সিঁটিয়ে দিয়ে। একটু এগিয়ে দু'জন গিয়ে জলে নাবল। বাকী দু'জন, তাদের মধ্যে রয়েছে অটবী, নাবল আরও খানিকটা এগিয়ে হোগলা বন ঘেঁসে।

একটু বোধ করি শব্দ হয়েছিল। শন শন করে একটি বর্শা এগিয়ে এল অন্ধকার ভেদ করে। পড়ল জলের গায়ে। পিছনে পিছনে সাপের জিভের মত এগিয়ে এল সাত সেলের টর্চের আলো। আলোটা ঘুরতে লাগল চক্রাকারে। ওদের মাথা ততক্ষন জলের নিচে। অটবী একখানা ইট সঙ্গে এনেছিল। যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল তার থেকে হাত বিশেক দূরে ছুঁড়ে দিল ইটখানা আর সেই দিকেই ঠেলে দিল কাঠের তৈরী একটা মানুষ। পাখী তাড়ানোর জন্য জিনিসটা কাছেই দাঁড় করানো ছিল। আবার খড়ের মানুষটার গায়ের উপর টর্চের-আলো জ্বলে উঠল। তার পিছনে এল বর্শা। নিরাপদ দূরত্বের থেকে একটা কাতরোক্তি করে উঠে খানিকটা এলো মেলো জল ছিটিয়ে অটবী ডুব মারল। প্রতিপক্ষের এবার আর কোন সন্দেহ রইল না। অনেক লোকের এলো মেলো সাড়া পাওয়া গেল। অনেকগুলো ছোট বড় টর্চ জ্বলে উঠল। একটা সালতিতে চড়ে চার পাঁচজন লোক এগিয়ে গেল ঘটনাস্থলের দিকে

ডুব সাঁতার কেটে অটবী আর তার সঙ্গী যখন টপ-মুখের কাছে এসেছে ততক্ষণে অন্যেরা কাজ উদ্ধার করে ফেলেছে। ওদের অন্য কাজ প্রায় গুছিয়েই রেখেছিল এরা। মাছ ধরে একটা জাওনায় নদীর মাছ, আর একটা জাওনায় পোনা মাছ ভর্তি করে তারা জিইয়ে রেখেছিল সকাল বেলা বাজারে পাঠাবে বলে। আজকে যে আবার পোনা মাছও ধরে রাখবে তারা আসবে বলে তা তারা ভাবেইনি। বাড়তি পাওনাটা চোরের দলকে আরও খুশী করল। কাজের শেষ অংশ এখনো বাকি। বাঁধে উঠে লাফ দিয়ে তারা ধান ক্ষেতে নামল।

আশাতীত শিকার জুটেছে বলে সকলের মনই খুশী। কিন্তু দলের দিকে তাকিয়ে অটবী দেখল, একজন লোক কম। অটবী উদ্বিগ্ন হল, জিজ্ঞেস করল, 'কালা কোথায়? কালাকে যেন দেখতে পাচ্ছিনি?'

সকলে এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

যজ্ঞেশ্বর বলল, 'কালাকে ধরে রাখেনি তো ওরা?'

সবাই বুঝতে পারল, সে বিষয়ে আর সন্দেহের কিছু নেই। কালা ধরা পড়েছে।

অটবী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কে যাবে আমার সংগে? নেতাই, তুই চল।'

পাকা লোক বলে নিতাই এর খ্যাতি আছে। কিন্তু বলল, 'খেয়ে-দেয়ে কাজ নেইতো কারও! সবাই তৈরী হয়ে রয়েছে—এখন গেলেই মিত্যু। কাল সকালে থানা থেকে কালাকে ছাড়িয়ে আনলেই হবে। যেমন বোকা কালাটা—খুব হয়েছে!'

অটবী রেগে গিয়ে বলল, 'আর পুলিস তোদের ছেড়ে দেবে, নয়?'

নিধু এগিয়ে এসে বলল, 'মামা, আমি যাই তোমার সংগে?'

'না। সেদিন তোর ঘরে বৌ এসেছে। একটা কিছু হলে কচি বৌটার শাপ-মুণ্যি শুনবে কে?'

শেষে পুষ্পকে নিয়ে অটবী রওয়ানা হল। বাঁধের এ পাশ থেকে মাথাটা একটু জাগিয়ে দেখতে পেল, হাত বিশেক দূরে দু'জন লোক কালাকে প্রায় কাবু করে ফেলেছে। ওদিকে জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ করতে করতে সালতিখানা দ্রুত এগিয়ে আসছে বাঁধের দিকে। এদিকটা একেবারে টর্চের আলোয় আলোময়।

পুনুকে কানে কানে উপদেশ দিয়ে তাকে ৎ
অটবী বাঁধে উঠে জলে ঝাঁপ দিল। সালতির লে.
জলের গায়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলতে লাগল। কি
অটবী তখন জলের অনেক নিচে।

অব্যর্থ লক্ষ্যে অটবী ঠিক সালতির নিচে উপস্থিত হয়ে
এ কাজটায় ঝুঁকি আছে। সালতির কোনে গিয়ে মাথা লাগলে স
হবে না, কিন্তু মাথা কেটে যাবে। তখন অটবাকে ভেসে উঠতেই হ
ধরা পড়তেই হবে।

তেমন দুর্ঘটনা ঘটল না। ঠিক জায়গায় গিয়ে অটবীর মাথাটা সালতিতে আঘাত করল, আর সালতিটা কাত হয়ে গেল। লোকগুলো আচমকা জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খেতে লাগল আর তাদের হাতের টর্চ পড়ে গেল জলে। সামলিয়ে নিযে তারা যখন অন্ধকারের মধ্যে তীরের দিকে সাঁতারিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তখন অটবী অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

তীরে উঠে অটবী দেখল পুনু ইতিমধ্যে কালার সাহায্যে এসে পড়েছে। লোক দু'জন বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছে। সে এক একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে লোক দুটোকে সহজেই জলে ফেলে দিতে পারল। তারপর বাঁধ থেকে এক লাফে ধান ক্ষেত, ধান ক্ষেত থেকে এক দৌড়ে রাস্তা, যে রাস্তা গিয়েছে খাল অবধি। রাস্তায় এসে দেখল, নিতাই নিধুরা অপেক্ষা কোরছে।

ছুটতে ছুটতে চলেছে তারা। এবাব দুম্ দুম্ পায়ের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। পথের পাশে একটি মাত্র বাড়ী—এক বর্ধিষ্ণু কৃষকের পরিচিত টিনের বাড়া। অন্ধকার ঘুমন্তপুবী। এই রাত্রে কী ঘটছে তা জানবে তারা কাল সকালে। কিন্তু এ বাড়ীব পাশের একখানা খড়ের ঘরে টিম টিম করে আলো জ্বলছে কেন? পার হয়ে যাওয়ার সময় নারী-কণ্ঠের খিল খিল হাসির শব্দ ভেসে এল।

এগিয়ে যেতে যেতে অটবী আবার ফিরে এল। কাছে এসে দেখে খোলা জানালার ধারে লম্ফ হাতে নিয়ে একটি যুবতী বৌ দাঁড়িয়ে আছে।

'হাসছিস যে?' অটবী প্রশ্ন করল রুক্ষ গলায়।

যদি পালাতে পারিস, আমি একটুন হাসতে

নষের বৌ, একথা কেউ যেন না জানে।'

নাকেরা চুরি করছে এ অ বার কাকে বলতে হবে ? ও সবাই

.দের চিনিস ?'

.বনি ? এক দেশেই তো বাস করি ! কিন্তুক এখন পালাও। ওরা

..তেছে। সোর শুনতেছ না।

সত্যি দূর থেকে কোলাহল শোনা যাচ্ছিল। অটবী যেতে যেতে বলল, 'কিন্তুক যা বললাম মনে থাকে যেন ! কেউ যেন না শোনে।'

আবার কলহাস্য উঠল। ছুটতে ছুটতে অটবী শুনতে পেল।

দুই

সকালবেলায় বলরাম ছিল ভেটীতে আলা-ঘরে।

ঘরে তার দ্বিতীয় পক্ষের বৌ বিন্দু নানা কাজে ব্যস্ত। বড় ছেলে কার্তিক, প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান, সর্দি-জ্বর হয়েছে বলে বাড়ীতেই আছে। অন্যদিন এতক্ষণ সে বেরিয়ে যায় কাজ থাকলে কাজে, আর নয়তো কাজের সন্ধানে। প্রায় একটি বড় মানুষের সমান কাজ করেও সে মজুরী পায় অনেক কম। কারণ তার বয়স মাত্র এগার বছর!

বছর দশেক হল বিন্দু এ বাড়ীতে বৌ হয়ে এসেছে। এখন তার বয়স তেইশ। এর মধ্যে চারবার তাকে আঁতুর ঘরে যেতে হয়েছে, যে চারটি সন্তানের সে জন্ম দিয়েছিল তার মধ্যে ন' বছরের মেয়ে লক্ষ্মী ও পাঁচ বছরের ছেলে কালা এখনো যমরাজের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে আছে। তেইশ বছর মাত্র বয়স বটে বিন্দুর, কিন্তু তাকে অনায়াসে ত্রিশ বছরের বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়, পঁয়তাল্লিশ বছরের বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়। রেখা-বহুল মুখে চাপড়া চাপড়া

কিসের যেন দাগ পড়েছে, হাত পায়ের মাংস শুকিয়ে গিয়ে সুপুষ্ট হাড়গুলো চামড়া ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আর ঘোলাটে পিচুটি-পড়া চোখে অভিজ্ঞতার পোড়-খাওয়া মনের ছাপ। কাজকর্মের সময় অনাবৃত স্তন যুগল নড়ছে যেন এক জোড়া খুব লম্বা পাকা সীম বাতাসের বেগে দুলছে।

এ গ্রামে পনের বিশ ঘর বাসিন্দা। প্রায় প্রত্যেকেরই সম্বল একখানি করে মাটির ঘর আর একটি করে বাঁশের বেড়ার রান্না ঘর। বলরামেরও তাই। এলোমেলো ছড়িয়ে আছে ঘরগুলো। কারও কোন আব্রুর বালাই নেই। জায়গার সীমানা যে কী ভাবে চিহ্নিত করা আছে তা কেবল বাসিন্দারাই জানে। কোন রাস্তা-ঘাটের বালাই নেই। এ-বাড়ার উঠান দিয়ে ও-বাড়ীর পিছন দিয়ে এঁকে বেঁকে পায়ে চলা পথ চলে গিয়েছে। বড় গাছের কোন বালাই নেই। আগাছা মেলাই আছে, আছে গুটি তিন চার অল্প বয়সী আম গাছ, গ্রামের প্রান্তের অশ্বত্থ গাছটি, দেবাংশী বেলগাছ, আর আছে ট্যাক্স-দেওয়ার-লেবেল-আঁটা গুটি পাঁচ ছয় তালগাছ। গুটি চারেক পুকুর আছে দুর্লভ সম্পত্তি। বলরামের বাড়ীর পাশেই একটি পুকুর আছে তারই মালিকানায়।

আজও আকাশ পরিষ্কার হয়নি। কিন্তু গত কয়েকদিনের মত আজ আর অশ্রান্ত বর্ষণ নেই। মাঝে মাঝে বিরতি দেখা যাচ্ছে।

বিন্দুও প্রায়দিনই কাজে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আজকে যায়নি। আজ তার অনেক কাজ। ক্রমাগত বর্ষণে মাটীর দেওয়ালের একটা দিকের অবস্থা শোচনীয়। তাড়াতাড়ি না সারলে ধ্বসে যাওয়ার আশংকা। কাল নাগাদ দু' এক দিনের জন্য খড়া দেখা দেবে এমন অনুমান করা যাচ্ছে। কাজেই ঘর সারার আজকেই উপযুক্ত অবসর।

বারো হাত ষোল-হাত ঘরখানার তিন দিকের দেওয়ালে মাটির প্রলেপ দেওয়া। সামনের দিকের দেওয়ালটারও মাটীর প্রলেপ দেওয়ার কথা, কিন্তু বলরামের আলসেমিতে কাজটা গত কয়েক বছরের মধ্যে হয়ে ওঠেনি। তেমন দরকারও হয় না অবিশ্যি। সামনে একফালি বারান্দা আছে, আর সেটাকে ঢাকা দিয়ে হোগলার ছাউনিটা এত নিচে নেমে এসেছে যে শরীর অনেকটা না বাঁকিয়ে বারান্দার উপর ওঠা যায় না। বৃষ্টির ঝাপ্টা তাই সহজে ঘরে ঢুকতে পারে না।

ঘরের ভিতরটা নিকোনো-পোঁছানো, ঝকঝকে তকতকে। বর্ষার দিনে মাটী ভিজে ওঠে বটে, কিন্তু নিপুন পরিচ্ছন্নতার কোন অভাব নেই। ছেঁড়া-খোঁড়া বিছানা পত্র, ভাঙা টিনের বাক্স, একরাশ হাড়ি-পাতিল :আর একটি সাধারণ লক্ষ্মীর পট দিয়েও যে কী আশ্চর্য সুন্দর করে ঘর সাজিয়ে রাখা যায় গৃহকর্ত্রী তা জানে।

দেওয়ালের কাজ খানিকটা করে গোবর-মাটীর হাত ধুয়ে বিন্দু ঢুকেছিল রান্না ঘরে। কার্তিক এসে এইবার নিয়ে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করল, 'মুড়ি আনতে যাবিনি মা ?'

বেলা আন্দাজ দশটা সাড়ে-দশটা হবে। আর দু' ভাই-বোন একটু আগে পান্তাভাত খেয়েছে। জর বলে কার্তিকের পান্তাভাত খাওয়া বারন।

হাত চালাতে চালাতে বিন্দু জবাব দিল, 'যাচ্ছি গো যাচ্ছি। হাতের কাজটা সেরে নে' জল আনতি যাব। অমনি তোর মুড়িও নে' এসব। দোকান তো আর কাছে নয়। অন্তত্তক তিন পো মেইলের কম নয় পথ। আর, যা আস্ত' হয়ে আছে জলে-জলে।'

পিছন থেকে কার্তিক ক্ষুদ্র হাতের একটা কিল তুলল ; কিন্তু তার জোর নিতান্তই অপ্রচুর বুঝে আবার হাত নামিয়ে নিল। খানিকক্ষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিমাতার পিঠ ভেদ করে মুখখানা দেখা যায় কিনা সেই চেষ্টা করল। তারপর এক পা এক পা করে গেল ভেড়ীর দিকে।

খানিক পরে বলরাম এসে চুলের ঝুঁটি ধরে রান্নাঘর থেকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল বিন্দুকে। একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল উঠানের উপর। কোনরকমে ঘরের পোস্তা ধরে বিন্দু আত্মরক্ষা করল।

'আস্তায় পা বাড়ালেই দোকান—একবারের জায়গায় দু'বার গেতি পায়ে ফোস্কা পড়ে হারামজাদীর! নবাবের বেটি আমার!' বলতে বলতে বলরাম উঠানের একপাশ থেকে একখানা বাঁশের লাঠি তুলে নিয়ে এল।

'তোল্ মাগী, পিঠের কাপড় তোল্।' রুক্ষ গলায় আদেশ দিল বলরাম।

এক জোড়া কম্পিত অনিচ্ছুক হাত আস্তে আস্তে পিঠের কাপড়খানা উপরের দিকে টেনে নিল। সেই পিঠের উপর অনর্গলভাবে চটাস চটাস শব্দে মেরে চলল বলরাম। সেই সঙ্গে সঙ্গে মুখও থেমে রইল না।
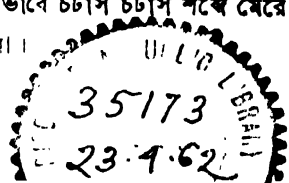
মারের আয়োজন দেখেই কার্তিক পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ন' বছরের বড় মেয়ে লক্ষ্মী গম্ভীর মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে মায়ের মার খাওয়া দেখল।

মার শেষ করে বলরাম একটু সরে এসে লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। ট্যাঁকের থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে নিল। আহত শত্রুর দিকে বাঁকা চোখে খানিকক্ষন তাকিয়ে থেকে বলল, 'যেমন তেমন লোকের হাতে পড়িসনিকো। ভবিষ্যেতে মনে থাকে যেন কথাটা।'

বলে আপন কৃতিত্বের গর্বে বলরাম হাসল একটু। বজ্জাত বৌকে আস্কারা না দিয়ে শায়েস্তা করা,—কাজটা তো কম কৃতিত্বের নয়।

তারপর চলে গেল ভেড়ীর দিকে। ভেড়ীতেই তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা।

জোরে নয়, কিন্তু শব্দ করে কাঁদছিল বিন্দু। খানিকক্ষণ ঠিক একই ভাবে পড়ে রইল মাটীতে। আস্তে আস্তে কালো পিঠের উপর কতকগুলো লম্বা লম্বা রেখা ফুটে উঠল। এক পাশ থেকে সরু একটা রক্তের রেখা চিক চিক করে নেমে এল আর ভিজিয়ে দিল পরনের শাড়ীখানা। অনিয়মিত নিশ্বাসের তালে দুলে দুলে উঠছিল তার সারা শরীরটা।

একটু পরে উঠে একটা মাটীর কলশী আর কার্তিকের ফেলে-দেওয়া আনিটা নিয়ে বিন্দু বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

তারপর অন্যান্য দিন যেমন করে চলে তেমনি মন্থর নিস্তব্ধভাবে দিনের কাজ এগিয়ে চলল। কোন কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল না। কোন ব্যাপারে শৈথিল্য প্রকাশ পেল না।

খেতে বসে লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করল মাকে, 'হ্যাঁগো মা, বাবা অমন মিছি-মিছি মারে কেন তোমাকে?'

বিন্দুর তরফ থেকে কোন জবাব শোনা গেল না। একটু চুপ করে থেকে লক্ষ্মী আবার প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁগো মা, সবসময় ছেলেগুনোই কেন মেয়ে-গুনোকে ঠ্যাঙায়? মেয়েরাও তো উল্টো ঠ্যাঙাতে পারত?'

এবার একটু প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গীতে হেসে বিন্দু মেয়ের দিকে তাকালো।

একটু ভেবে নিয়ে নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিল লক্ষ্মী, 'ছেলেগুনোর গায়ে অসুরের মতন জোর, তাই জন্য, না মা?'

এখন ঠিক মনে নেই, কিন্তু মেয়ের এই বয়সে তার মা যখন তার বাবার হাতে মার খেত তখন হয়তো এমনি প্রশ্ন জাগত বিন্দুরও মনে। যাদের বয়স কম, তারা কত কম জানে! বিন্দুর অনেক অনেক বয়স হয়েছে বলেই না সে আজ পৃথিবীতে যা-কিছু জানার সবই জেনে নিয়েছে। সে জানে, রোজ সকালে যেমন আকাশে সূর্য ওঠে, ছেলেরাও তেমনি মেয়েদের মারে। এটা নিয়ম। এর মধ্যে কোন প্রশ্ন নেই। ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় এই নিয়ম করে দিয়েছেন। লোভ করে বেঁচে থাকতে হলে তার জন্য এই ভাবে মূল্য দিতে হয়। পুরুষকে এড়িয়ে চলবে? তবে তোমার মিলবে না সন্তান, গড়ে উঠবে না সংসার। তবে মেয়ে-জন্মই বৃথা।

বলরামের হাতে মার খেয়ে বিন্দুরও প্রথম প্রথম রাগ হত, অভিমান হত। অনেক সময়ে মারের কারণও খুঁজে দেখতে চেষ্টা করত। পরে লক্ষ্য করে দেখেছে মারের কারণ ঘটবেই, এবং মার তাকে খেতে হবেই। সংসারের সব জায়গায় যে-নিয়ম চলছে তার বেলাতেই তা অন্যরকম ঘটবে তা হয় না। কার্তিক তার সৎমাকে দেখতে পারবে না, এর মধ্যে নতুনত্ব কি আছে? কার্তিক তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বলে সে-ও কার্তিককে আর লক্ষ্মীকে ঠিক একই চোখে দেখতে পারে না। আর একটু উনিশ-বিশ হলেই বলরামের পিতৃত্বের অহঙ্কারে আঘাত লাগবেই, এসবই একেবারে মাপ-জোঁক করা বাঁধা-ধরা নিয়মের ব্যাপার। এতটুকুও নিয়মের বাইরের, বা প্রত্যাশার বাইরের কিছু নয়।

মার খেয়ে কাঁদে বিন্দু। ব্যথা পায় বলেই সে কাঁদে তা নয়। কান্নাটাই নিয়ম বলে কাঁদে। তা ছাড়া এ-জন্য আর কোন দুঃখ তার মনে স্থান পায় না। সংসারটা নিয়মে চলছে; সে-ও নিজেকে নিয়মে চালাতে চেষ্টা কোরছে প্রাণ-পণে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বলরাম আবার ঘরে এল খানিকক্ষন বিশ্রাম করতে। এমন সে প্রায়ই আসে। তার জন্য বিছানা তৈরীই থাকে। আজও ছিল।

কার্তিক গিয়ে মাকে খবর দিল। মারার সময় বলরামের হাতে কিভাবে একটু টান লেগেছে, ব্যথা হয়েছে। বিন্দু তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে সরষের তেল গরম করে নিয়ে গেল বলরামের হাতে মালিশ করার জন্য।

ছোট্ট গ্রাম। বাঁশের কাটা লাঠি দিয়ে বলরাম যখন মারছিল, সে-শব্দ গ্রামের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল। আর সে শব্দ শোনার জন্য গ্রামে আজকে অনেকেই উপস্থিত ছিল। কাল রাত্রে আশাতীত শিকার জুটেছে বলে বিকেলে মাংস আর তাড়ীর আয়োজন করা হবে। আজকে অনেকেই বাইরে যায়নি কাজের চেষ্টায়। কেউ তাই বলে বলরামের বাড়ীর সামনে ভীড় করে দাঁড়ালো না। যারা দৈবাৎ কাছাকাছি ছিল তারা একবার সেদিকে ঠাণ্ডা চোখ বুলিয়ে অলস গতিতে চলে গেল যার যার কাজে। যেন নিতান্তই সাধারণ মামুলী ঘটনা স্বামীর হাতে স্ত্রীর মার খাওয়াটা।

কেউ কেউ যার যার কাজ করতে করতে শুধু ভাবল, গোঁয়ার গোবিন্দ বলরাম আজ আবার বৌকে পেটাতে লেগেছে। আপদ যত সব!

নবীন যাচ্ছিল বলরামের বাড়ীর পাশ দিয়ে। একবার আড় চোখে তাকিয়ে পথ চলতে চলতে ভাবল, একটু অল্প-স্বল্প মারলেই তো হয়রে বাপু। বলরামের যত বাড়াবাড়ি।

ঘটনাটা সবচেয়ে বেশী আহত করল অটবীর বড় ভাগনে নিধুকে। কুড়ি বছর বয়সের ছিপছিপে চঞ্চল ছেলে নিধু। বিয়ে করেছে গোপাকে বছর দুই আগে। এখন সে পনেরোতে পড়ায় স্বামীর ঘর করতে এসেছে। নিধু ভেবেই ঠিক করতে পারে না, বৌকে কী করে মারা যায়। অত নরম আর কোমল যার শরীর, একটা সামান্য চাপ দিলেই যার গায়ের মাংস চুপসে যায় রবারের মত, শক্ত লাঠি দিয়ে মারার মত জায়গা কোথায় তার গায়ে? একটা আম গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে বলরামের মার দেখল সে খানিকক্ষণ। তারপর আর সহ্য করতে না পেরে বলরামকে একটা অস্ফুট গাল দিয়ে ফিরে এল নিজের ঘরে।

তার ঘরখানা পৈতৃক। কিন্তু বাপ থাকে অন্যত্র; মা মারা যাওয়ার পর আবার বিয়ে করেছে। ছেলের কোন খবর নেয় না। নিধুর এখনকার অভিভাবক অটবী। ঘরে আছে তার ছোট এগারো বছরের ডানপিটে ভাই কাঁঠাল আর বৌ গোপা।

গোপা ঘর লেপছিল। তার দু'হাতে কাদা মাখা। কালো, লম্বা, রোগা

মুখখানা এমনিতে করুণ এবং শ্রীহীণ। কিন্তু হাসলে পরে চোখে দুষ্টুমি ঝিলিক মারে এবং কমনীয়তা ঝরতে থাকে। নিধুর পক্ষে তাই যথেষ্ট। সে এসে গোপার বাহুমূল চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল দরজার সামনে আলোতে মুখ দেখবে বলে।

'মনটা বড় খারাপ নাগ্তেছে, পেটের ছেলের মা। বলাকা' একটা কসাই।'

'ও—তাই বুঝি বৌয়ের জন্যি মন কেমন করে উঠল ?···উঃ, ছাড়ো ছাড়ো। চাদ্দিকে নোক। কে-বা দেখে ফেলবে।'

বাকি কথাটার পথ রুদ্ধ করে দিল এক জোড়া ক্ষুধিত ঠোঁট।

সেখান থেকে নিধু গেল অটবীর কাছে। অটবী সবে ফিরেছে। যাদবপুরের বাজারে চোরাই মাছ কেমন বিক্রি হচ্ছে দেখে কিছু টাকা নিয়ে মাংস কিনে এনেছে। মাছ বিক্রি কোরছে অটবীর বৌ রাধা এবং আরও কয়েকটি বৌ।

অটবীর সংগে নিধুর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। এত অল্প বয়সে বাপের সাহায্য ছাড়া সে বিয়ে করতে পেরেছিল অটবী পিছনে ছিল বলে। ওদের মধ্যে পুরুষের বিয়েতে অনেক টাকা লাগে।

'বলাকা মুনিষটা সুবিধের নয়, তাই নয় মামা ?' নিধু জিজ্ঞেস করল।

সে-কথা অটবী একশোবার স্বীকার করে। 'হু' বলে সায় দিয়ে সে নিজের কাজে মন দিল। সে এখন ছেঁড়া জাল সারছিল। খানিকটা সুতো নিয়ে নিধুও সাহায্য করতে লেগে গেল।

'আচ্ছা মামা, বৌকে মারলে হাতে কিছু সুখ পাওয়া যায় নাকি বল দিনি ?' নিধু আবার জিজ্ঞেস করল।

অটবী ধমক দিল, 'থামতো নিধে। ছোট না তুই ? বড় মুনিষদের ব্যাপারে নাক গলানোর দরকার কি তোর ?'

মনে মনে ভাবল, বৌ মারা কিছু একটা ভাল কাজ নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে মারার দরকার হয়। যত অনাসৃষ্টির মূল এই মেয়ে মানুষ, বড় অশান্তি সৃষ্টি করে সংসারে!

নিতাই ঘরে বসে বাঁশ কেটে কেটে আটল পাটা ইত্যাদি তৈরী কোরছিল।

ভাবল, বলরামটা বড্ড বোকা। বৌকে মারবে তা রাজ্যসুদ্ধ লোককে জানানো চাই। সোয়ামী মারবে ঘরের মধ্যে বৌকে,—ডান হাতে মারবে তো বাঁ হাত তা টের পাবে কেন ?

নিতাই-এর মুখখানা রুক্ষ, কর্কশ, রেখাবহুল। মনে হয়, এক্ষুনি মেরে বসবে বুঝি। ঠোঁট জোড়া কেমন অদ্ভুতভাবে সামনের দিকে একটু বেড়ে এসেছে। একটু বেশী বুদ্ধিমান সে। সকলের সঙ্গে চুরিতে সে-ও যোগ দেয়। কাজে সে ধুরন্ধর। তাছাড়া শাকরেদ কানাইকে নিয়ে মাঝে মাঝে গোপনে চুরি করে—কাউকে ভাগ দেয় না। পরশীরা দু' একটা ঘটনা জেনে ফেলেছে বলে কেউ তাকে দেখতে পারে না।

বুড়ো মানুস নিত্যানন্দ বাতে শয্যাশায়ী। বয়সকালে কত দাঙ্গা হাঙ্গামার বীর-বিক্রমে যোগ দিয়েছে। আজ সে অক্ষম। সাধারণ জন-মজুরিও খাটতে পারে না। একটা জাল বুনে দেওয়ার কাজ নিয়েছে। ক' পয়সাই বা হয় জাল বুনে। সে-কাজেও আজ হাত দিতে পারেনি। ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে। তার —গ্য। সে অক্ষম পরাশ্রয়ী বলে ছেলে-বৌরা তার উপর নির্যাতন করে নির্ভয়ে।

ছোট ছেলের বৌ আলতা এক থাল ভাতের উপর চাট্টি পেয়াজ ভাজা চাপিয়ে নিয়ে এসে ঠাস করে সামনে মেঝের উপর ফেলে দিল। ঝাঁঝের সংগে বলল, 'বুঝলে গো ঠাউর, তোমাদের জেতের মুখে নুড়ো জেলে আগুন দিতে হয়। ভাত দেওয়ার ভাতার নয়, কীল মাবার গোঁসাই! ছেলে-পানের মা-টাকে মারতেছে অমন করে, আর তুমি বুড়ো-হাবড়া ঘাড়ে মাথা গুঁজে চুপটি করে বসে আছো? ছি! ছি! ঘেন্নায় মরে যাই!'

নিত্যানন্দের সন্দেহ হল, পেঁয়াজ ভাজা ছাড়া আরও কিছু নিশ্চয়ই রান্না হয়েছে। যে রণ-চণ্ডী মূর্তি করে হারামজাদী বৌটা এসেছে। জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না।

দুনিয়ার সব কিছুই উল্টে যেতে বসল দেখা যাচ্ছে। কে না কে তার বৌকে মারছে,—নিজের বৌ-এর উপর যা ইচ্ছে তাই করার তার অধিকার আছে তাই মারছে,—অথচ তার জন্য ছেলে-বৌ-এর কাছে জবাবদিহি করতে হবে

নিত্যানন্দকে। ভাবতে ভাবতে নিত্যানন্দের মন অনেক দূরে চলে গেল, অতীত দিনের কাহিনীর মধ্যে। রাসু পাঁজাটা ছিল ভারী বোকা। বুড়োকালে অথর্ব হয়ে পড়লে বড় দুইবৌ-এর সেবা-যত্নে একেবারে গলে গেল। দূরে ছিল ছোট ছেলে। তাকে বঞ্চিত করে বুড়ো দু'জনের নামে সম্পত্তি লিখে দিলে। আর যেই না লিখে দেওয়া, অমনি মা অন্নপুন্নো মা-চামুণ্ডে মূর্তি ধরলেন। কী যন্ত্রণাটাই না বুড়ো বয়সে সহ্য করেছে রাসু পাঁজা ছেলে-বৌদের হাতে! অমন ভুল নিত্যানন্দ কখনো করবে না! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের জমির মালিক থাকবে নিজে। ছেলেদের মাথার উপর ছড়ি ঘুরাবে। আদর যত্ন করে তো জমি চাষ করতে পারবে। নয়তো বর্গা চাষীর অভাব নেই দেশে। হুঃ! নিত্যানন্দের কাছে ট্যাঁ ফুঁ চলবে না বাবা!

ভাবতে ভাবতে নিত্যানন্দ ভুলে গিয়েছে যে আজ আর তার জমি নেই। এখন আর চাষী বলে তার পরিচয় দেওয়া যায় না।

সকাল বেলার ঘটনাটা ছিল পারিবারিক।

কিন্তু বিকেল বেলার গোলমালটা গড়িয়ে গেল একটা রীতিমত সামাজিক হাঙ্গামায়।

গত মহাযুদ্ধের সময় এ-অঞ্চলের অধিবাসীদের জায়গা ছেড়ে উঠে যেতে হয়েছিল সরকারের নির্দেশে। বিমান-ধ্বংসী কামান থেকে নিঃসৃত গোলাগুলির সম্ভাব্য পতন-স্থান বলে সরকারকে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে জনশূন্য করে রাখতে হয়েছিল। তারা অবিশ্যি এ-জন্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল,—দু'তিন বছর ধরে ঘোরাঘুরি করার পর ঘর-পিছু এক-দেড়শো টাকা করে দিয়েছিলেন সরকার, অর্থাৎ, আনুমানিক ঘর তোলার খরচের সিকি পরিমাণ টাকা। ইতিমধ্যে পঞ্চাশের মন্বন্তরে কেউ কেউ টেঁসেও গেল। লড়াই মিটে যাওয়ার পর ফিরে আসার সময় কেউ কেউ অন্যত্র স্থায়ী জীবিকার সন্ধান পেয়ে এদিকে আর এল না। আবার কয়েক ঘর নতুন বাসিন্দাও এল। এমনি করে যোগ-বিয়োগ হওয়ার পরে শেষ পর্যন্ত দু' তিনখানা ঘর উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। ঘর ক'খানা গ্রামের পূব-প্রান্তের শিশু-অশ্বত্থ গাছটার কাছে। একখানা ঘরই

একটু ভাল আছে, অর্থাৎ, চারপাশের দেওয়ালের একটু-আধটু ভাঙা-চোরা অস্তিত্ব আছে। বাকি ঘরগুলোর শুধু থামগুলোই এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আন্দাজ গোটা তিনেকের সময় আলায় ফেরার পথে ভেড়ীটা একটা চক্কর দিয়ে যাবে ভেবে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল বলরাম। যেতে যেতে ভালো ঘরটার দিকে তার চোখ পড়ল। ঘরটার চারপাশে দেওয়াল থাকলেও ভিতরটা দেখতে পাওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না। বলরাম যা দেখল তাতে অনুমান করতে পারল গুটি দুই তিন বাচ্চা ঘরের ভিতর কিছু একটা কোরছে।

(কাছে এসে যা দেখল তাতে তার চোখ চড়কগাছে উঠল। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ন্যাংটো হয়ে মেঝেয় পড়ে জড়াজড়ি কোরছে, আর একটি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ছেলে দাড়িয়ে দাড়িয়ে যুদ্ধের ফলাফল কি ঘটে প্রত্যক্ষ করার জন্য অপেক্ষা কোরছে। ছেলেমেয়ে দুটির একটি অটবীর বারো বছরের ভাগ্নে কাঁঠাল। তার পক্ষে এ-বয়সে ন্যাংটা হওয়াটা এ-সব অঞ্চলে এমন-কিছু অস্বাভাবিক নয়। মেয়েটি হচ্ছে বলরামেরই বড় মেয়ে লক্ষ্মী। তার বয়স ন' বছর। যদিও মাত্র বছর দু' তিন হল সে কাপড় ধরেছে, তবু তাদের সমাজ অনুযায়ী এখন সে বিবাহ-যোগ্যা। তার পক্ষে অন্য ছেলের সামনে ন্যাংটো হওয়াটা নিশ্চয়ই আপত্তিকর।

বলরাম আরও লক্ষ্য করল, ঘরের মেঝেয় কতকগুলো লজঞ্চুস ইতস্তত: ছড়ানো রয়েছে, আর তা ছাড়া কাঁঠালের প্যান্টটা দূরে ছাড়া রয়েছে, আর লক্ষ্মীর শাড়ীটার উপরেই ওরা জড়াজড়ি কোরছে। সর্বোপরি ব্যাপারটা ঘটানোর জন্য ওরা এসেছে এত দূরে একটা পোড়ো ঘরে।)

কাজেই সবগুলি জিনিষ মিলিয়ে নিয়ে একটা সাংঘাতিক নীতি-বিগর্হিত দুরভিসন্ধি আবিষ্কার করা কষ্টকর হল না বলরামের পক্ষে। লজঞ্চুসের লোভ দেখিয়ে লক্ষ্মীকে কাঁঠাল ডেকে এনেছিল এই ঘরে। তারপর ন্যাংটো হয়ে অসৎ অভিপ্রায় নিয়ে লক্ষ্মীকে আক্রমণ করেছে। লক্ষ্মী বাধা দিতে চেষ্টা করেছে, এবং টানা-হ্যাচড়ার মধ্যে তার শাড়ীর গিঠ খুলে গিয়েছে। এমনি একটা ঘটনা বলরাম অনুমান করল।

দারুণ রাগে জ্বলে উঠে বলরাম তৎক্ষণাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, 'কাঁঠাল!'

তিনজনই এতক্ষণ প্রচুর হাসছিল। কিন্তু বলরামকে দেখে তিনজনের মুখই শুকিয়ে গেল। এবং তা দেখে বলরামের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে তার অনুমানই নির্ভুল।

প্রথমে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল কাঁঠাল। প্যান্টটা তুলে নিয়ে এক দৌড়ে বলরামকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে বলরামের হাতে ধরা পড়ে গেল।

'বিছুটির বাচ্চা, কি করতে নেগেছিলি বল্ ?'

কাঁঠাল নিরুত্তর।

'বল, যমের অরুচি, বল্ শিগ্‌গির।'

'খেল্‌ছিলাম।'

'বদমাশ্—শানকী'র বাচ্চা—ফের মিছে কথা ?'

হাতটা ছেড়ে দিয়ে সেই হাত দিয়ে বিরাশী শিক্কার এক চড় কসিয়ে দিল বলরাম কাঁঠালের গালে। পাচ আঙুলের দাগ স্পষ্ট হয়ে বসে গেল গালের উপর। তা সত্ত্বেও ছাড়া পেয়ে এক দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল কাঁঠাল।

অতঃপর বলরাম আর দু'জন অপরাধীকে ধরার জন্য ঘরের ভিতর ঢুকল। যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল, মতির ছেলে কুড়ান, তাকে বলরাম ধরতে পারল না। সে ক্ষিপ্রবেগে এঁকে বেঁকে দৌড়িয়ে কেটে বেরিয়ে গেল। আর যে-সময়টা বলরাম কুড়ানের পিছনে ছটছিল সেই অবকাশে লক্ষ্মীও সরে পড়ল।

ঘর থেকে বেরিয়ে বলরাম ভাবল, চুকে-বুকে গেল ব্যাপারটা। কিন্তু বেরিয়ে এসেই দেখে সামনে চরণ। কাজেই রাগটা আর হজম করা গেল না। গোড়াতে ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হল অটবীর বাড়ীর দিকে। পথেই আবও চার পাচ জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যার সঙ্গেই দেখা হয়, একই ঘটনা বারবার করে বলে যায় বলরাম। প্রথমটা বলল, সন্দেহ হয়েছিল। পরে বলল, চুমু খেতে দেখেছে। তারপরে বলল, শাড়ী টেনে খুলতেও দেখেছে। সন্ধ্যার দিকে আশে-পাশের দু'চারখানা গ্রাম জেনে গেল যে বেতুই গাঁয়ে একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার উপর ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। পরদিন সকালে গড়ে'র বাজারে শোনা গেল, বালিকাটি জখম হয়ে হাসপাতালে প্রেরিত হয়েছে। আর আততায়ী, তার ঘরে বৌ-ছেলে-মেয়ে আছে, ফেরার হয়েছে। দু' দিন পরে

কাগজে যখন বেরুলো একজন পাশবিক অত্যাচারকারী ধরা পড়েছে, তখন আর কারও মনে কোন সন্দেহ রইল না যে এই ব্যক্তিই বেতুই গাঁয়ের সেই দুষ্কৃতিকারী।

যে-ই শুনল তারই মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। কাজেই অটবীর বাড়ীর কাছে বলরাম পৌছতে পৌছতে দশ-বারো জনের একটা ভীড় জমে গেল। যজ্ঞেশ্বর, নবীন, নিধু প্রভৃতি কয়েকজন বলরামকে প্রাণপণ প্রয়াসে বোঝাতে লাগল যে বলরাম ভুল বুঝেছে ব্যাপারটা।

'এটুকুন বুঝতে পারলেনি বলাকা'—বয়েস না হলে কি বংসের ধম্মো পেকাশ করা যায়?' নিধু বলছিল।

কিন্তু বলরামেরও সমর্থকের অভাব ছিল না। কানাই, ভূষণ, ভোলা প্রভৃতি তার পিছনে জুটে গিয়েছিল গ্রামের নীতিরক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে।

ভূষণ বলছিল, 'আজকালকার ছেলে-ছোঁড়াদের আর বয়স-ফয়স নাগেনা গো নিদে। আজকাল পেটেব পে' পড়েই বিয়েধর।'

সবাই হেসে উঠল। এরপর আর বলরামের বেশী কথা বলার দরকার হল না, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলই বাক্‌যুদ্ধে আসর জমিয়ে তুলল। কৌতূহলী হয়ে গ্রামের বৌ-ঝিরা বেরিয়ে এসে ঘরের আড়াল থেকে বা গাছের আড়াল থেকে উঁকি মারতে লাগল ঝগড় দেখবে বলে। দু'জন একজন করে লোক এসে এসে যোগ দিয়ে কোন্দলকারীদেব সংখ্যাও বেশ বাড়িয়ে তুলল।

বলরাম দেখল তার সমর্থকের সংখ্যা যথেষ্ট। বলরাম যখন চুরি করার গর্হিত অপরাধ সম্পর্কে সারগর্ভ যুক্তি দেখাতে থাকে তখন এরা শুনেও শোনে না। সেই তাদেরই এখন গ্রামের নীতি-রক্ষার ব্যাপারে কী প্রচণ্ড উৎসাহ!

ইতিমধ্যে অটবী এসে গেল। নিঃসন্দেহে ভাগনের দোষ ঢাকার জন্যই সে এসেছে। সমস্ত শরীর জ্বলে গেল বলরামের। এই মানুষটা মূর্তিমান অসৎ। গ্রামটাকে ন্যায়ের পথে, সৎ-পথে চালাতে গেলে এই মানুষটা বাধা দেবেই। বলরামের আর কোন উপায় নেই। এই মানুষটার শয়তানী ঠেকাতেই হবে।

তৎক্ষণাৎ ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল। তার সঙ্গে গালাগালি। আশ্চর্য স্পর্ধা অটবীর! ভাগনের অপরাধ সে অস্বীকার করল না, বলল, 'মান্‌লাম করেছে।

তো কী করা যাবে ? ছেলে-ছোকড়া একটা অন্যায্য কাজ করে ফেলেছে। তো তাকে কি মাটীতে পুঁতে ফেলতে হবে ? আর তোমার ঐ নন্দীটা কম বজ্জাত নাকি ? বেশ ডাঁটো মেয়ে বাবা। নিশ্চয় ঐ জ্জাতটা উস্‌কেছে কাঁঠালকে। না কি বল যজ্ঞেশ্বরকা' ?'

কিন্তু যজ্ঞেশ্বরকাকার তরফ থেকে সমর্থন আসার আগেই বলরাম ফেটে পড়ল রাগে, 'ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি, তোর মত বেহদ্দ বেহায়া শতকে একটা মিল্‌বেনি। যে দোষ করেছে, তার সাফাই গাওয়া হচ্ছে ! আবার অন্যের 'পর দোষ চাপান দেওয়া হচ্ছে ! বাহবা ! বাহবা !'

'তা অন্যায়টা বাবু কি বলেছি বল দিনি ঠিক করে। ঘরে ঘরে তো বাবু রাধা-কেষ্টোর লীলে চল্‌তেছে। একই ঘরে তো থাকে ছোঁড়া-ছুঁড়িগুলো ! তাদের কি চোখ নেই ? না, তারা হাবা ?

কথাটা ঠিক। পাঁচ সাত দশ জনের এক একটি পরিবার একটি মাত্র ঘরে থাকে। পুরোণ বিবাহিতরা হয়তো সামলিয়ে চলতে পারে। কিন্তু নতুন বিবাহিতরা একটু বেসামাল হয়ই। আর কিশোরবয়সীদের কৌতূহল বোধটা একটু বেশীই।

এ-পক্ষ থেকে নিতাই মন্তব্য করল, 'তবে তো ভালই হল গো। অন্যায় যারা করবে তাদের মোরা মাথায় তুলে নে নেচব !'

'তাই বল্‌তেছি আমি ? কথা ঘুইরে দিও না নেতাই। ওটা বড্ড দোষ। কেউ দোষ করলে বকে-ঝকে দাও—ব্যস্‌। আর কি করবে ? ছোঁড়াগুলা দেখ্‌তেছে না—একজন মুনিষের ছেলে হচ্ছে আর একজনের বৌ এর পেটে ?'

কথাটার পিছনে একটা খোঁচা আছে। সবাই বিশ্বাস করে সুভদ্রা নামে একটি মেয়ের বিয়ের পাঁচ মাস পরে যে-ছেলেটা হয়েছিল সে ছেলেটা বলরামের।

বলরাম ক্রোধে জ্ঞান-হারা হয়ে গেল।

'তবে রে,—আবার আমার নামে মিথ্যে মিথ্যে লাগাতে এইছিস ?—আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।'

আট দশ জন লোক ঠেসে ধরে রাখতে পারে না বলরামকে এমন প্রচণ্ড শক্তি এসেছে বলরামের গায়ে রাগের চোটে। এদিকে অটবী দাঁড়িয়ে আছে নিরুত্তেজ-ভাবে। মুখে সেই বাঁকা হাসি।

এমন সময় কাঁঠাল এসে ফিস্ ফিস্ করে জানাল অটবীকে, 'মামীমা ডাকতেছে, মামা। খুব নাকি দরকার।'

যেতে যেতে অটবী বলে গেল, 'গাঁয়ের নোকে বাধা দিচ্ছে, তাতে কী হয়েছে বলরাম। গাঁয়ের বাইরেও তো দেখা-সাক্ষেৎ হয়। ত্যাখন পেইছে যেওনি যেন।'

ঘরে ফিরে এসে অটবীর বৌ রাধা অটবীকে তিরস্কার করল, 'বুদ্ধি সুদ্ধি বেচে দে' এইচো নাকি? অন্যায় করেছে ভাগনে,—তার হয়েও নড়াই করতে হবে? ছি! ছি!'

বাইশ বছরের ডাঁজা বৌ রাধা। শক্ত, সমর্থ, আঁট-সাট গড়নের। মুখটা সুন্দর নয়। তবে দেখলে মনে হয়, ওকে হটানো শক্ত।

অটবীর তৎক্ষণাৎ আবার মনে হল সেই কথাটা। বৌ মারা খারাপ, কিন্তু মাঝে মাঝে মারার দরকার হয়। বড় বজ্জাত এই মেয়ে মানুষ জাতটা। ভাগ্নেদের সে সাধ্যমত দু'চার পয়সা দিয়ে সাহায্য করে, তা এ-মাগীটার পছন্দ নয়। তাই এখন চাইছে ভাগনেটা সকলের হাতে মার খেয়ে মরুক। সকলে মারবে তার ভাগ্নেকে, আর অটবী দাড়িয়ে দেখবে। তাই আশা কোরছে এই মাগীটা তার কাছে?

রাধাকে কিন্তু অটবী মারতে গেল না। সে-চেষ্টাও করল না।

এদিকে বলরামকে নিয়ে তার সমর্থকের দল বলরামের ঘরের দাওয়ায় এসে বসল। তারা ঘোষণা করল, অটবীর পেট-জোশা অহংকার আর মোড়লী তারা আর সহ্য করতে পারছে না। এবার তারা বলরামকে নতুন মাতব্বর ঠিক করে অটবীর দল থেকে আলাদা হয়ে যাবে। বলরাম চাকরি করে—তাতে কি? তারা কোন কাজ পেলে সে নিশ্চয়ই গিয়ে দরদস্তুরটা ঠিক করে দিতে পারবে। চুরিতে সে যাবে না—বেশ তো! ওরা যখন চুরিতে যাবে তখন ভালমন্দ পরামর্শ তো দিতে পারবে।

ব্যাপারটা আসলে অর্থনৈতিক। গ্রামে কুড়ি-পঁচিশ জন সমর্থ লোক আছে। সকলে। একযোগে চুরি করার নিয়মটা চলে আসছে বলে মাত্র পাঁচ ছ' জন কাজে যায়, বাকি সবাই বসে বসে ভাগ পায়। তাতে প্রত্যেকের ভাগই কম পড়ে যায়। তার চেয়ে আলাদা আলাদা দল হলে সবাই কাজ করতে পারবে. কাজের

পুরো ভাগও পাবে। তাই অটবীর সংগে একটা গোলমালের সুযোগ নিয়ে তারা গ্রামে দলাদলিটা পাকাপাকি করে নিতে চায়।

কিন্তু ওদের কথাটা শুনেছো একবার! বলরাম নিজে চুরি করতে যাবে না, কিন্তু ওদের চুরি করার ব্যাপারে পরামর্শ দেবে! যেন চুরি করাটা দোষের, কিন্তু চুরি করার পরামর্শ দেওয়ায় কোন দোষ নেই। সময়টা উত্তেজনার মুহূর্ত না হলে সে হয়তো হেসে ফেলতে পারত। অথবা, এখন সে যদি বলরাম না হয়ে আর কেউ হত, তবে হয়তো সে রেগে উঠে ধমকিয়ে ওদের ভূত ছাড়া করে দিতে পারত।

কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেল। আর বলরাম বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

পাঁচজনের উপর মোড়লী করতে কার না ভাল লাগে? কিন্তু তাই বলে বলরামের তা ভাল লাগে না। বরং পাঁচজনের ঝামেলা এড়িয়ে চলতে পারলেই সে খুসী হত। কিন্তু সে ছাড়তে চাইলেও ঝামেলা তাকে ছাড়বে না। শুধু ঐ অটবীটার জন্যই এই দুর্ভোগ। বেশ তো সুখেই আছে অটবী, তবু তাকে ঘাঁটানো চাই! এই গ্রামে একজন মোড়ল আছে বটে—সুধন্য। কিন্তু সে শুধু নামেই মোড়ল। কার্যতঃ, কালে-ভদ্রে কোন বিচার-আচারের ব্যাপারে পঞ্চায়েতের বৈঠক বসলে তাকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা ছাড়া গ্রামের লোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ বড় কম। আসল মোড়ল এতকাল ছিল ঐ অটবী। কিন্তু এত বড় একটা সম্মানের আসন পেয়েও ব্যাটা খুসী নয়। যে-কোন অজুহাতে বলরামকে তার ঘাটানো চাই।

কাজেই এবার বাধ্য হয়ে বলরামকেও দাঁড়াতে হচ্ছে শক্ত হয়ে। দেশ-গাঁয়ের পাঁচজন লোক বিশ্বাস করে তার সঙ্গে এসে জুটল। তারাও বিরক্ত অটবীর উপর। এমন একটা দুয্‌মনের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করাটাও তো একটা কর্তব্য।

সে চুরি করে না, এরা চুরি করে। কিন্তু চুরি করে পেটের দায়ে জুয়াচুরি করে বলে এদের ঠেলে ফেলে দিলেই কি পুণ্যের কাজ হয়? এরা তার আপনার জন তো বটে।

বলরামের মুস্কিল এই সে মানুষটা বিবেচক। নানানদিক বিচার করে তাকে চলতে হয়। ভাবনা-চিন্তার জন্য সময়ও তার কম যায় না। ন্যায়ের পথে চলতে চায় বলেই তার এত ভাবনা। আবার একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সময়ও তাকে দেখতে হয় যে ফলে আরও বড় কোন অন্যায় প্রশ্রয় না পায়।

সোজা রাস্তায় চলতে পারলে খুসী হত, কিন্তু সোজা রাস্তা তার কপালে নেই। বাঁকা পথে বাঁকা ভাবে চলতে হয় বলেই লোকে মনে করে সে খামখেয়ালী। তার চরিত্রের নাকি কিনারা পাওয়া ভার। লোককে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ সত্যিই তার ব্যবহারে মিল পাওয়া মুস্কিল। এই যেমন, বাইরে সে এত ঠাট্টা-মস্করা করে অথচ বাড়ীর বৌ-ছেলের কাছে তার গাম্ভীর্য একেবারে দুর্ভেদ্য। এ নিয়ে দুষ্ট লোকে তার সম্পর্কে নানারকম অপব্যাখ্যা দিতেও ছাড়ে না!

বৌকে মাঝে মাঝে মারে বলে ছেলে-ছোকরার দল আড়ালে আবডালে তার সম্পর্কে নানা কথা বলে। সে সবও তার কানে আসে, কান তার সজাগই থাকে। অথচ গ্রামের বৌ-ঝিদের সে কত সময় জাওলা মাছ ধরার বাঁজি পরিষ্কার করার কাজ জোগাড় করে দেয়। মেয়ে মানুষের পক্ষে কাজটা কঠিন হলে সে সাহায্যও করে।

এইসব আপাত-বিপরীত ব্যবহারের পিছনে তার যুক্তি বিবেচনা কাজ করে। আসলে সে বিপরীত ব্যবহার করে বিপরীত অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে চায় বলে। এ গ্রামের আর পাঁচজনের মত তো সে নয়। সে ঝোঁকের মাথায় চলে না, স্রোতের মুখে খড়ের কুটোটির মত ভেসে বেড়ায় না। সব কাজ তাকে ন্যায়-অন্যায়, ভাল মন্দ বিচার করে করতে হয়। অনেক বড় বড় ভাল লোকদের কথা সে শুনেছে। তাঁরাও এইরকম করেন।

তার জীবনে পর পর তিনটি মেয়ের পদপাত ঘটেছে। এই তিনটি মেয়ের তিনটি সমস্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য তাকে কম হিমসিম খেতে হয় না। আর কেউ হলে এমন দুরূহ চেষ্টা করত না। একজনকে নিয়ে আর দু'জনের কথা ভুলে বসে থাকত। কিন্তু সেইটেই কি ন্যায়-সংগত কাজ হত?

তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েছিল ছেলে কার্তিককে প্রতিনিধি হিসাবে

রেখে। তারপর সে সুভদ্রা নামে একটি মেয়ের অনুরক্ত হয়ে পড়ে। বেশ ডাগর ডোগর সুন্দরী ছিল তখন সুভদ্রা। কিন্তু সুভদ্রার বাপটা একটা কসাই। দেড়শো টাকার কমে সে মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজী হল না কিছুতেই। সুন্দরী মেয়ে বলে তার অহংকার কত! তখন বলরামের বাপ বেঁচে ছিল। রেগে গিয়ে সে সিঁটকে চেহারার বিন্দুকে নিয়ে এল ছেলের বৌ করে। বলরাম সেদিন পিতৃ আজ্ঞা মেনে নিয়েছিল বটে, কিন্তু সুভদ্রার লোভ ত্যাগ করতে পারে নি। জোয়ান বয়স তখন তার, ঝোঁকের মাথায় চলার বয়স।

তাই বলে কি সে বিন্দুকে কখনো অনাদর করেছে? কক্ষনো না। স্বামীর যা-যা করণীয় সবই সে করেছে। রক্ষণাবেক্ষণ করা, ভাত-কাপড় দেওয়া, রোজগারের পথ দেখিয়ে দেওয়া, সবই সে করেছে। সৎ মায়ের কোপ দৃষ্টির মুখে কার্তিককে তাই বলে সে ভেসে যেতে দেয়নি। দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে বলে প্রথম পক্ষের ছেলে মেয়েদের ভুলে যাবে এমন বাপের পুত্র নয় বলরাম। আজ সকালে সেই প্রয়োজনেই বিন্দুকে মেরেছে। রাগের মাথায় মারে বটে; কিন্তু রাগ হয় বলেই মারে না। পিছনে অন্য কারণ থাকে।

বাড়ীতে সে গম্ভীর থাকে এ ছাড়া আরও একটা কারণে। সুভদ্রার সঙ্গে সম্পর্কটা তাকে এখনো বজায় রাখতে হয়েছে। প্রথম প্রথম ছিল নেশা, এখন দাঁড়িয়েছে কর্তব্য। কোন কামনা নেই; তবু মাঝে মাঝে সুভদ্রার ঘরে রাত কাটাতে হয়। সেই একই কারণে—সামঞ্জস্য-বিধান করা। সুভদ্রার বিয়ে হয়েছিল যার সঙ্গে সে একটা অকর্মণ্য, নপুংসক! স্বামী সে, অথচ স্ত্রীর সঙ্গে পরপুরুষের সম্পর্কটা দিব্যি মেনে নিয়েছে! গা ঘিন্ ঘিন্ করে ভাবতে গেলে। শিয়ালদার একটা মাছের আড়তে কাজ করে, থাকে কাছাকাছি এক বস্তীতে। প্রথম প্রথম সে যখন বাইরে থাকত, তখন বলরাম চুরি করে যেত সুভদ্রার সঙ্গে সম্পর্করক্ষা করতে। পরে সে টের পেয়ে এসেছিল তাকে ধমকাতে, কিন্তু উল্টো ধমক খেয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। টাকা দিয়ে একটা গুণ্ডা লাগিয়েছিল বলরামকে মারার জন্য। গুণ্ডাটা উল্টো মার খেয়ে পালিয়ে গেল। সেই থেকে লোকটা একেবারে কেঁচো হয়ে আছে। এমন কি নিজের বৌকে পর্যন্ত আয়ত্তে রাখতে পারল না এমন অপদার্থ লোকটা।

প্রথম প্রথম সে সুভদ্রাকে এটা-সেটা জিনিস নিত। সুভদ্রা তার বদলে টাকা চাইল। সে টাকা দেওয়াটা কালে কালে প্রায় একটা নিয়মিত বৃত্তিতে দাঁড়িয়ে গেল। অনেক সময় গেঁজেল স্বামীটা পর্যন্ত আসে টাকা নিতে। কত বড় নির্লজ্জ বেহায়া। সামান্য আয়ের থেকে এই টাকা দিতে বলরামকে কম বেগ পেতে হয় না। তবু দিতে হয় টাকা। বিয়ের পাঁচ মাস পরে সুভদ্রার যে ছেলে হয় হিসাব করে দেখা গেছে সে ছেলে বলরামেরও হতে পারে। কাজেই সে ছেলের দায়িত্ব বলরাম অস্বীকার করতে পারে না। পাঁচ জনের প্রতি কর্তব্য পালন করতে করতেই, পাঁচ দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে রাখতেই যে বলরাম শেষ হওয়ার জোগাড় হয়েছে! একটু নিশ্বাস ফেলবার, নিশ্চিন্তে একটু আনন্দ করবার ফুরসৎ তার নেই। এমনি করেই কষ্টের মধ্যে ফেলে পরীক্ষা করেন ভগবান সৎলোকেদের।

ভাগবতকাকা অবিশ্যি বলেন, পরস্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটাও পাপ। আবশ্যি স্ত্রীর পক্ষে পরের স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা আরও বেশী পাপ। কিন্তু কী করবে বলরাম? সুভদ্রা চায় যে—বেশী পাপেও তার আপত্তি নেই। আর বলরাম না গেলেও টাকা তাকে দিতে হবেই - না হলে সুভদ্রাটা না খেয়ে মরবে। গেঁজেল সোয়ামীটা সামান্যই রোজগার করে; আর সৌখীন মেয়ে সুভদ্রা, এমন মেয়ে নয় যে বিন্দুর মত রোজগার করতে পারবে। টাকা দিতেই হবে, অথচ বদলে কিছুই নেবে না, সেটা কেমন হয়? অবিশ্যি দান করা খুব ভাল জিনিস, কিন্তু খুব পুণ্যবানেরাই সে কাজ করতে পারে। যেমন রাণাঘাটের কর্তাবাবুকে করতে দেখেছে। কিন্তু তার কি এমন কপাল যে সে অমন পুণ্যবান হবে?

ভাগবতকাকা তো বলবে যে চোরেদেরও সাহায্য করাটা পাপ। সে যে কয়েকটি চোরের মোড়ল হল এটাও ভাল কাজ নয়। কিন্তু কী করবে সে? এত ভেবে-চিন্তে বিবেচনা করে কাজ কোরছে সে, তবু তো পুরোপুরি সৎ হতে পারছে না! কী উপায় আছে তার? ভগবান হয়তো এমনি করেই তাকে পরীক্ষা করছেন। ভাগবতকাকার ভাষায়, তিনিই যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র।

সন্ধ্যাবেলায় মাংস আর তাড়ীর আসর বসল যথারীতি। বড় ভাঁড়ের চার ভাঁড় তাড়ী এসেছে। সবাই এসে বসেছে, কিন্তু অন্যান্য দিন এরকম ক্ষেত্রে যেমন আসর জমে ওঠে, আজ আর তেমন জমল না। গাঁ-এর লোকেরা যে দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। বাইরে অবিশ্যি এ-পক্ষের লোকের হাত থেকে ও-পক্ষের লোক হাত বাড়িয়ে তাড়ীর গ্লাস তুলে নিচ্ছিল। ঠাট্টা-রসিকতাও যে দু-চারটে না চল্‌ছিল এমনও নয়। কিন্তু অলক্ষ্যে ব্যবধানের একটা কাঁটা যেন খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধছিল সকলের মনে।

খানিক পরে এলো সুধন্য মোড়ল। বাড়ীতে যত্ন করে কাচা ফুল-হাতা সার্ট গায়ে। তামাটে রঙের মুখখানা সদাই হাস্যময়। একটা আত্মগর্বের ভাব যেন উপ্‌চে পড়ছে। রোদে, জলে কাজ করার ফলে গাঁয়ের আর সকলের মুখে যেমন একটা রুক্ষতার ভাব আছে, তার মুখে তা নেই।

সুধন্য গাঁয়ে থাকলেও তার গায়ে অন্ততঃ একটা ফতুয়া থাকবেই। তার বাড়ীর মেয়েরা এমন কি মাঝে মাঝে তাঁতের শাড়ী পরে। তারা আর কারও বাড়ী বেড়াতে যায় না। ছোট ছেলে কালকেপুরের পাঠশালায় যায় পড়তে। পাঠশালায় অবিশ্যি এ-গ্রামের ছেলেদের মধ্যে আরও কেউ কেউ যায়। কার্তিক যেত, কাঁঠাল যায় এখনো। কিন্তু তারা সবাই যায় মাঝে মাঝে। হঠাৎ এক একদিন তাদের অভিভাবকদের খেয়াল হয়, ছেলে তো নিয়মিত পাঠশালায় যাচ্ছে না। তখন পিঠে সপাসপ বাঁশের লাঠি পড়ে, যেতে হয় লম্বা এক ক্রোশ পথ হেঁটে পাঠশালাতে কোন রোজগারের আশা নেই জেনেও। সেখানে একমাত্র লাভ এই যে পরামাণিকদের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ীটা দেখা যায়। আর সেই দীঘিটা—যেখানে পদ্মফুল ফোটে আর রাজহাঁস চরে। কিন্তু মাষ্টারমশাইদের রুক্ষ প্রশ্নের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে শুধু একটা কথাই মনে হয় যে বাপ-খুড়োদের যদি কিছু না শিখেও জীবনটা কেটে যেতে পারল তবে তাদের বেলায় এ-যন্ত্রণা কেন?

কিন্তু সুধন্যর ছেলে নিয়মিত যায় পাঠশালায়। মাত্র বারো বছর বয়সেই সে নাকি ফোর কেলাশে পোড়ছে। এবারে একটা পরীক্ষা দিলেই সে নাকি মাস মাস টাকা পাবে। এই ছেলেট ছাড়া এ-গ্রামে বর্ণমালার সবটা শিখে

ফেলেছে আর একমাত্র ধুব (ধ্রুব)। জাঁক করে বলে সে কথাটা—তারা অবিশ্যি পরীক্ষা করে দেখেনি।

কাজেই সুধন্য এ-গাঁয়ে শিয়ালদের মধ্যে সিংহরাজ। এত চালের খরচ সে কি করে যোগাড় করে কেউ জানে না। কিন্তু তাকে সবাই খাতির করে, একটু বা ঈর্ষাও করে, আবার সময়ে অবজ্ঞাও করে। কিন্তু তার ছেলেকে, বাবুদের নামের অনুকরণে তার আবার নাম রাখা হয়েছে রবি, সবাই অনুকম্পা করে। ছেলেটা না হবে ভদ্দর লোক, না হবে বাগ্‌দী।

এ-হেন মোড়ল আসতেই সবাই সম্মান করে তার দিকে সবচেয়ে বড় জলচৌকিখানা এগিয়ে দিল। তাড়ীর গ্লাসটা ভালো করে ধুয়ে তাতে তাড়ী ভর্তি করে একজন ডান হাত দিয়ে এগিয়ে দিল আর সম্মানের চিহ্ন হিসাবে বাঁ-হাতখানা ঠেকিয়ে রাখল ডান হাতের কনুইতে।

সুধন্য ইতিমধ্যে হাসতে হাসতে গল্প জুড়ে দিয়েছে। বলল, 'আর বল কেন ভাই? সময়মত আসতে পারলামনি কোনমতেই। সকালবেলায় গিইছিলুম সেই নিধিরাম বাগের কাছে। একটা কাজ ছেল! তা বাগ ছাড়লনি কিছুতেই। চাট্টি খেতে হল সেখানেই। আর জানই তো বাগ দারুণ মদ্যপ। গেলাস দুই পেসাদ পেতে হল। বেলাতী মদ—কী স্বাদ তার! সেখান থে' গেলাম আজশেখর মুকুজ্জের গদীতে। বাবু বড্ড আদর করেন মোকে। দেখলে আর ছাড়তে চান না। বললেন, তাঁর বারুইপুরের সম্পত্তিটার কিছু করতে পারতেছেন না আমার পরামশ্য ছাড়া। কী করি ঠায় তিন ঘণ্টা কাটল সেখানে। তা তোমাদের এ তাড়ীটা কে দিয়েছে? সীতেরাম বুঝি? খারাপ দেয়নি জিনিসটা। বেলাতীর গন্ধটা লাকে রয়েছে স্বাদটা ভালো পাচ্ছিনি কো।

যত্ন করে পকেটে দুটো করে পয়সায় দামের একটি সিগারেট বের করে ধরালো মোড়ল। আবার বলল, 'এমন হয়েছে—বিড়ির বাসটা মোটে সইতে পারিনি। কম পয়সা যায় না এই সিগ্রেটে!'

সবাই তাকিয়ে রইল সেই নীল ধুম উদ্গারণকারী শ্বেতশুভ্র সিগারেটটার দিকে। তাদেরই মধ্যেকার একজন বাবুদের মত সিগারেট খায় এ কী কম

কথা ! বাবুদের সিগারেট খেতে দেখলে তারা ফিরেও তাকায় না। কিন্তু বিড়ি খেতে দেখলে অবজ্ঞাভরে ভাবে, ‘বাবাজী, তোমার তবে হয়ে এসেছে ?’

নিধু কাছেই বসেছিল, না বলে পারল না ‘বেশ বাস বেইরেছে কিন্তুক সিগ্রেটের ধোঁয়ায়।’

সুধন্য তার দিকে তাকিয়ে সগর্বে একটু হাসল।

বলরামের দলের এক সাকরেদ মোড়লের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় জানিয়ে দিল গ্রামের দলাদলির ব্যাপারটা। কারণটাও। এমন গুরুতর ব্যাপারের একটা মীমাংসা কি করবে না মোড়ল খুড়ো ! এতটুকুন গাঁয়ে এমন দলাদলি হওযা কি ভাল ? শুধু একটা লোকের জন্য।

সুধন্য ভারিক্কি চালে গম্ভীর হয়ে শুনছিল কথাগুলো। মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ছিল, মাঝে মাঝে কপালটা কুঁচকিয়ে নিচ্ছিল।

একটু দূরেই বসে অটবী যেটুক্ শুনতে পাচ্ছিল তাতে মোটামুটি আলোচনার বিষয়টা বুঝতে তার অসুবিধা হচ্ছিল না। তার ভাবটা নিতান্ত নির্লিপ্ত। এক সময়ে হঠাৎ বলল, ‘তাড়ীর ভাঁড়গুলোর দিকে লক্ষ্য আখিস্ রে ! শেয়াল ফেয়ালে টেনে না নে’ যায়।’

‘শেয়াল ফেয়াল’ কথাটার উচ্চারণ ভঙ্গীটা অনেকেরই কানে খারাপ লাগল। এত ভীড় যেখানে সেখানে শিয়াল যে ত্রিসীমানেও ঘেঁষবে না তা সবাই জানে। কাজেই অটবী যে মানুষ-শিয়ালদের কথা বলেছে তা বুঝে অনেকের গা নিসপিস করতে লাগল। কিন্তু কথাটা পরোক্ষ বলে উপেক্ষা করাই ভাল বলে তারা মনে করল। ঝগড়াটা লাগল না অল্পের জন্য।

মোড়ল সেদিকে খেয়াল না করে বলল, ‘তা তোমরা আলেদা আলেদা হয়ে কাজ করবে বেশ তো ! ক্ষেতি কি তাতে ? হিংসের ভাবটি রাখবেনি মনে। তবেই হল। বাইরের কেউ যেন কোন তফাৎ বুঝতে না পারে। কী বলছ হে অটবী, খারাপ বললাম কথাটা ?’

কার কার মনের উপর যে কথাটা ঠাণ্ডা জল নিক্ষেপ করল মোড়ল তার হিসেব রাখল না।

তারপর অনেকক্ষণ বিরতির পর যখন আবার ঝির ঝিরে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল,

তখন সেই হাজরার 'থানের' ভিজে খাসের উপর চাটাই বিছিয়ে বসে খোলা আকাশের নিচে বলরাম উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরল :

সখি, কেমনে বাঁধিব হিয়া

আমারি বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারিই আঙিনা দিয়া।

আর কার্তিক, কাঁঠাল, আন্না, লক্ষ্মী পেল্লাদ প্রভৃতি আট থেকে ষোল বছরের দলটি অন্ধকারের মধ্যে এলোমেলো নাচ জুড়ে দিল। গ্রামের সম্পদ একমাত্র ঢোলকটি যজ্ঞেশ্বরের হাতে ডুগ্‌ডুগ্‌ করে বেজে উঠল। মোড়ল চোখ বুজে মুখে মৃদু হাসি নিয়ে সমঝদারের ভংগীতে মাথা দোলাতে লাগল। আর একপাশে দুটি টিমটিমে লণ্ঠন একটা খোলা ছাতার নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল ব্যঙ্গের হাসি।

এতক্ষণে নেশা জমেছে সকলের মনে। জমে উঠেছে আসর।

তিন

পরদিন সকাল বেলা জমিদারের তলব নিয়ে এসে পেযাদা যখন চোর বলে আটদশ জনকে ধরে নিয়ে গেল, তখন অটবী ছিল বাইরে। মনসাপোতার ভেড়ীর থেকে একটা কাজের খবর এসেছিল। খুব সকালে উঠে অটবী গিয়েছিল দরদস্তুর করতে। হাতে একটা ট্যাঁটা নিয়েছিল সঙ্গে। যদি ল্যাটা ফ্যাটা দু' একটা জুটে যায় তবে দুপুরের একটা ঝোল হয়ে যাবে।

ইজারা নেওয়া ভেড়ী-ভাড়াতে ট্যাঁটা মারা নিষেধ। ন্যাংটো ছোঁড়াগুলো অবিশ্যি ট্যাঁটা বড়শি নিয়ে ঘোরে, দারোয়ানে তাড়া করলে দৌড় মারে। বড়রা তা পারে না, তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে তো! তবু অটবী ট্যাঁটা নিয়ে গিয়েছিল। মাঝ পথে একটা সরকারী নালা পড়বে, সেখানে চেষ্টা করে

দেখবে। আর যদি কোন ভেড়ীতে জো মত কোন মাছ মিসে যায় তবে অবিশ্যি ছেড়ে দেবে না।

বেলা প্রায় ন'টার সময় অটবী ফিরে এল, বড় বড় দুটো শোল হাতে নিয়ে। মাছ দেখে রাধা মহা খুসী।

'দু'সেরের কম হবেনি। তবে আমি বাজারে নে' যাই, কি বলগো?'

'তোর বড় পয়সার খাক্‌তি, রাধি। তার থে' পেট-পূজো কর্ না, কাজ দেবে।'

'উ হুঃ! মরা মাছ যদিও, তবু টাকা পাঁচসিকা তো মিল্‌বে'খুনি গেলেই। আমি যাব আর এসব।'

এখান থেকে গড়ের বাজার এক ক্রোশ দূর, যাদবপুরের বাজার দেড় ক্রোশ র। কিন্তু রাধাকে নিষেধ করা বৃথা। সে যাবেই। বৌ-এর উপর মনে মনে একটু রাগল বটে অটবী, তবু ভাবল, একটা টাকা যদি পাওয়া যায় তো মন্দ কি?

সকলে জমিদার বাড়ীতে গিয়েছে খবর পেয়ে অটবী অমনি সে-দিকে রওয়ানা হল।

চোদ্দ বিঘা জমির উপর বিরাট বাড়ী বটে জমিদারের, কিন্তু সে-বাড়ীতে বাঁশ-ঝাড় আছে, কচুরি-ভর্তি ডোবা আছে, আগাছা শিমুল-পলাশের বন আছে, আবার ফুলের বাগানও আছে। যে পথ দিয়ে বৈঠকখানা বাড়ীতে ঢুকতে হয় তার দু-পাশেই বাঁশ দিয়ে যত্ন করে ঘের করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, একদিকে ফুলের আর একদিকে শোভন আনাজের বাগান করা! একদিকের ঘেরের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে গাদা করা রয়েছে গোবর, বোধকরি ভাবী ফুল-বাগানের সার তৈরী হচ্ছে। কিন্তু উপস্থিত যা গন্ধ ছড়াচ্ছে! তার পাশে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভাঙা পুরোনো টিন আর কাঠ আর অন্যান্য আবর্জনা। আর এক পাশের বাগানে রাশীকৃত বড় ঘাসের মধ্যে ক্কচিৎ কোথাও দু'একটা বেগুন লঙ্কা বা ডাঁটার চারা দেখা যাচ্ছে। বাগান করা সখ বটে বাবুর, কিন্তু বাগানের এই চেহারাই অটবীরা দেখে আসছে বহুবছর ধরে। একটা মালী আছে,—বুড়ো, প্রায় অথর্ব। তার সকালটা কাটে বৈঠকখানায় কর্তাবাবুর তামাকসাজতে সাজতে, আর এটা সেটা ফাই-ফরমাস খাটতে খাটতে।

দুপুরটায় আসে সাধা নিদ্রা। বিকেলে গোটা তামাক কুচোনো আছে আর আছে গিন্নীর বাইরের কাজের এটা-সেটা ফরমাস ; বাগানের জন্য কাজ করার অবকাশ সে পায় বছরের মধ্যে দু'চারদিন।

একতলা বাড়ীটা মস্ত,—বাইরে যতটা দেখা যায়, ভিতরে তার চেয়েও বেশী। বছর পাঁচেক আগে বাড়ীটা বড় করার ঝোঁক চেপেছিল বাবুর। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ভিৎ তৈরী হয়ে কয়েকখানা থাম উঠে গিয়েছিল অনেকদূর অবধি। সে-অবস্থায়ই পড়ে আছে জিনিসটা এতদিন। অথচ ইতিমধ্যে খড়িয়ার বাজারের ধারে তিন চারখানা গোটা বাড়ী তৈরী হয়েছে, আর যাদবপুরে একখানা দোতলা বাড়ী যা উঠেছে তাকিয়ে দেখবার মত। কথাটা কেউ উল্লেখ করলে বাবু বলেন, পয়সার অভাবেই তো তাঁর সবকিছু পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। বাস্তবিক, বড়লোকদের মনোভাব সব সময় বুঝে ওঠা যায় না।

এতবড় বাড়ী—বাইরেটা ইঁট বার করা, আস্তর করা হয়নি। রোদ বৃষ্টি পড়ে জায়গায় জায়গায় বিশ্রী কালো শ্যাওলা জমে উঠেছে। তেমনি বিশ্রী নোংরা পড়ে আর তিনভাগ জুড়ে তক্তোপোষ পাতা বৈঠকখানা ঘরখানা।

বৈঠকখানার কাছাকাছি এসে অটবী দেখল তার গাঁয়ের লোকেরা বিরস মুখে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে ; আর একটু দূরে পোশাকধারী দারোয়ান থামে হেলান দিয়ে লাঠিটা বোগলদাবা করে খৈনি টিপছে।

কয়েকদিন অনর্গল বর্ষণের পরে আজকে প্রসন্ন আকাশে সূর্য উঠেছে। তীব্র মেঘ-ভাঙা রোদে এই পথটুকু আসতেই অটবী শ্রান্ত হয়ে পড়ল, গা ঘেমে চট্‌চটে হয়ে গেছে। আর সেই রোদের মধ্যে খালি গায়ে এ-লোকগুলো দাঁড়িয়ে কেন ?

'ব্যাপার কি ? এখানে ডেঁইড়ে যে সব ?' অটবী উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করল।

'সখ করে।' নিতাই জবাব দিল।

যজ্ঞেশ্বর বলল, 'আমরা নাকি চুরি করেছি। তার শাস্তি।'

অটবী তাই অনুমান করেছিল। আরক্ত মুখে ঢুকল গিয়ে।

অজস্র কালির ছোপে রঞ্জিত ফরাসের উপর স্তূপীকৃত খাতাপত্তর। খেঁড়ো-

বাঁধানো খাতাই বেশী। খাতার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বসে আছে নায়েব হেমন্ত আর বাবুর মেজছেলে বীরু। সামনের দিকে একটা থামে হেলান দিয়ে অলস ভংগীতে বসে আছেন কর্তাবাবু। আধময়লা একটা বোতাম-না লাগানো ফতুয়া আর হাঁটু-অবধি তোলা কাপড় পরা। সামনের দিকটা অনাবৃত বলে সংকীর্ণ বুক আর বর্দ্ধিষ্ণু পেটের অসামঞ্জস্যটা বড্ড বেশী চোখে পড়ে। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। মাথার আদ্ধেকটা টাক, কপালের একপাশে একটা আব বলের মত ফুলে রয়েছে। বাজখাঁই গলা। থেমে থেমে দুটো চারটে করে কথা বলেন, আর গড়গড়ার নল থেকে টেনে নিয়ে ভুক্ ভুক্ করে ধোঁয়া ছাড়েন। ছাই-সুদ্ধ একটা পিকদানি আছে নিচে, কাশতে গিয়ে কাশি উঠলে পিকদানিটা হাত দিয়ে তুলে তার মধ্যে ফেলেন।

একপাশে দু'খানা টুল পাতা—চাষী-সামান্যিদের বসবার জন্য। আর একপাশে গোটা কয়েক চেয়ারে ভদ্রলোকেরা বসেন। এক কোণে একটা টেবিলে কত যে নাম-না-জানা ভাঙাচোরা জিনিস, যায় চা-এর তলানি-সুদ্ধ কাপ পর্যন্ত। সবই পুরোণো আসবাব, ব্যবহারে কালো হয়ে গিয়েছে।

কোনদিন নতুন ছিল কি আসবাবগুলি? যেমন অন্যান্য ভদ্রলোকদের বাড়ীতে দেখা যায়, তেমন?

বৈঠকখানা ঘরে অনেক লোক। চেয়ারে দু'জন ভদ্রলোক, সস্তায় জায়গা কেনার লোভে এসেছেন। বেঞ্চিতে সাত-আট জন,—জন দুই আধা-ভদ্রলোক। মোসাহেব গোছের, প্রায়ই দেখা যায় এখানে। একজন বসে আছে একেবারে ফরাসে কর্তাবাবুর মুখোমুখি। কতকগুলি কাগজ-পত্তর সামনে।

অটবীর দিকে কর্তাবাবু শুধু একবার তাকালেন। নায়েব হেমন্তবাবু কিন্তু দেখতে পেয়ে কথা বললেন।

'এতক্ষণে এইচ বাছাধন? প্যায়দা যে গিয়েছিল সেই সকালে।'

'সকালে ঘরে ছিলাম না।'

'বস।' বলে কর্তাবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'বাবু, অটবী এইচে! ওকেও কি রোদে দাঁড়াতে বলবেন?'

কর্তাবাবু অটবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলছি, বস।' তারপর সামনের

লোকটির দিকে ফিরে, 'দু-দশ ছটাক জমির জন্য ঝগড়া করে কী আর করবেন কেদারবাবু? যার জমি তাকেই ফিরিয়ে দিন না। জানেন তো, আমরা ন্যায় অন্যায় কাজ যা-ই করি, সবই কড়ায় ক্রান্তিতে জায়গামত জমাখরচের ঘরে হিসাব হয়ে যাচ্ছে। অন্যায় করে কেউ বড়লোক হয়েছে এমন পাবেন না, মশাই।'

কেদারবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'তা তো ঠিকই। তবে—।'

নিবারণ, বোধকরি একজন মোসাহেব, বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু বাবু মানুষ কিন্তু অনেক সময় ভাগ্যের জোরে বড়লোক হয়।'

'না, হয় না। বিশ্বাস করি না। পুণ্যের জোর না থাকলে কেউ কখনো ধন-দৌলত-সুখ ভোগ করতে পারে না।'

'কিন্তু এই ধরুন, আপনি—।'

'আমি? আমার কথা বলছ? আমি নিজের চেষ্টায় জমিদার হয়েছি এ-কথা ঠিক। কিন্তু কি জানো, পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে এ-সব হয় না।'

কথাটা বলে ফেলে লোকটা একটু চিন্তিত হয়েছিল। কী জানি, কত্তাবাবু যদি চট্‌ ক'রে জবাব দিতে না পেরে বিব্রত বোধ করেন। মুখের মত জবাব পেয়ে যে শুধু আশ্বস্ত হল তাই নয়, তার মুখে গর্বের ভাবও ফুটে উঠল। বোধকরি কত্তাবাবুর জন্য।

তারপর কিন্তু কেদারবাবুর সঙ্গে কাজের কথা বললেন কত্তাবাবু। সেটা শেষ হ'ল তো ফিরলেন বাবু দুটির দিকে। সে তো ফিরবেনই; বাবুতে বাবুতে ধূল পরিমাণ! কত্তাবাবু যত হাসেন বাবু দুটি হাসেন তার চারগুণ। কী দাঁত বের করা হাসি! তাঁদের বাড়ীতে কত্তাবাবুকে একবার পায়ের ধূলো দেওয়ার জন্য কী সনির্বন্ধ অনুরোধ। চাষী-জমিদারের উপর কায়েত ভদ্দরলোকের ভক্তি একেবারে উথলে উঠেছে! যত সব ভণ্ড! বোধহয় কাজ করে কোন সাহেবের অফিসে। ফরসা পিরাণ গায়ে দিয়ে ফ্যানের হাওয়ার নিচে বসে কাগজের উপর দাগ কাটেন আর বলেন, 'আজ কী গরম মাঈরী!' মাসান্তে হাত পেতে মাইনে নেন তিনশো কি পাঁচশো কি আরও বেশী।

ভদ্রলোক দু'জন শেষ পর্যন্ত বিদায় নিলেন যা হোক। যাওয়ার বেলা ভদ্দরলোক দুটির তো বড় কষ্ট হবে! নিজেদের গাড়ী নেই, ট্যাক্সী করে আসবে তা-ও মুরোদে কুলোয়নি। বাবুর বাড়ি থেকে আধ মাইল খোয়া-ওঠা পথ হেঁটে তবে তো পাবেন ৮০ নম্বরের বাস। সেখানে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি ভীড়ে রড্ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে পা-দানির উপর। কী কষ্ট! আ-হা-হা!

গাড়ীর জন্য হা-হুতাশ করতে অটবী শুনেছে অনেক ভদ্রলোককে। সব ভদ্রলোকেরই কেন যে একখানা করে গাড়ী হয় না! ভদ্রলোক অথচ গাড়ী নেই—এটা একটা প্রকৃতির বিপর্যয়। ওদের বেতুইওলারা ভেড়ী যিনি কোরছেন, সে ভদ্রলোকেরও গাড়ী নেই। যাদবপুর থেকে তিন মাইল কাদা রাস্তা ডিঙিয়ে তবে যাবে ভেড়ীতে! কী কষ্ট ভদ্রলোকের! গাড়ী নেই অথচ ভেড়ী করার সখ আছে!

ভদ্রলোক দু'জন উঠলেন, তবু কত্তাবাবুর চোখ অটবীর উপর পড়ল না। অটবী বিরক্ত হয়ে উঠল। জমিদারের বাড়ী এলেই একটা বেলা নষ্ট। লোকগুলোকে বসিয়ে রেখে দেখানো হয় তাঁর কত প্রতাপ। তাঁর জন্য অপেক্ষা করে ঘর ভর্ত্তি লোক! যত সব—

অটবী বলে উঠল, 'আজ্ঞে কত্তাবাবু আমার কথাটা—।'

'শুনছি। আর একটু, ব'স অটবী।' বলে কাঞ্চনবাবু এবার মন দিলেন আধা-ভদ্রলোকদের প্রতি। যার দিকে তাকিয়ে কথা বললেন, সে সম্বোধিত হওয়ার আনন্দেই কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ্ হয়ে উঠল।

'এবারে সব্ ঠিক করে এইচি বাবু। পি এম্ ঠাকুর বললেন, মশায়কে বোলো খুব সিম্পল কেস। ডিগ্রী অনিবার্য। একশ'র কমে এজলাসে দাঁড়ান না, তবে আপনার সম্মানে পঞ্চাশেই রাজী হ'য়েছেন।'

কথাবার্ত্তায় অটবী বুঝতে পারল, এ সেই জোড়া-মন্দিরের পলাশবাগানের মামলা। বাবুর পয়সা-না-দিয়ে-কেনা সম্পত্তি, আগের মালিকের সঙ্গে মামলা লেগেছে। মোকদ্দমা চলছে হাইকোর্টে। শোনা যায়, কত্তাবাবু নাকি বলেছেন ষাট হাজার টাকা খরচ করতে পারলে এই বারো লাখ টাকার সম্পত্তিটা

তাঁর হয়ে যাবে। সে কথা তারা বিশ্বাস করে। আশ্চর্য ক্ষমতাশালী লোক এই কর্তাবাবু—কোথাও তিনি হারতে জানেন না। তাঁর নজরে পড়ে গেলে বাংলার লাট-গিরিও বোধকরি তিনি মামলা করে জিতে নিতে পারেন।

আর সম্বোধিত এই অতি সদাশয় ব্যক্তিটিকেও অটবী চেনে। এই বৈঠকখানা ঘরেই দেখেছে অনেকবার। এই আধময়লা পোশাক-পরা, রোদে-পোড়া মানুষটির যে-কোন বড়লোকের বাড়ীতে অবাধ যাতায়াত। তাকে না হলে চলে না কারও—না উকিলের, না জমিদারের, না কারবারীর। বড়লোকের পায়ে পায়ে ঘুরে জুতোর সোল তো অনেক ক্ষয় করলে, দাঁত তো বহুবার বিকশিত করলে, কিন্তু কলকাতায় ক'খানা বাড়ী তুলতে পেরেছ হে গো-মূর্খ!

সেই প্রসঙ্গটা হয়ে গেলে অটবী কত্তাবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আর একবার চেষ্টা করল।

'কত্তাবাবু, এবার আমার কথাটা।'

'হবে হবে। আর একটু সবুর কর।'

এবারে কত্তাবাবু যার দিকে ফিরলেন, সে দেওয়াল ঘেঁসে একটা চেয়ারে পা তুলে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল। জীর্ণ শীর্ণ মানুষটা এমন চুপটি করে বসেছিল যে, অটবীর চোখেই পড়েনি এতক্ষণ। এবারে তাকিয়ে চিনতে পারল। আরে, এইতো মনসা পোতা ভেড়ীর ম্যানেজার! গুণী ব্যক্তি কি মনে করে এখানে?

তার দিকে তাকিয়ে কত্তাবাবু বললেন, 'তা হলে দেখলেন, আপনার মামলার বিচারটা ভালই করলাম, কী বলেন? যদি থানায় যেতেন, তবে দারোগার পিছে পিছেই ঘুরতেন তিন মাস। তারপর কেস তো ডিস্‌মিস হতই, —সাক্ষী প্রমাণ তো কিছু নেই।'

এবারে সেই হাঁড়ি-মুখো কেষ্টবাবুটি আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি হাসলেন। অতটুকু মুখ যে হাসলে পরে এতখানি বিস্ফারিত হতে পারে, তা কে জানত!

'আজ্ঞে তা তো সত্যিই। আপনার ন্যায়-বিচারের ভরসাতেই তো এ-সব জায়গায় টিকে থাকা। চারদিকে সব বাগদী-ক্যাওড়াদের বাস—খুন-ডাকাত যাদের পেশা।'

'আমার প্রজাদের থেকে যদি আপনার একমুঠো ধুলোও খোয়া যায় তবে আমি তক্ষুণি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করব। প্রজাদের শাসনে না রাখতে পারলে কী আর এতবড় জমিদারী চালাতে পারি? আর ভেবে দেখুন না, আপনার এক ভেড়ী থেকে খাজনা পাই পাঁচ হাজার। আর পাঁচশো প্রজা মিলে আমাকে পাঁচ হাজার দেবে কিনা সন্দেহ। কার স্বার্থ আমি আগে দেখব নিজেই বুঝুন। দেখছেন তো, ওদের রোদে বসিয়ে রেখেছি। সূর্যাস্ত অবধি থাক না বসে। জালটা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছি। তার ওপর জরিমানা তাও আদায় করব অন্ততঃ জন পিছু পঁচিশ টাকা। এ-ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে ওদের এখন ঢের দেরী। তদ্দিন যান, নাকে তেল দিয়ে ঘুম লাগান গিয়ে।'

আর একবার সেই কান পর্যন্ত হাসি হেসে এবং মিষ্টিগলায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ম্যানেজার বিদায় নিল। অটবীর ভাগ্য ভাল বলতে হবে। সে তবু দেখতে পেল এমন একটা মানী লোকের হাসি এবং শুনতে পেল তার মিষ্ট কথা। আর কারও ভাগ্যে এ জিনিস জোটে বলে শোনা যায় না।

অটবী আবার চেষ্টা করল, 'কত্তাবাবু, তা হলে আমার কথাটা—'

'হ্যাঁ, তোমার কথাটা। তোমার আবার কথা কি! তুমি তো আসামী।'

'আজ্ঞে, আপনাকে গোপনে একটা কথা বলব। এসবেন এট্টুন পাশের ঘরে?'

'আবার উঠতে হবে? আচ্ছা, শুনি দেখি, কি বলতে চাও।'

একটা ভেজানো দরজা ঠেলে জমিদারের গোপন পরামর্শ ঘরে ঢুকল অটবী জমিদারের পিছনে। একজন সামান্য প্রজা, চুরির আসামী, তার কথা শুনতে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার এতখানি কষ্ট স্বীকার কোরেছেন, ভাবতেও বেশ কৌতুক বোধ হল অটবীর।

'ওদের রোদে ডাঁড় করে রেখেছেন কেন কত্তাবাবু?'

'বেশ কথা! চুরি করলে তার শাস্তি পেতে হবে না?'

'সে কথা যথার্থ, কত্তাবাবু। অন্যায় করলে তার শাস্তি আছে। আচ্ছা কত্তাবাবু, লেখাপড়া করা দলীলের যে মূল্য, মুখের বাক্যিরও তো সেই মূল্য, না কি বলছেন?'

'মুখের কথার উপর লাখ লাখ টাকার মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে।'

'তবেই বলুন, মুখের বাক্যি যে রাখে না সে-ও অন্যায় করে, না কি বলছেন?'

'তুই কি বলতে চাস্ বল্ না।'

'আগে বলুন, কথাটা ঠিক কিনা?'

'একশোবার ঠিক। কিন্তু কি বলতে চাস?'

'ঠিক যদি বলছেন, তবে মোদের জমিটা দিচ্ছেননি কেন?

'জমি? কিসের জমি?'

'ভুলে গেলেন নাকি কত্তাবাবু? জমি দেবেন, পিতিজ্ঞে করেছিলেন না?'

এতক্ষণে কাঞ্চন রায় একটু হাসলেন। অটবী ভাবল, বিব্রত হয়ে। কিন্তু আসলে, অটবীর কথা টেনে আনবার কায়দাকে তারিফ করে।

'তোদের জমি দেব না এমন কথা কি বলেছি কোনদিন? সময় যখন আসবে, দেব।'

'কিন্তুক সময় যতদিন না এস্‌বে, ততদিন মোরাও চুরি করব।'

অটবীর মনে হল, তার এমন স্পষ্ট ঘোষণায় জমিদার যেন একেবারে নিভে গেলেন।

'চুরি করিস না তা তো আমি কোনদিন বলি না। বলি কি? কিন্তু চুরি করে এমন ধরা পড়ে যাস কেন? ধরা পড়ে আমাকে বিপদে ফেলিস কেন? পাঁচ হাজার দশ হাজার করে খাজনা দেয় ওরা—ওদের দিকটাও তো দেখতে হয়। তা যাক গে যাক। আজ তোরা যা, ওদের আর রোদে দাঁড়াতে হবে না। কাল সন্ধ্যের পরে এসে জাল নিয়ে যাবি। জরিমানা—তা পঁচিশ না দিস, দশ করে দিলেই চলবে।'

কী মোলায়েম শোনাচ্ছে ডাকসাইটে জমিদার কাঞ্চন রায়ের গলা! দরকার শুধু একটু জায়গা মত চাপ দিতে পারা!

'জরিমানাটা একেবারে মাপ হয়নি কত্তাবাবু?'

'না। ওটা আমার ট্যাক্স। কিছু না দিতে হলে তো চুরির টাকায় তোরা বড়লোক হয়ে যাবি। আর শোন, পরশু সন্ধ্যেয় তুই-ও আসিস, কথা আছে।'

এ-ঘরে ফিরে এসে নায়েব হেমন্তবাবু আবার বললেন কাঞ্চনবাবুর দিকে তাকিয়ে, 'তা হলে অটবীও এবার রোদে গিয়ে দাঁড়াক, না কি ?'

একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল অটবী হেমন্তবাবুর দিকে। যে কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করল, বলল না, সেটা এই, 'এত গরজ কিসের রে তোর, আঙুল-ফোলা কলাগাছ ? ক'টাকা মাইনে পাস ?'

জমিদার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে পথে যেতে যেতে অটবী সমস্ত ঘটনা শোনালো সবাইকে। কেউ কেউ শুনে এটা সেটা মন্তব্য করল। কিন্তু অটবী যে তাদের জন্য একটা সকাল নষ্ট করে এতখানি করল, এতখানি বুদ্ধির পরিচয় দিল, সে জন্য কেউ তাকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানালো না। ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা তার প্রাপ্য বলে অটবী একবারও মনে ভাবল না। বিরোধী দলের যারা ছিল তারা ভাবল না অটবী তাদের প্রতি কিছু অধিকন্তু দাক্ষিণ্য দেখিয়েছে। অটবী মনে করল না যে বিরোধী দলের ক'জনকে সে অনায়াসে জমিদারের দয়ার উপর ফেলে আসতে পারত, ফেলে যে আসেনি সেটা তার উদারতা।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ছেড়ে বাঁধের রাস্তায় পড়ে অটবী ভিন্ন রাস্তা ধরল। যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'আবার কোথায় চলতেছিস রে অটবী, এত বেলায় ?'

'মনসাপোতার ভেড়ীতে ?'

'সে কি ? ফিরতে ফিরতে যে বেলা পড়ে যাবে ?'

'তা যাক। এবার সেই মেয়েনোকটাকে একবার দেখব। নাগিয়েছে তো সেই।'

যজ্ঞেশ্বর বুড়ো মানুষ, অটবীকে স্নেহ করে। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'এতবেলায় যাসনি। আমি বলছি, যাসনি। 'মেয়েলোকের পিতি ও (প্রতি রোষ) করতে নেই।'

অটবী শুনল না, রওয়ানা দিল। পিছন থেকে কে যেন বলল, 'সাবধান গো আসনাই করে ফিরিসনি যেন আবার।'

যেতে যেতে অটবী ভাবতে লাগল ঠিক জুৎ করে কথাগুলো বলা হয়নি জমিদারবাবুকে। সারাটা সকাল গাঁয়ের লোকেরা রোদে দাঁড়িয়ে কাটালো। সে দাঁড়ায়নি বটে, কিন্তু অপমানটা তো তাকেও বিঁধেছে। জমিদার তাকেও

তো সম্বোধন করেছেন, আসামী বলে। অপমানের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে এখানো অটবীর মন, শরীর।

কিন্তু কেন? কেন বারবার করে লোহা পুড়িয়ে তাদের কপালে দাগ এঁকে দেওয়া হবে, তারা চোর? চুরি কি তারা সাধ করে করে? জমিদার একবার আসুন না, তাদের গাঁয়ের অবস্থাটা দেখে যান না। মাসের মধ্যে ক'দিন তারা কাজ পায়, কতবার করে মালিকের বাড়ীতে ছুটতে হয় পাওনা টাকা আদায়ের জন্য, কত মাইল হাটতে হয় তার জন্য আর কত ঘণ্টা সময় যায়। একবার দেখে যান না এসে! চুরি করে করে তারা বড় লোক হয়ে যাবে ভয়ে জরিমানা করা হয়! চুরি করে তারা বড় লোক হওয়ার জন্য?

গুছিয়ে বলতে হত কথাগুলো জমিদারকে। কড়া কড়া কথা, শক্ত শক্ত কথা। কিন্তু জমিদারের সামনে গিয়ে পড়লে কেমন যেন বলা হয়ে ওঠে না। অত বড় একটা ডাকসাইটে জমিদার, তিনি যখন নরম হয়ে কৈফিয়তের সুরে কথা বলতে থাকেন, কেমন যেন নিজেরই লজ্জা করে। অত নিচে নামানো উচিত বলে মনে হয় না অত বড় একটা জমিদারকে।

কিন্তু ওটা একটা জমিদার না হাতী! কথা দিয়ে যে কথা রাখে না সে আবার একটা জমিদার? বাপের একটা মুখের কথার জন্য রামচন্দর চৌদ্দবছর বনে কাটিয়েছিলেন। সেই রামচন্দরই তো রাজা-মহারাজা-জমিদারদের আদর্শ! তবে?

নাঃ, ঠিক করে গুছিয়ে বলা হয়নি কথাগুলো জমিদারকে। অটবী পারেনি।

একই কথা জাবর কাটতে কাটতে মনসাপোতার ভেড়ী এসে গেল। ঠিক একই জানলার ধারে সেই মেয়েমানুষটাকে পাওয়া গেল। চেহারা সেদিন ভাল বোঝা যায়নি, কিন্তু দৈর্ঘ্যটা মনে ছিল। তা বৌটার চেহারাটা তো বেশ! রংটা প্রায় ফরসা। নাকটা একটু চ্যাপ্টা বটে, কিন্তু গালের গোলাপী আভা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। দু' হাত দিয়ে জানলার ব্যাকারি চেপে রয়েছে, হাত দু'খানা বেশ পুষ্ট। বুকখানাও সবল, যত্ন করে আঁচলের আড়াল করে রাখলেও বোঝা যাচ্ছে।

'কী গো বাগ্দীর পো?' আশ্চর্য, মেয়েটিই আগে সম্বোধন করল একটু হেসে। বড্ড বেশী হাসে মেয়েটা।

'তোমার কাছেই এলাম।'

'তা তো জানিই। নয়তো এই দুকুর বেলায় ইদিগে এস্‌বে এমন মুনিষ কি তোমরা ? তোমরা হলে রাতের কুটুম প্যাঁচার জাত।'

বাব্বাঃ ! কী কথা বলে মেয়েটা ! যেন তিনটে মুখ আছে ওর !

'অত কথা শুনতে আসিনিকো। মোদের কথাটা সেদিন ভেড়ীওলার কানে তুলেছ কেন সেইটি জানতে এইচি।'

'বুঝেছি। চোরে চুরি করবে, তাতে দোষ নেই। কেউ বলে দিলে তাতে দোষ হয়ে যায়। তা বাবু, কি করব ! আমরা চোরটোরকে ভযটয করি। চুরিটুরি দেখলে বলেটলেও দি। দোষ হয়ে থাকে তো মার।'

বলে হি হি করে হেসে উঠল মেয়েটা।

'জমিদার মহাজন ইজারাদারের কাছে গিয়ে যারা মোদের নামে নাগায় তাদের মোরা ঘেন্না করি।' অটবী বলল গম্ভীর হয়ে, হাসিতে যোগ না দিয়ে।

'তাতে হল মোর এই কচুটা।' বলে মেয়েটা বুড়ো আঙুল দেখালো। 'অসের লাগর গাঁ বয়ে এইচো মুখ কত্তে ! বলি, খেতে দিতে পারবি ? যারা ভাতারকে চাকরি দেয, যাদের ধরে আস্তায় ডাঁড়াতে হবে, তাদের ভাল দেখবনি ভাল দেখব আতের কুটুম লাগরের ?'

বৌটার এ কড়া টিপ্পনি সত্ত্বেও অটবী শান্ত গলায় বলল, 'মোরা দোষ করেছিলাম তো তুমি দুটো মন্দ বলতে পারতে, দু'ঘা মারতে পারতে। কিন্তু ইজারাদারের কাণে নাগানো ছি ! ছি !'

বৌটা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। এ কথার মধ্যে আবার হাসির কি ছিল ? বলল, 'পাণে বড্ড নেগেছে, না ? চুরি করেছ, এত বড় কাজ করেছো, তবু এরা পিঁড়ে পেতে বসতে দিচ্ছে নিকো, ফুল বেলপাতা দে' পূজো দিচ্ছে নিকো। তা এত আগ রেখবে কোথায় ! এসনি, দু'ঘা মেরে দে' যাও।'

বলে সত্যি সত্যি মেয়েটা জানলা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বলল, 'ভয় নেইকো ! পালটা মার নাগাবনি।'

যেন ইচ্ছে করলেই মেয়েটা অনায়াসে পালটা মারতে পারে ! দয়া করে মারবে না। কিন্তু একতরফা মার দিয়েই অটবী দেখুক না কী তার দশা হয় !

শেষ পর্যন্ত হেরে গেল অটবী।
আশ্চর্য ! মুস্কিল এই যে, মেয়েমা:
যে অটবী মেরে বসে যখন তখন তা নয়
জোরটা যাকে। মেয়েমানুষকে মারা যা:
নিজের বৌকেও মারতে পারে না। কেন কে ভ

অটবী মনে মনে হার স্বীকার করল বটে, কিন্তু
তার ঘৃণার অবধি রইল না। মেয়েটা মালিক পক্ষের প

তার এই বত্রিশ বছরের জীবনের মধ্যে অটবী অ
এসেছে। সাত আট বছর বয়স থেকেই সে বড় লোকের
করেছে। প্রথম প্রথম চাকর বা পাচক হিসাবে কাজ করেছে !
হয়ে ভেড়ী-ভাড়ার কাজে নেমে পড়েছে। সে দেখেছে যে
কারবার এক আশ্চর্য জিনিষ। এ কারবারে হাত দিয়ে কত সাধার
লোক তার চোখের সামনে বড়লোক হয়ে গিয়েছে। অথচ আশ্চর্য,
অনেক টাকার মালিক হওয়াতেও তাদের মন এতটুকু উদার হয়নি। কর্ম্মচার
আন্তরিক পরিশ্রমেই তাদের কারবারের উন্নতি হয়। কিন্তু যত তাদের উন্নতি
হয় তত তারা কর্ম্মচারীদের শেয়াল কুকুরের সামিল বলে মনে করতে থাকে ! বেশী
লাভ হল বলে কর্মচারীদের এক পয়সা বেশী দেওয়া তো দূরের কথা, কর্মচারীদের
প্রতি তারা আরও বেশী দুর্ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। বাপের থেকে একটু
জেদী আর একগুয়ে স্বভাব পেয়েছিল বলে অটবীর কপালে নির্যাতনটা একটু বেশী
জুটত। চড়টা-চাপড়টা, খাওয়া না দিয়ে ঘরে আটকিয়ে রাখা, পাহারা
মোতায়েন রেখে জোর করে বেশী খাটুনি খাটিয়ে নেওয়া, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে
মাইনে না দিয়ে ভেড়ী থেকে বের করে দেওয়া, ইত্যাদি অনেক দুর্ভোগ জুটেছে
তার কপালে। এ সব ইতিহাস অটবীর মনে গাঁথা হয়ে আছে। আর তার
মনে শিকর জমিয়ে বাসা বেঁধেছে প্রভু জাতির বিরুদ্ধে এক তীব্র বিদ্বেষ।

অটবীর মত অভিজ্ঞতা কম-বেশী এ অঞ্চলের অনেকেরই ভাগ্যে জুটেছে।
কিন্তু অনেকেই মালিকের দুর্ব্যবহারটা জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম বলে মনে করে !
অনেকে এটাকে মালিকের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলেও ভাবে। কিন্তু অটবীর

।টাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে

বচার করার সময় সে একটাই মাপকাঠি
.ন্ধে কার গণা কতখানি তীব্র। কারও
অটবীর সহানুভূতি পাবে না।
ংই অটবীর সহানুভূতি পেল না। অটবী এক এক
।র করতে লাগল।

।বী চিনতে পেরেছে। এ অঞ্চলের নামজাদা মেয়ে এ।
শুনেছে এর কথা, এবার সচক্ষে দেখতে পেল। ওদের
সুন্দরী, ফরসা মেয়ে শতকে একটিও মেলে না। কানাঘুসা
।র জন্মের সময়ে এর মা নাকি এর বাবার সঙ্গে গোরা সৈন্যদের
।কেত। বাপ সেখানে কী কাজ করত। কাজেই রঙ ফরসা হওয়ার
।াছে বৈকি? এর প্রথম স্বামী একে তাড়িয়ে দেওয়ার পর এখন এ
।র সঙ্গে থাকে, তাও জানে অটবী।

ডালে-চালে মেশানো খিঁচুরী তো মেয়েটা। সোমবারে ঘি-ও পড়েছে বেশ।
স্বভাব একটু খারাপ তো হবেই।

খিঁচুরী কথাটা অটবীর ভারী ভাল লাগল। হাসল একা একাই। খিঁচুরি তো—যার পেটেই যাক, তার পেটই গরম হয়ে উঠে। স্বামীটা উগড়ে দিয়ে বেঁচেছে। স্বামীর ভাইটারও এতদিনে পেট ফেঁপে উঠেছে নিশ্চয়ই।

অটবী যদিও ভাবল সে হেরে গেছে, বৌটা কিন্তু ভাবতে পারল না সে জিতেছে। যে চোর সে পালিয়ে পালিয়ে ফিরবে। দিনের বেলায় ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে, রাতের বেলা অন্ধকারের ঘোমটার আড়ালে পথ চলবে। আর এ লোকটা এল যেন তার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। কী তেজ তার! চুরিটা যেন কোন অপরাধই নয়! যেন দস্তুরমত একটা সম্মানজনক পেশা! সে কাজে বাধা দেয়াটাই বরং অন্যায়, নিন্দার কাজ।

অন্যায় করে এত জোর কোত্থেকে পেল এই লোকটা?

চার

জমিদারের সেই পরশুদিন অটবীরা গিয়েছিল জমিদার বাড়ী। কর্তাবাবু বাড়ী ছিলেন না। অনর্থক পাঁচটি মাইল হাটতে হয়েছিল আর বিড়িতে খরচ হয়েছিল মাথা পিছু পূরো চারটে করে পয়সা।

কিন্তু তার তিন চার দিন পরেই জমিদার খবর পাঠিয়ে ডাকিয়ে নিয়েছিলেন তাদের। একটা লাভজনক কাজের বরাদ্দ দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ীর পিছন দিককার সীমানা ঘেঁসে বিঘে দুই আন্দাজ জায়গার বাঁশঝাড়টা কেটে সাফ করতে হবে। এ কাজটা দিনের ভাগে করলেও চলবে। কিন্তু এই জমির লাগালাগি আরও বিঘা দুই আন্দাজ জমির উপর বাঁশঝাড় আছে। সেটুকু সাবার করতে হবে রাত্রে। মাত্র একটি রাত্রের মধ্যে, এবং সেই রাত্রেই জায়গাটার চারদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে দিতে হবে। কর্তাবাবু বলেননি সে জায়গাটা অন্যের কি তাঁর। কিন্তু তারা জানে জায়গাটা নাম করা ভেড়ীওয়ালা প্রামাণিকের। এবং কাজটা অন্যায় বলে পারিশ্রমিকের পরিমাণটাও বেশী। জন পিছু দশ টাকা করে একটি রাত্রের জন্য।

সামান্য এই দুই বিঘা জমি অবিশ্যি জমিদারের আসল লক্ষ্য নয়। তাঁর অত্যন্ত পয়মন্ত পাঁচশ বিঘার ভেড়ী কালীতলার লাগালাগি প্রমাণিকের একটি তেমনি সুফলা পাঁচশো বিঘার ভেড়ী আছে। মাঝখানের একটিমাত্র বাঁধকে কাঞ্চন রায়ের চিরকালই একটি কৃত্রিম মিথ্যা এবং অনাবশ্যক ব্যবধান বলে মনে হয়েছে। সেই কৃত্রিম ব্যবধানটা ঘুঁচিয়ে দিয়ে জলকে জলের সঙ্গে মেশার স্বাভাবিক অধিকার দান করার ইচ্ছাটা কাঞ্চন রায়ের বহুদিনের। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি বোধ হয় এতদিনে শেষ হয়েছে। তাই এবার আক্রমণ সুরু হল সেই দুই বিঘা জমি থেকে। এত দূরে দূরে অবস্থিত দুই খণ্ড জমির মধ্যে যে কী সম্পর্ক সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। তার জন্য কাঞ্চন রায়ের মত দুর্লভ মস্তিস্ক দরকার। সম্পর্ক এই যে দুই খণ্ড জমিই প্রামাণিক একই জায়গা থেকে একই দলীলের মারফৎ কিনেছেন।

এতসব ব্যাপার অবিশ্যি গ্রামের লোকেরা এখনো জানে না। কিন্তু এতদিন বাদে আবার নতুন জমির দিকে হাত বাড়ানো এবং তাতে সাহায্যের জন্য তাদের ডাক দেওয়াকে তারা একটা নতুন উৎপাত বলে বোধ করেছে। জমিদারের সামনে অবিশ্যি তারা হুঁ হুঁ করে এসেছে এবং কাজটা করবে বলে সম্মতি জানিয়ে এসেছে।

কিন্তু যেদিন কাজে যাবে তার আগের দিন সন্ধ্যা বেলা হাজরার থানে গোল হয়ে বসে উত্তেজিত আলোচনা সুরু হল। এ বৈঠকে দলাদলির কোন স্থান নেই, কারণ সবাই ব্যাপারটায় সমানভাবে জড়িত। নিজেদের মধ্যে কিছুতেই সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেল না বলে ডাকা হল ভাগবতকাকাকে পরামর্শের জন্য। ব্যাপারটার মধ্যে নৈতিক প্রশ্নও জড়িত আছে কিনা। ভাগবতকাকা হয়তো একটা সুমীমাংসা করে দিতে পারবেন।

নবীন বেশ উত্তেজিত। বেশ জোরে জোরে কথা বলছিল নবীন এখন বলরামের দলের। বলল, 'বেশ ভেবে-চিন্তে বিচার করবে ভাগবতকাকা। কঠিন সমিস্যে। সেদিন চুরি করে ধরা পড়ে গেলুম। অমনি কত্তাবাবু দশ দশ টাকা করে জরিমানা ধরে দিলেন। তাতে মোদের লাভের ধন পিঁপড়েয় খেয়ে গেল। যদি বল কেন? ধর, আমরা পাঁচবার চুরি করে লাভ পেলুম মাথা পিছু পঁচিশ টাকা। বেশ। দুবারের চুরি ধরা পড়ল, জরিমানা দিলুম দশ দশ কুড়ি টাকা। তবে লাভটা পিঁপড়েতে খেয়ে গেল তো, না কি না, বল ভাগবত কাকা? আচ্ছা, তাও নয় মেনে নিলাম। আমরা পেজা, চুরি করি। তিনি জমিদার, সাজা দেন। ভাল কথা। আজ তো তিনি স্বয়ং চুরি করতে যাচ্ছেন। তা মোরা সামান্যি তুরুচ্ছু পেজা তার বিচার করতে পারব নি। কিন্তু তিনি মোদের সাহায্যির জন্যি ডাকতেছেন। মোদের যাওয়া উচিত কি নয়, সেইটির তুমি কী পরামশ্য দাও ভাগবতকাকা?'

এর সঙ্গে বলরাম আর একটু যোগ করল, 'তাছাড়া, ভেবে দেখ ভাগবত কাকা। সব সময় ভবিষ্যৎ ভেবে তো কাজ করতে হয়। এসব কাজে যাওয়া— যদি থানা-পুলিশের হাঙ্গামা হয়? কত্তাবাবু পিছনে আছেন বটে—যদি সরে, ডাঁড়ান?'

সভা-সুদ্ধ লোক উত্তেজিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে ভাগবতের মুখের দিকে। কথাটি নেই কারও মুখে। কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নেই যা-তা বাজে কথা দিয়ে তাদের শান্ত করা যাবে না।

ভাগবতের বয়স হয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যটি ভাল আছে এখনো। মুখে একটী শান্ত নরম হাসি লেগেই আছে। অনেকদিন ধরে গতর খাটিয়ে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বলে মুখখানা বেশ মোলায়েম। ভাগবত সম্পর্কে অনেক গল্প শোনা যায়; তবে মোটের উপর এটা সবাই মানে যে বৌ মারা যাওয়ার পর তার মনে প্রথম ধর্মভাব জাগে। ঈশ্বরের সন্ধানে সে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে যায়। তারপর কাশীতে কি বৃন্দাবনে কি ত্রিবেণীতে তার প্রথম ভগবৎ-কৃপা লাভ হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। দু একজন, তার মধ্যে বলরাম একজন, বলে ভাগবত সিদ্ধি লাভ করেছে, তবে কায়া-সিদ্ধি, আসল সিদ্ধি নয়। অধিকাংশই অবিশ্যি অতদূর স্বীকার করতে রাজী নয়। কী করে ভাগবতের দিন চলে জিজ্ঞেস করলে, কেবল গাঁয়ের লোকেরা একবাক্যে বলবে,

'চিন্তামণি করেছে সার
চিন্তামণি যোগান আহার

কাজেই তাদের কাছে যা জটিল সমস্যা, ভাগবতের কাছে তার প্রকৃতি, তাৎপর্য এবং তার সম্পর্কে ইতিকর্তব্য সবই জলের মত স্বচ্ছ। একমাত্র অসুবিধা এই যে কঠিন জিনিষটা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে অজ্ঞ মুর্খ গেঁয়ো মানুষদের।

হেসে আরম্ভ করল ভাগবত, 'পরশুরামের কথা শুনেছ তোমরা। পরশুরাম বাপের আদেশে মাকে কেটে ফেলেছিলেন। কুড়ুলটা হাতে লেগে রইল। নাবলনিকো। তা' বলে কি তার সগগে যেতে কোন অসুবিধা হয়েছিল? হয়নি। কুড়ুলটাও নেবে গিয়েছিল পরে।'

চারদিকে একবার তাকিয়ে শ্রোতারা গল্পটার তাৎপর্য ধরতে পারল কি না বুঝতে চেষ্টা করে আবার সুরু করল, 'তা' পর ধর বিভীষণ, রাবনের ভাই বিভীষণ। তা সে নিজের দেশ, নিজের জাতের বিরুদ্ধে লড়াই করলে। পাপ হল নি? না গো। সে গুরু রামচন্দরের আদেশে কাজ করেছে। পাপ-টাপ

সব আমচন্দরের। সে গুরুর আদেশ পালন করেছে, সেই পুণ্যিতে সে সগগে গেল। আর আম তো স্বয়ং ভগমান। তিনি সব পাপ চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন।'

নিধু কিছুই বুঝতে পারছিল না। জিজ্ঞেস করল, 'তো তাতে কি হল ভাগবতদা?'

ভাগবত উদার ভাবে হাসল। মূর্খ লোকের প্রশ্নকে সে এমনি ভাবে ক্ষমা করে। বলল, 'সবুর, বলছি। ভগমান মুনিষকে নানা জাতে ভাগ করে দিলেন। কাউকে করলেন বাম্‌ভন, কাউকে করলেন শুদ্দুর। বলে দিলেন, যার যা কাজ, সে যদি তাই করে তো তাতেই সে সগগে যাবে। তিনি আজা ছিষ্টি করলেন, পেজা ছিষ্টি করলেন। আজার কাজ শাসন করা, আদেশ দেওয়া, অন্যায় আদেশ দিলে সে পাপ আজার। পেজার কাজ আদেশ মান্যি করা, ল্যাষ্য অল্যাষ্য বিচার সে করবেনি। অন্যায় আদেশ মান্যি করলেও সে সগগে যাবে। তবে একটা গল্প বলি, শোন। এক সাধু থাকে নদীর এপারে আর তার শিষ্য থাকে নদীর ওপারে। সাধু আদেশ দিলেন শিষ্যকে, ওজ সন্দেয় আসতে হবে। শিষ্য রোজ আসে। একদিন দারুণ ঝড় জল, খেয়া নেই কো ঘাটে। তো শিষ্য গুরুর নাম করে জলে লেবে পড়ল। তা লদী দুভাগ হয়ে পথ করে দিল। সাধু শুনে ভাবল, তার নামে এত হয়, তবে তো সে মস্ত সাধু! আর এক সময় সে-ও গেল লদী পার হতে। "আমি আমি" জপতে জপতে পা বাড়াল। তা নদী দু'ভাগ হল নি, পা ভিজে গেল। যদি বল কেন? না শিষ্য কায়-মনোবাক্যিতে গুরুর আদেশ মান্যি করেছে, তাই তার সিদ্ধি হয়েছে। কিন্তু সাধুর সাধনা ঠিক হয়নি কো। তার মনে অংখার আছে। কাজেই লদী তার কথা শুনলেনি।'

বলরাম বলল, 'ভাগবতকাকা, তবে তোমার কথা হল, মোদের কত্তাবাবুর আদেশ মান্যি করা উচিৎ। বেশ। কিন্তুক কত্তাবাবু যে মোদের জমি দেবে বলেছিল, দেয়নিকো তার কি? পেটের দায়ে এরা চুরি করে, তা তিনি জরিমানা আদায় করেন, তার কি? তারপর, ধর, থানা-পুলিশ আছে, ত্যাখন মোরা কী করব?'

বলরামের প্রথম প্রশ্নের জবাব ভাগবত দিল না। কারণ তার জবাব সে

আগেই দিয়েছে। পুনরাবৃত্তি করা তার কাজ নয়। শেষের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'থানা-পুলিশ তা হতে পারে, হওয়া সম্ভব। কিন্তুক মিত্যুর পরে তোমরা সগগে যাবে। অন্তত, বড় ঘরে জর্ম হবে।'

সমস্ত আসরে শব্দটি নেই। সবাই ভাবছে। এসব কথা তাদের কাছে নতুন নয়, ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে। ভাগবত কাকার মুখ দিয়ে বের হওয়ায় কথাগুলোয় জোর আরও বাড়ল।

অবশেষে বুড়ো যজ্ঞেশ্বর বলল, 'তবে আর কি। ভাগবতদা তো বলেই দিল, জমিদারের কাজটা করাই তো মোদের ধরম।'

একটু হাসল শুধু ভাগবত। কিন্তু চারদিকে কারও মুখে খুসির আমেজ দেখা যাচ্ছে না। সবাই বিরস মুখে এদিকে সেদিকে তাকিয়ে আছে। নয়তো নখ খুটছে এক মনে, ভাগবতের মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। সবই সবাই জানে, বোঝে। কিন্তু মীমাংসাটা কারও যে মনঃপুত হয়নি ভাগবত তা বুঝতে পারল। একটু গরম হল মনে মনে। মনেই মনেই, বাইরে আর প্রকাশ নেই।

জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বলেছিলাম না, এ বছরটা তোমাদের খারাপ যাবে?'

নিধু অম্লান বদনে বলল, 'কৈ না তো?'

'চুপ! আবার মিছে কথা বলছিস্?'

এবার বলল নবীন। 'তুমি তো বললে, শনি মংগল বুধ বেস্পতি এই সব গেহ-দেবতারা আকাশে কে কোথার আছেন তার কথা?'

'হ্যা, কে কোথায় থাকেন তার থে'ই তো সব কিছু হয়। তোমাদের বলেছিলাম না, এবার শনি মঙ্গলের কোপ দিষ্টি তোমাদের উপর—যারা মাছের কারবারে আছে তাদের সকলের উপরে? শনি মঙ্গল! বাবা! কাঁচাখেকো দেবতা। তার উপর আবার উভয়ের যোগাযোগ। তোমাদের পক্ষে এ বছরটা সাংঘেতিক। তা হবেই। আমি বলে কি আর ঠেকাতে পারব? এর নাম বিধিলিপি! তোমাদের খারাপ হবে না তো কার হবে? পাপের মধ্যে তোমাদের জর্ম। আগের জর্মে পাপ করেছিলে বলে এ জর্মে নীচ কুলে জর্ম পেয়েছ। এ জর্মেও পাপ কত্তেছ। আসছে জর্মে আরও নীচ কুলে জর্ম নিতে

হবে। ডোমের ঘরে নয়তো মুচির ঘরে। শাস্তরে বলেছে, করমফল সংঘেতিক জিনিষ। মুনি ইষিও নিস্তার পায় না। যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করতে হয়েছিল। যেমন কাজ করবে তেমন ফল পাবে। রেহাই নেইকো। পিরথিমী ছেড়ে চাঁদে যাবে? যাও না---ভগমানের রাজত্বের বাইরে যেতে পারবে কি? ভাল কাজ কর, এ জর্মে বাগদী আছ, পরের জর্মে জমিদার হবে। খারাপ কাজ কর, এ জর্মে জমিদার আছ, পরের জর্মে বাগদী হবে। কিন্তু তোমাদের এ সব বলা মিথ্যে। পাপে ডুবে আছ তোমরা, পাপ তোমাদের টানতেছে। আমি খানিক মুখ বেথা করে কী করব?'

ভাগবত উঠে খরম ঠক ঠক করতে করতে চলে গেল। কেউ তাকে অবজ্ঞা করল না। কিন্তু কেউ তাকে আর একটু বসে যাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতিও করল না। ছবির মত নিশ্চুপ নিশ্চল ভাবে বসে রইল এতগুলো লোক।

বলরাম একটু বেশীরকম ভাগবতের গা-ঘেঁসা বলে এ-গ্রামে প্রসিদ্ধি আছে। সেই প্রথম কথা বলল, 'ভাগবতকাকা যা মোদের বলল, তার মুখে তা সাজে। সে পরমেশ্বরের আশ্চয পেয়েছে। এ সব খাঁটি খাঁটি কথা সে-ই বলতে পারে। আমরা পাপে ডুবে আছি, এ কথা কে না মানবে? না হলে মোদের এমন দুদ্দশা হবে কেন? ভাল কাজ করলে মোরাও আজ---সুখ ভোগ করতে পারতাম। কিন্তু কথা হল এটা কলিকাল। ভাগবতকাকা যা পারে মোরা সামান্যি মুনিষ তা পারি না। কাজেই মোদের এখন স্বাথ দেখতে হবে। কত্তাবাবুর উপর এট্টু চাপ দিয়ে দেখা যাক না। যাখন খুশি তিনি মোদের প্যায়দা দে' ডেকে নে' রোদে বইসে রাখবেন, জরিমানা করবেন। তা মোরাও তাঁকে সমঝে দি মোরাও কুকুরের মত তু দিলেই ছুটে যাই না।'

অটবী ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'যা বলবে ভেবেচিন্তে বল, বলরাম। শেষে পেইছে বেওনি। তা'লে কাল সকালে মোরা জমিদার বাড়ী যাবনি?'

বলরাম আহত হয়ে একটু বেশী জোরেই চেঁচিয়ে বলল, 'আমি তো অন্তুতক যাচ্ছিনি। আর আর সকলের কি মত হয় বল।'

জমিদারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে বলরামের বিশেষ আক্রোশের কারণ নেই। সে চুরির ব্যাপারে নেই। তবু পাঁচজনের ইচ্ছাটা সংক্রামিত হয়েছে

তার মনেও। আর একটা মোড়ল গোছের লোক বলে কথাটা সকলের আগে গলা চড়িয়ে বলছে। মনের মধ্যে যে একটু সুপ্ত অহঙ্কার নেই তাও নয়।

কাজেই ঠিক হল, পরদিন সকালে তারা কেউ জমিদার বাড়ী যাবে না। ভাগবতের প্রতি এবং তার ব্যক্তব্যের প্রতি পুরো আস্থা থাকা সত্ত্বেও।

রাত্তির বেলা নিধুকে পাঠানো হয়েছিল খবরটা জমিদারকে জানানোর জন্য। নিধু ফিরে এসে জানালো, খবর সে জানাতে পারেনি। জমিদার কাছারির কাজের শেষে অভ্যেস মত মদের পাঁট নিয়ে বসেছিলেন। কাজেই বলতে সাহস হয়নি। তবে কর্ত্তাবাবু নাকি জানিয়েছেন, বাগদী প্রজাদের অবস্থার কথা শুনে তিনি নাকি খুব মর্মাহত হয়েছেন। জরিমানার পরিমাণটা কমিয়ে তিনি নাকি পাঁচ টাকা করে দেবেন।

এ সংবাদ যার যার মত ঘরে বসে সকলে শুনল। এ নিয়ে তখন আর কোন আলোচনা হল না। পরদিন সকালেও কোন আলোচনা হওয়ার আগেই যার যার মত কাজে বেরিয়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সবারই যাত্রাপথ শেষ হয়েছে একটা জায়গায়, জমিদারের বাড়ীতে। বলরামও গিয়ে জুটেছে। একমাত্র গেল না ঔটবী। কিন্তু সে মিছে করে খবর পাঠালো জমিদারের কাছে নিধুর মারফৎ যে আগের দিন অতিরিক্ত তাড়ী খেয়ে আজ তার ভয়ানক পায়খানা আর বমি সুরু হয়েছে, তাই যেতে পারছে না।

আগের দিন রাত্রিবেলা বৈঠক শেষ হওয়ার পরও বলরামের মনটা খুব খারাপ হয়েছিল।

এ গ্রামের সমস্ত লোকের থেকে বলরাম একটু আলাদা। একমাত্র সেই চুরির পেশাটা ত্যাগ করেছে। আর এই জিনিষটাকে কেন্দ্র করে তার আর গ্রামবাসীর মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। গ্রামের একটা অংশের সে এখন মোড়ল বটে, কিন্তু সে শুধু একটা বাইরের যোগাযোগ। মনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে, বলরাম প্রত্যেকের থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র। সেই জন্য পাঁচ জনে যে কারণে খুসী হয়ে ওঠে, সে কারণে বলরাম খুসী হওয়ার মত কিছু খুঁজে পায় না।

কালকে জমিদারের বাড়ীতে না যাওয়াটা যুক্তি সংগত বটে, কিন্তু ভাগবতা কাকা যে-কথাগুলো বলে গেল সেগুলো এখন কাঁটার মত বিঁধছে বলরামের মনে।

পাপের মধ্যে তাদের জন্ম। পাপের মধ্যে তারা ডুবে আছে। পাপ তাদের টানছে। কথাগুলো এত সত্যি যে ব্যাখ্যার দরকার হয় না। সেই জন্যই তারা দুঃখী দরিদ্র। সমাজে তারা হীন জাতি বলে পরিচিত। নতুন কথা নয়, না-জানা কথা নয়। কিন্তু জানা কথাগুলোকেও আমরা এত অবহেলা করি যে সেগুলো নতুন করে শুনলে নতুন বলে মনে হয়।

বলরাম যে পাপের স্রোতে নিজেকে একেবারে ডুবে যেতে দিয়েছে তা নয়। কিন্তু নরক কুণ্ডে তার জন্ম, তার থেকে পরিত্রাণ কোথায় ?

সে চাকরি করে। তার বৌ ধাপায় গিয়ে রেলের পোড়া কয়লার থেকে বড় বড় টুক্‌রোগুলো সংগ্রহ করে এনে বেচে। এমন কি ছেলেটা পর্যন্ত দু' চার পয়সা আনে। তবু তো সংসারের পর্বত প্রমাণ অভাব মেটে না। পুণ্যের পথে চললেই যে সঙ্গে সঙ্গেই অভাব মেটে তা নয়। শাস্ত্রে তা বলে না। কিন্তু কত দীর্ঘকাল আর এমন কষ্ট সহ্য করা যায় ? মাঝে মাঝে মনে হয় বৈকি যে চুরির পথটা আবার ধরলে হয়তো দুটো পয়সার মুখ দেখা যায়। সে কল্পনাটাও নিছক আলেয়া সন্দেহ নেই। কারণ এ গ্রামের অন্যদের অবস্থা তো এমন কিছু ভাল নয়।

পূর্ব জন্মে যারা পুণ্য করেছে এ জন্মে তারা বড় ঘরে জন্মেছে। হয়েছে জমিদার, মহাজন, ভেড়ীওয়ালা। পাপে কিন্তু তাদেরও টানছে। বলরামের জানা-শোনা ধনীলোক যত আছে তার মধ্যে সত্যি সত্যি ভাল লোক তো কোথায় সে দেখতে পাচ্ছে না। তাদের জমিদার কাঞ্চন রায় তো জাল জুয়াচুরি করেই বড়লোক। আগে সে কাজ করত কেষ্টবাবুর ভেড়ী কালীতলায়। তাদের জমিদারই ভেড়ীটার মালিক। এই কেষ্টবাবুও ছোট জাতের লোক, বিধবা নিঃসন্তান বোন মারা যাওয়ার পর মাত্র আড়াই হাজার টাকা পেয়েছিল। তাই নিয়ে দুঃসাহস করে ভেড়ীটা ইজারা নিয়ে কাজ সুরু করে। তাদের গ্রামের সে. ও অটবী, যজ্ঞেশ্বর আর নবীন

কর্মচারী হিসাবে যোগ দিয়ে আপ্রাণ খেটে ভেড়ীটাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। বলরাম কত চেষ্টা করে মতিজেলের থেকে ধারে চালামাছের ব্যবস্থা করে দেয়। তখন কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত কেষ্টবাবু। লাভের অংশ দেবে পর্যন্ত বলেছিল। আশায় আশায় তারা কত মাস মাইনে না নিয়েই কাজ করে গেছে। শেষে ভেড়ী যখন দাঁড়িয়ে গেল, তখন অংশ দেওয়া তো দূরের কথা চুরির অপবাদ দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিল। এখন সে রোজ পঁচিশ টাকার মদ খায়। দুটো রাঢ় (রক্ষিতা) রেখেছে। তাছাড়া হরিপদ প্রামানিক, নিধিরাম বাগ, প্রভৃতি এই মাছের কারবারের কত বড়লোকই তো সে দেখেছে। কৈ কারও সম্পর্কেই তো কেউ এমন কথা বলছে না যে লোকটা ভাল! আগের আগের জন্মে পুণ্যের ফলে এদের এত উন্নতি, তবু এদের পাপে টানছে। কেন? পাপ কোরছে বলে পরজন্মে কি এরা আবার নীচু ঘরে এসে জন্মাবে?

নিচের দিকে মানুষের ঝোঁকটা অত্যন্ত বেশী বলেই কি বেশীর ভাগ মানুষ নীচু ঘরে জন্মায়? দৈবাৎ যদি বা কেউ ভাল কাজ করে উঁচু ঘরে যায় তো আবার পদস্খলন হয়ে তাকে নীচু ঘরে নেমে আসতে হয়? তবে মানুষের সেই চরম লক্ষ্য, সাংসারিক উন্নতি ছেড়ে ঈশ্বরের কাছে চলে যাওয়া, সেখানে কি কেউই পৌঁছতে পারবে না?

মাত্র দু একজন সেখানে পৌঁছতে পারেন? বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্যের মত মহর্ষিরা?

ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। এত কঠিন যদি ব্যাপারটা হয় তবে তাদের মত সামান্য মানুষের সে চেষ্টা করে লাভ কি? স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দিলেই তো নিশ্চিন্ত! যা হয় হবে! আর পাঁচজন তো সেই কথা ভেবে নিশ্চিন্ত আছে। বলরামের ব্যতিক্রম হয়ে কী লাভ!

পাপের মধ্যেই তাদের জন্ম! তাই যদি হয় তবে আর সুভদ্রার জন্য এত মন খারাপ করে কী লাভ! এমন কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে যদি পাপের সমুদ্রে আর দু'চার ফোঁটা পাপ যোগ হয়? না, আজ রাত্রে বলরাম একবার যাবে সুভদ্রার কাছে। পাপের বোঝা একটু বাড়বে, বাড়ুক। তবু যদি মনের ভারটা একটু হাল্কা হয়।

আলায় এসে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলে বলরাম ম্যানেজারের কাছে তিনটি টাকা চাইল। আর এক রাত্রের ছুটি। এ রকম খুচরো খুচরো টাকা দেওয়া ম্যানেজার পছন্দ করে না। তবু গজর গজর করতে করতে দিল শেষ পর্যন্ত। বলরাম বলেই দিল, ভেড়ীর আর তিনজন কর্মচারীর কাউকে দিত না।

সুভদ্রার ঘরে যখন এসে পৌঁছল তখন বেশ রাত হয়েছে। সুভদ্রার স্বামী বারান্দায় বসে একটা বিড়ি টানছিল। হাড় জিড়জিড়ে চেহারা।

'কি গো সম্বন্ধী! এলে যদি তো এত রেতে কেন?'

সুভদ্রার স্বামী তাকে সম্বন্ধী বলেই সম্বোধন করে।

'এসব বলে ঠিক ছেল না। হঠাৎ এসে গেলাম।'

'যাও, সুভদ্রা ঘরেই আছে।'

বলে স্বামিটি আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে পা বাড়ালো। যতক্ষণ বলরাম থাকবে ততক্ষণ সে ফিরবে না। পথে পথে ঘুরবে।

বলরামকে দেখে সুভদ্রা আগে গিয়ে দরজাটা দিয়ে এল। তারপর বলরামের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'এতদিন পরে এলে? কদিন ধরে কেবল ভাবতেছিলাম তোমার কথা।'

একটা চৌকীর উপর ময়লা মশারিহীন বিছানায় সুভদ্রার তিনটি ছেলে-মেয়ে অকাতরে ঘুমচ্ছে। সুভদ্রা একটা ছেঁড়া মাদুর এনে মেঝেয় পাতল বলরামের বসার জন্য।

'মোর তো ভয় হয়েছিল, তুমি বুঝি আগ করেছ।'

সুভদ্রার ঐ গুণটা এখনো আছে। বেশ দরদ দিয়ে, বেশ মিষ্টি করে, কথাগুলো বলে।

'তোমার উপর আগ করব তো যাব কোথায়?' বলরাম বলল।

'তবে খোঁজ খবর নিতে হয় তো বেঁচে রইলাম কি মরে গেলাম। এই দেখ কী অবস্থা আমার।'

সুভদ্রা নিজের সাড়ীখানা দেখালো। তা বলরাম আগেই দেখেছে। ছোট মেয়ের আট হাতি সাড়ীখানা পরে আছে সে।

বলরাম বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে? আমার কাছে তো তোমার লজ্জার কিছু নেইকো।'

'মোর সাড়ীখানা দেখ ঐ সামনে ঝুলতেছে। ঐ একখানাই সম্বল।'

সামনে কাঁচা বেড়ার দেওয়াল ঘেঁসে এক খানা ছেঁড়া সাড়ী ঝুলছিল দড়িতে, বলরাম দেখল। তারপর সুভদ্রা একে একে তার হাঁড়ি-কুড়ি সব উপুর করে দেখালো। চালের হাঁড়িতে এক মুঠো চাল আছে। মসলার কৌটা পর্যন্ত একেবারে খালি। তরকারীর ঝুড়ির তলায় কাঠির সঙ্গে লেগে আছে একটি শুকিয়ে-যাওয়া কাঁচা লঙ্কা।

'ঘরে কত টাকা আছে দেখবে?'

বাঁশের একটা গিঠওলা কাটা টুকরোর মধ্যে তারা টাকা পয়সা রাখে। উপুর করে দেখালো তাতে তিন আনা পয়সা আছে মাত্র। পেটের ওপরে কাপড়ের গিঠটা খুলে দিয়ে সামনে ধরে সুভদ্রা বলল:

'দেখ। ও বেলা চাট্টি পান্তা খেয়েছিলাম। এ বেলা কিছু জোটেনি। উপরের দিকটা টিপ দিয়ে দেখ, নিচের দিকটা এমনিই একটু মোটা। তিন মাস হল আর একটা শত্তুর-এইছে কিনা পেটে।'

এই সব দেখানোর জন্যই বলরামের অদর্শনটা এতখানি কষ্টকর হয়ে উঠেছিল সুভদ্রার কাছে! বলরাম সব বোঝে।

সব বোঝে বলেই সেই অনাহারী পোয়াতী বৌটার উপর নিজের আহার-পুষ্ট শরীরটা দিয়ে আপ্রাণ পেষণ করতে একটুও ইতস্তত করল না বলরাম। তবু যা হোক, বিন্দুর শরীরের মত অত ভেঙে যায়নি সুভদ্রার শরীর এখনো। একটা টাকা দিল বলরাম সুভদ্রাকে। একটা সাড়ীর প্রতিশ্রুতি দিল।

বলরাম ফিরল রাত্রের শেষ ট্রেনে।

ফিরতে ফিরতে বলরাম ভাবল, একদিন এই মেয়েটাকে সে ভালবাসত। নিজের রাজত্ব থাকলে তাও সেদিন সে ছেড়ে আসতে পারত এই মেয়েটির জন্য। কিন্তু আজ?

পাঁচ

জমিদার বাড়ীতে না গিয়ে অটবী রাতারাতি গ্রামের লোকের মন জয় করে ফেলল। এমন মামার ভাগনে বসে নিধু বুক ফুলিয়ে বেড়াতে লাগল গ্রামের মধ্যে। তরুণ বৌদের মহলে তার প্রতিপত্তি রীতিমত বেড়ে গেল। কাঁঠাল প্রত্যেকের কাছে গিয়ে গিয়ে অটবীর এত মনের জোরের কারণটা জানিয়ে এল—হবে না? কার মামা দেখতে হবে তো? বলরাম লক্ষ্য করে দেখল, সে কাছে থাকলেই গ্রামের লোকেদের মধ্যে অটবীর প্রসঙ্গটা বেশী দানা বেঁধে ওঠে! কেন রে বাবা। তার মত আর সকলেই জমিদার বাড়ী গিয়েছে সেদিন। সকলেই সমান অপরাধী। তবে বেছে বেছে তাকে লক্ষ্য করে অটবীর কথাটা শোনানোর এত ঝোঁক কেন গ্রামের লোকের?

মানুষের মনের হদিস পাওয়া সত্যিই ভার। সমস্ত গ্রামের লোকের বিপরীত কাজ করেছে বলে অটবী আজ বাহাদুর। একা একা পাঁচজনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটা শক্ত কাজ নিঃসন্দেহে। কিন্তু সেই শক্ত কাজ তো বলরাম করে এসেছে কতদিন ধরে। অটবী একদিন বাহাদুরি দেখিয়েছে, তাকে যে প্রায় রোজ রোজই বাহাদুরি দেখাতে হয়। দল বেঁধে যখন সকলে চুরি করতে যায়, তখন সে, একা সে, দাঁড়িয়ে থাকে শক্ত হয়ে চুরির বিরুদ্ধে। গ্রামের লোকের কি ধারণা পাঁচজনের বিরুদ্ধে একার দাঁড়ানোটা খুব সহজ কাজ যখন বলরাম করে?

সকালবেলা যজ্ঞেশ্বর আলাঘরে এসে প্রথমেই বলে বসল, "তা যা বল বলরাম, অটবীর বুকের পাটা আছে বলতে হবে। না কি বলতেছ গো তুমি?"

এ লোকটা লেগে আছে অটবীর পিছনে ঠিক কাপড়ের কাছার মত। দু চক্ষে দেখতে পারে না বলরাম ওকে। বুড়ো মানুষ! কোথায় সকলকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে, না, অটবীই উল্টো তাকে চালায়। ঠিক যেমন

করে বুড়ো একটা গরুকে দড়ি ধরে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় কচি একটা ছেলে। দু' ছেলে আছে, বৌটা মারা গেছে। বড় তিনটে ছেলেও নেই। তা ছেলেরা বিয়ে করে বুড়োকে ঘরের বার করে দিয়েছে। বারান্দাটা ঘিরে নিয়ে থাকে বুড়ো। এক পা-ও নড়ে না এই গাঁ ছেড়ে। এক ঐ অটবী যা করতে বলবে, তাই করবে।

বলরাম বলল, 'তো কী হয়েছে? শুধু শুধু বুকের পাটা থাকলে তাতে কি নাভ, তা বল?'

যজ্ঞেশ্বর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'নাভ নেই?'

'কোন নাভ নেই। এই দেখ না কেন নিধিরাম বাগকে? ছত্তিশ-গড়ের ভেড়ী যখন নিল,—সেখানে ছেল বিজাবন জঙ্গল। তা সে কি গিয়েছিল বাঘ-সিংহ মারতে? না. সে পেইঠেছিল তার মাস-মাইনের নোক নস্করদের। ছ' ছটা নোক বুকের পাটা দেখিয়ে চলে গেল বাঘের পেটে। তাদের কী নাভটা হয়েছে দেখাও দিকি যজ্ঞেশ্বরকা'?' আর ঐ নিধিরাম বাগ দেখ গে' লাখ লাখ টাকা কত্তেছে সেই ভেড়ী থেকে।'

'তাই তো হয়। গরীব নোক পাণ দেয়. ধনী নোক সবটুকু খায়।' যজ্ঞেশ্বর বলল দুঃখিত হয়ে।

'অমনি অমনি কি সব খায়, যজ্ঞেশ্বরকা'? খায় পুণ্যের জোরে। কখনো অন্যায় কাজ পাবেনি নিধিরাম বাগের থেকে। কাউকে কখনো ঠকায়নি কো, যার থে' যা টাকা নিয়েছিল সব ফিইরে দিয়েছে। দেবদ্বিজে তার তেমনি ভক্তি। তাই তো এতবড় একটা ভেড়ীওয়ালা হতে পেরেছে। সে কি মোদের ইদিগকার মত নেবু-ছেবু ভেড়ীওলা?'

কথাটা কানে গিয়েছিল ম্যানেজারের। তিনি নিবিষ্টমনে খাতা লিখছিলেন।

'কি বলছ তুমি বলরাম? কার কথা বলছ?'

কোথায় লেগেছে বুঝতে পেরে বলরাম বলল, 'ভয় পাবেননি মানুজার বাবু। মোদের বাবুর কথা বলিনি কো।'

ম্যানেজার দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'কার কথা বলেছ তা বুঝেছি, বুঝলে ? তোমাকে যে দু'তিনবার বললাম একটু জলে নেবে ঝাজি পরিষ্কার কর,—তার কি হল ? শীত এসে যাচ্ছে, মাছগুলো তো সব মরে যাবে।'

মুখরোচক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা চলছিল। বলরাম রেগে গেল।

'মান্‌জার বাবু, বুঝতে তো পারেন না কিছু। আলার মধ্যে গদিতে গইড়ে গইড়ে আত কাটান। একদিন কিন্তুক আপনাকে বাঁধ ঘুরে ঘুরে ভেড়ী পাহারা দিতেই হবে। মাত্তর একদিন। মিনতি কত্তেছি। তার পরদিন বলবেন, আত জেগে পাহারা দে' সকাল বেলা ক' কাহন ঝাঁজি তোলা যায়।'

ম্যানেজার যেমন দপ করে জ্বলে উঠেছিলেন, তেম্‌নি হুস্ করে নিবে গেলেন। বলরাম যে কথাগুলো বলছে তা যুক্তিসঙ্গত কিনা বোঝা খুব মুস্কিল। তাঁর দিক থেকে অবিশ্যি রাত জাগা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তিনি ভদ্দরলোক, ভিন্ন ভাবে মানুষ হয়েছেন। আর এদের জন্ম আর জীবন কাটছে জলে জলে। এদের কাজটাই এমন যে রাত না জেগে এদের উপায় নেই। কাজেই বলরামের কথাটা তিনি ঠিক মেনে নিতে পারেন না। অথচ জোর করে প্রতিবাদ করবেন এমন অভিজ্ঞতার জোর তাঁর নেই। তাঁর অনভিজ্ঞতার সুযোগটাই এরা নেয়। এরা যা তাঁকে বোঝায় তাই তাঁকে বাধ্য হযে মেনে নিতে হয়। তাতে আবার মালিক অসন্তুষ্ট। এই ভাবে এখানকার অলস, সঙ্গীবিহীন, আমোদ-প্রমোদ-বর্জিত নির্বাসিত জীবন তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছে।

একটু বেলা হলে ভেড়ীর ইজারাদার এলেন ভেড়াতে। দেখতে পেয়েই বলরাম এক গাল অনুগৃহীতের হাসি হেসে শরীর আধখানা বেঁকিয়ে নমস্কার জানালো। হাত ধরে যত্ন করে তুলল গাসা ঘরের মাচার উপর। ম্যানেজারের বিছানাটা যত্ন করে সমান করে বসার আসন করে দিল। এ সব ব্যাপারে বলরাম খুব তৎপর। গেঁয়ো মানুষ হলে কী হবে, আদব কায়দায় সে দুরস্ত আছে।

হাঁক-ডাক করে ভেড়ীর অন্যান্য কর্মচারীদের জড়ো করে ফেলল।

একজনকে বসিয়ে দিল চা বানাতে। আর একজনকে পাঠালো গ্রামে দুটো ডিম আনতে। এতটা পথ হেটে এসেছেন বাবু, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

সব কাজ গুছিয়ে বলরাম এসে বসল ঘরের মাচার উপর।

'ভাল আছেন তো বাবু ?'

'ভাল, তোমরা ?'

'গরীব নোকের আবার ভাল থাকা ! তা আজকের দিনটাও ভাল ছেল। তবে আপনি এইচেন, জল না এলে হয়।'

দু'জনেই হাসল। কথাটার পিছনে একটা ইঙ্গিত আছে। বাবু যেদিন আসেন, সেদিন প্রায়ই বৃষ্টি হয়। অদ্ভুৎ যোগাযোগ। ওরা বলে, 'বাবু আপনার বিষ্টির লগনে জর্ম।'

বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কাজটাজ ঠিক মত চলছে তো ?'

'আজ্ঞে হ্যা। পাহারা টাহারা সবই দেওয়া হচ্ছে। মাছ যা ফলেছে—চমৎকার। সকালে বা সন্ধ্যে এলে দেখতেই পারতেন ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ভাসছে জলে।'

শুনে বাবুর মুখটা প্রসন্ন হল।

'চুরি টুরির কিছু টের পাচ্ছ কি ?'

এবার বলরাম গম্ভীর হয়ে বলল, 'বাবু, বড়াই করবনি। তবে বলি, আমি য্যাতকাল এ ভেড়ীতে আছি ত্যাতকাল কোন শালার পো শালার সাধ্যি নেই জলে একবার হাত দেয়।'

বাবু এবার যে হাসলেন, বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে সে হাসি একটু করুণ দেখালো।

বলরাম যে খুব একটা কিছু মন দিয়ে পাহারা-টাহারা দেয় তা নয়। বিশেষ রাতও যে সে জাগে তা নয়। এ ভেড়ীতে কাজ নিয়ে অবধি তার খাওয়াটা আর ঘুমটা ভালই চলছে। তবে একটা কথা ঠিক। সে এ ভেড়ীতে আছে বলে এখানে গ্রামের লোকেরা তার খাতিরে বড় রকমের চুরি কিছু করে না এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। ছোট খাটো চুরি যদি বা হয়ও তো তার জন্য কোন ভেড়িওলা ফেল পড়ে না।

বলরামকে নিয়ে ভারি মুস্কিলে পড়েছেন ভেড়ীর মালিক, অর্থাৎ সন্দীপ বাবু। বলরামকে রেখেছিলেন অনেক বিবেচনা করে। ভেড়ীটা নেওয়ার কিছুদিন পরে শুনতে পেয়েছিলেন, লাগালাগি গ্রামটা চৌর্য-বৃত্তির জন্য প্রসিদ্ধ। তখন আর ফেরার উপায় ছিল না। অনেক ভেবে তিনি চোরদেরই একজনকে রেখেছিলেন কর্মচারী হিসাবে। চুরির বিরুদ্ধে পাহারা দেওয়ার জন্য যে লোক নিযুক্ত হয়ে তাঁরি নুন খাবে চুরি করতে গেলে তার মনে একটু নৈতিক দংশনের পীড়া নিশ্চয়ই উপস্থিত হবে। তাছাড়া তিনি সব সময়েই লোকটার সংগে গতানুগতিক মালিকদের মত ব্যবহার না করে ভাল ব্যবহার করবেন। তাতে তাঁর বিরুদ্ধে লোকটার মনে কোন বিদ্বেষের ভাব জন্মাতে পারবে না। এই ভাবে মানুষের সদ্‌বুদ্ধির উপর নির্ভর করা ছাড়া তাঁর আর উপায়ও ছিল না। চুরি নিবারণ করার অন্য ব্যবস্থাটা অনেক কঠিন, খরচ-সাধ্য।

কিন্তু এ সব অঞ্চল সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা কথাটা শুনে হেসে খুন হয়েছে। বাগদী জাতের আবার স্বাভাবিক সৎ বুদ্ধি! তাদের আবার বিবেক দংশন! এরা হল মদ আর তাড়ীর সমুদ্রের তলচর জীব। জন্মের সময় মন বলে একটা বস্তু নিয়েই হয়তো তারা জন্মায়, কিন্তু যথাসময়ে উপযুক্ত অক্সিজেনের অভাবে তা মরে হেজে ভূত হয়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে শুধু একটা শরীর; প্রকাণ্ড একটা শরীর। যদি চাবুক মেরে খাটিয়ে নিতে পারো, তবে অসুরের মত কাজ পাবে। যদি না পারো অসুরের মতই সে তোমার রক্ত চুষে খাবে।

এমন উপদেশ পেয়েও সন্দীপবাবু অরণ্যের নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি আধুনিক শিক্ষিত মানুষ। মানবতাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। এমন কি সমাজতন্ত্রবাদের তত্ত্ব সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। কিন্তু বলরাম সম্পর্কে তিনি কিছুতেই নিশ্চিন্তও বোধ করতে পারেন না। না পারেন তার কথা বিশ্বাস করতে, না অবিশ্বাস করতে।

একটু পরে সন্দীপবাবু বললেন, 'তোমার উপর ভরসা করেই ভেড়ী কোরছি, তা জানো তো বলরাম?'

'আরও একটা সুবিধে আপনার হয়েছে বাবু। চুরি আর এখন একবারেই হওয়ার জো নেই। গাঁয়ে এখন দারুণ দলাদলি নেগেছে। কেউ কিছু করলে অমনি তা জানাজানি হয়ে যাবে।'

'সত্যি নাকি?'

'আজ্ঞে, জমিদার বাড়ীতে গিয়ে শুনে এস্‌বেন। মুখ দেখাদেখি অবধি বন্ধ।'

'আমার পক্ষে সেটা ভালই, কী বল বলরাম?' সন্দীপবাবু একটু খুসী হয়ে তবু জিজ্ঞেস করলেন।

'কী বলেন বাবু? খুব ভাল।'

চা-পর্বের শেষে ম্যানেজার ফিরলেন। তিনি একটু ভেড়ীর এদিক ওদিকটা দেখতে গিয়েছিলেন। মুখটা আরক্ত, উত্তেজিত। কিন্তু সন্দীপবাবুকে দেখে তার মধ্যেই একটু অপ্রতিভ হাসি ফুটালেন।

'কি গো মণ্টু, খবর কি?'

'খবর, মামা, জিজ্ঞেস করুন এই বলরামকে। এদের সঙ্গে আর আমি পেরে উঠছি না।' মণ্টু, বা গণেশবাবু, অর্থাৎ ম্যানেজারবাবু বললেন। গলায় একটা আকস্মিক ক্রোধ এবং উত্তেজনার আভাস।

কাজেই সন্দীপবাবু একটু আতঙ্কিত হলেন।

'কী হয়েছে বলতো মণ্টু?'

'কী আবার? চুরি।'

'চুরি?' বলরাম সেই শব্দটাই উচ্চারণ করল প্রশ্নবোধকের স্বরে। কিন্তু তার মুখে না আছে বিস্ময়, না বা অস্বস্তি। বরং সে হাসছিল কৌতুকের হাসি।

'চুরি মানে কি? পুকুর চুরি। 'ঐ অশথগাছটার পাশ দিয়ে নেবেছিল শালারা। ভেবেছিল ও দিকটায় আমি হয়তো যাব না! হুঃ আমার চোখে ধূলো দেবে ব্যাটারা! এত সহজে!' বলে ম্যানেজারবাবু এই কতকটা অপ্রীতিকর ব্যাপারের মধ্যেও নিজের আবিষ্কারের গর্বে একটু হাসলেন।

সন্দীপবাবু বললেন, 'তবে চলো, একবার দেখেই আসা যাক জায়গাটা।'

তিনজনই বাঁধের উপর নেমে পড়লেন। মণ্টুবাবু গম্ভীর, এখনো রাগে ফুঁসছেন। সন্দীপবাবু একটু চিন্তিত, কিন্তু খুব বিচলিত নন। চুরি হওয়াটা অসম্ভবও নয়, অবিশ্বাস্যও নয়। কিন্তু চুরি হওয়ার অনেক ক'ঘণ্টা পরে বাঁধের অবস্থা দেখেই তাঁর ম্যানেজার সেটা ধরে ফেলতে পারে ম্যানেজারের কর্মতৎপরতার উপর এতখানি আস্থা তাঁর নেই। একমাত্র যে মানুষটাকে এই সমস্ত ঘটনাটার জন্য জবাবদিহি করতে হবে সে পরম নির্বিকার ভাবলেষহীন।

গম্ভীরভাবে জায়গাটায় উপস্থিত হলেন তিনজন। ম্যানেজারবাবু এবার দেখালেন জায়গাটা। বাঁধের থেকে একটি বা কয়েকটি লোক যে ভেড়ীর জলে নেমে হোগলা বন মাড়িয়ে অনেকটা ভিতরে চলে গিয়েছে তার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। স্পষ্ট একটা পথের রেখা পড়ে গিয়েছে। ম্যানেজার তাঁর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতার আরও প্রমাণ দেওয়ার জন্য বললেন:

'ভাল করে দেখুন মামা, ভাঙা হোগলার ডগাগুলো এখনো একেবারে তাজা রয়েছে। একটুও শুকনো নয়! অর্থাৎ চুরিটা হয়েছে কাল রাত্রেই।'

সন্দীপবাবু প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন বলরামের দিকে। বলরামের মুখে হাসি।

'এইটে দেখে আপনি এত ফট্‌ফট্টি নেইগেছেন মান্‌জার মশয়? আমি তো ভাবলুম কী না কী যেন দেখে ফেলেছেন। এটা কিসের পথ দেখাবেন? দাঁড়ান, দেখাই।'

বলরাম সেই অবস্থাতেই তৎক্ষণাৎ জলে নেবে পড়ল। জল প্রায় তার বুক অবধি উঠল—বর্ষাকাল তো। পথের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে সে হাত দিয়ে টেনে তুলল দুটো আটল। তার মধ্যে এক রাশ ছোট ছোট মাছ লাফ ঝাঁপ করে প্রবল হট্টগোল জুড়ে দিল।

বলরাম বলল, 'দেখলেন? কাল আত দশটায় পেতে গেইছিলাম। ফের ভোর চারটেয় এসে মাছ নে' ফের পেতে দে' গেছি। আট দশ সের কুঁচো মাছ যে সকালে বাজারে গেল, সেগুনো সগ্‌গের থে' আসেনি মান্‌জার বাবু।'

কথার অশিষ্টতা লক্ষ্য করে যে রোষ হল, সেটা গোপন করে ম্যানেজার বললেন, 'এখানে তুমি আটল পেতেছ তা তো বলনি আমাকে ?'

'কাল যে বললাম আপনাকে ভেড়ীর চাদ্দিকে আটল পেতে দিইচি ?'

তা বলেছিল বটে বলরাম, ম্যানেজার চুপ করে রইলেন।

সন্দীপবাবু খুসী হয়ে বললেন, 'তা বেশ করেছ বলরাম, খুসী হলাম। কুঁচো মাছ থেকে যদি দু'চার পয়সা আসে তো মন্দ কি ?'

'হ্যা বাবু', বলরাম বলল, 'আর এতো পয়সার ফেলা মাছ নয়কো। যা আসে, তাই লাভ। পুশে রেখেও লাভ নেই কো। শীতকাল এলেই পড়ে যাবে।'

অর্থাৎ মরে যাবে আপনা আপনি। মাছ জাতির জন্ম-মৃত্যু নাড়ী-নক্ষত্র সব এরা জানে।

'চল বলরাম, তোমার সঙ্গে সালতিতে করে আজ ভেড়ীটা ঘুরব।'

ফেরার পথে এগিয়ে যেতে যেতে বলরাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আপনার চোক তো জোনাকীর মত জ্বলে, না মান্‌জার বাবু ? আঁধারেও তো চোখে দেখতে পান ?'

অর্থাৎ নিজেদের চোখ সম্বন্ধে তারা যেটা বলে এবং যেটা অনেকখানি সত্যি, সেইটেই বলরাম চাপিয়ে দিতে যাচ্ছে ম্যানেজারের উপর। উদ্দেশ্যটা যে বিদ্রূপ করা তা সকলেই বুঝল।

'কেন ? কি হয়েছে ?' ম্যানেজার বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'এই জায়গাটা দেখুন তো লক্ষ্য করে ! কিছু বুঝতে পারেন ?'

ম্যানেজার এবং সন্দীপবাবু দু'জনেই দেখলেন এবং তারপর প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন বলরামের দিকে।

বলরাম বলল, 'এইখান দে' একটা মুনিষ নেবেছিল ! আজ সকালেই, না'লে এমন পষ্ট দাগ থাকতনি। দেখুন, ঘাসগুনো শুয়ে পড়েছে। তার উপরে কেমন একটা মাটীর টানা দাগ চলে গেছে জল অবধি। বেশী দুর'তক যায়নিকো নোকটা। বোধ হয় ট্যাটা নিয়ে লাটা-ফাটা ধরতে এইছিল। ইসব খু'চরো চুরি দুটো চারটে হবে বাবু, ঠ্যাকাতে পারবেন না।'

বলতে বলতে হঠাৎ বলরাম হরিণের মত ক্ষিপ্র বেগে নিমেষে জলে গিয়ে নাব্‌ল, এবং দু'চার বার জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে একটা ষোল মাছ টেনে তুলল। উঠে এসে মাছটার মাথা চেপে ধরে দেখালো সবাইকে। আধ সের তিনপোটাক হবে ওজোনে।

'ইদিগে একটা হোগলার গাদা আছে তাই ধরা গেল। না'লে এত জলে ধরা যেত নি।' বলরাম বুঝিয়ে বলল।

কিন্তু তা-ও কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। বর্ষাকালের ভারী ঘোলাটে জলের নিচে আধ ইঞ্চি অবধিও চোখের দৃষ্টি যায় না। তার মধ্যে মাছ আছে সুনিশ্চিত জেনে এবং তার সঠিক অবস্থানটা নিধারণ করে খালি হাত দিয়ে মাছ ধরাটা সোজা ব্যাপার নয়।

সন্দীপবাবু বললেন, 'জীবনটাই জলে জলে কাটিয়ে দিলে, না বলরাম? কাজটা শিখেছিলে ভালই।'

'তা বাবু, আপনাদের দয়ায় ভেড়ী ভাড়ার কাজে এমন কিছু জিনিষ নেই যা জানিনি, যা করতে পারবনি।'

এদিকে ম্যানেজার অনুভব করছিলেন, মালিকের কাছে তাঁর মর্যাদা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। সন্দীপবাবুর হাত ধরে একটু এগিয়ে গিয়ে কানে কানে বললেন, কাজ জানলে কি হবে মামা? ব্যাটা বজ্জাতের ঝার। কোন কাজ করে না—ভেড়ীর ঝাঁজি-গুলো পরিষ্কার করা দরকার হয়ে পড়েছে, করে না। ওর দেখা-দেখি আরগুলোও বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে। কুঁচো মাছ ধরায় এত উৎসাহ দেখছেন যে তার কারণ আছে। বৌকে দিয়ে দিনে পাঠায় মাছ বাজারে। কাজেই ওদিক দিয়ে কিছু পয়সা ঘরে এসে যায়, বুঝলেন না? সেই লোভে এত উৎসাহ। ব্যাটা বজ্জাতের ধারি। আর এদিকে আমার কথা শোনে না, একেবারে মান্য করে না আমাকে, দেখলেনই তো?'

মান্য যে কেন করে না সন্দীপবাবু তার কারণ কতকটা বুঝতে পারেন। অনভিজ্ঞ লোকের প্রতি কাজ-জানা লোকের স্বাভাবিক অবজ্ঞা। অনেক সময় সোজাসুজিও প্রমাণ করে বলরাম অনেক সময় রূপক দিয়েও করে। আরগুণ নেই ছাড়গুণ আছে এ-জাতের! জ্ঞানে মানুষকে কী করে বিদ্রূপ

করতে হয়। আশ্চর্য এই যে ম্যানেজারকে চটালে তার চাকরি যেতে পারে এ-কথা জেনেও সে এরকম করে। এই বাজারে কি চাকরির জন্য এতটুকু মায়া হয় না বলরামের ? চাকরি গেলে তক্ষুনি কি আবার চাকরি পাবে বলে সে বিশ্বাস করে ? না পেলে অনিশ্চিত জন-মজুরির উপর নির্ভর করতে কি তার ভাল লাগবে !

খানিক পরে বলরামকে নিয়ে সন্দীপবাবু সালতিতে উঠলেন। বলরাম গলুইতে দাঁড়িয়ে লগি ঠেলে সালতি চালাচ্ছিল, আর সন্দীপবাবু মাঝখানে বসে দু'পাশের ডালা ধরে কোনরকমে ভারসাম্য রক্ষা কোরছিলেন। বড্ড দোলে এই সালতিগুলো !

সালতি একটু এগিয়ে যেতেই ছোট বড় নানা সাইজের পোনা মাছ ভয় পেয়ে শূণ্যে লাফিয়ে উঠতে লাগল। বলরাম দেখিয়ে দিচ্ছিল, কোথায় জলের উপরে গায়ের শিড়ার মত শীর্ণ ঢেউ-এর রেখা স্বষ্টি করে বড় মাছ ছুটে যাচ্ছে, কোথায় উপরের ঘোলা জল দেখে বোঝা যাচ্ছে নিচের মাছের পুচ্ছ-তাড়নায় কাদা নড়ে উঠেছে। বেশ মাছ হয়েছে মনে হচ্ছে ভেড়ীতে। খুসী হলেন সন্দীপবাবু।

'এবার আপনার টাকা উঠে আসবে বাবু,' বলরাম বলল।

'যাওয়া না যাওয়া তোমারই হাতে বলরাম।'

'আজ্ঞে না বাবু, ভাগ্য। সব কিছু ভাগ্যিতে করে।'

সন্দীপবাবু আধুনিক মানুষ। অত ভাগ্য মানেন না। তবে তর্ক করলেন না।

খানিক পরে সালতি পরিষ্কার জল ছাড়িয়ে গিয়ে ঢুকল হোগলা বনের মধ্যে। বন ক্রমশঃ ঘন হতে হতে এক জায়গার দামে আটকিয়ে গেল সালতি। বলরাম তৎক্ষণাৎ জলে নেবে এক বুক জলে এক হাটু কাদার ভিতর দিয়ে উঁচুনিচু মাটির উপর দিয়ে সালতি টেনে নিয়ে চলল।

বলতে লাগল, 'বুঝলেন বাবু, ভাগ্যের উপর কারও হাত নেইকো। মাছের যত আপাই সব আমরা জানি ; শোল, শাল, ভোঁদর, মাটীর দোষ, জলের দোষ সব। তবু সব সামলে চলেও মাছ মাটি হয়ে যায়।'

'তারও কারণ আছে বলরাম। হয়তো কারণটা আমরা জানি না।'

সে কথায় কান না দিয়ে বলরাম বলে চলল, 'হয়তো এমন জল হল যে বাঁধ ভেসে গেল। হয়তো এমন রোদ হল যে মাছ মরে ভেসে উঠল।'

'তারও কিন্তু প্রতিবিধান করা যায়।'

'ভগমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পিতিবিধান নেইকো বাবু। ভগমান যা করবেন তা হবেই।' বলরাম অবিচল গাম্ভীর্যের সঙ্গে বি-এ পাশ বাবুকে তত্ত্বকথা শোনাতে সুরু করে দিল।

হঠাৎ একটা জায়গায় কোমর জলের থেকে একেবারে গলা জলে গিয়ে পড়ল বলরাম। এদিকে হোগলার বেষ্টনীতে এত কাছের থেকেও তাকে প্রায় দেখা যাচ্ছে না।

সন্দীপবাবু ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল বলরাম? লাগল না তো।'

'বাবু ভয় পাবেন না। আমি য্যাতক্ষণ আছি, ভয় নেই কো।'

যেন ভয় পাওয়ার কথা সন্দীপবাবুরই, তার নয়। সন্দীপবাবু যে একটু অস্বস্তি বোধ কোরছিলেন না, তা নয়। পড়ে গেলে সত্যি বিপদ আছে। ঘন হোগলার বনে দিনের বেলাও আধা-অন্ধকার, দু' এক জায়গায় জলের নিচে হোগলা আর নল পচে তাদের হাড়গুলো এমন জাল সৃষ্টি করেছে যে তার মধ্যে পড়লে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে বেরিয়ে আসা কষ্টকর। হোগলার গায়ে মাঝে মাঝে সাপ লটকে আছে, তার মধ্যে বিষাক্ত সাপও আছে। অথচ এই জঙ্গলের মধ্যে কাল রাত্রে বলরাম অনায়াসে নেমেছিল আটল পাতার জন্য!

'ওখানটা গর্ত ছিল নাকি বলরাম?'

'ঠিক ধরেছেন বাবু। আপনি আসার আগে আমরা সেবার কয়েকটা গর্ত করেছিলাম জাওলা মাছ ধরার জন্যে।'

খানিক পরে বলরাম আবার বলল, 'খুব ভাল মাটি বাবু এ ভেড়ীটার। কপালে থাকলে আপনার সব টাকা এবারই উঠে যেতে পারে। এই জঙ্গলটা আর এট্টু প'ষ্কার করার দরকার ছেল।'

জঙ্গল পরিষ্কার করা একটা সমস্যা। পরিষ্কার করলেও পরিষ্কার থাকে না। আবার ওঠে।

সন্দীপবাবু বললেন, 'করব এবারে।'

বলরাম হঠাৎ বলল, 'আমার হাতে যদি এ ভেড়ী পড়ত বাবু, তো আপনি য্যাত টাকা ঢেলেছেন তার আদ্ধেক টাকায় সোনা ফলাতাম।'

'কিন্তু তুমি এটাকে কেন নিজের ভেড়ী বলে মনে কর না বলরাম? আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, মাইনে টাইনে কিছু নয়। তোমার মত পাকা কাজের লোকের কি মাইনেয় চলে? তুমি ভেড়ী দাঁড় করিয়ে দাও আমি তোমাকে কারবারের অংশ দেব! নিশ্চয় দেব।'

এ কথায় বলরাম কোন জবাব দিল না, কোন উৎসাহ দেখালো না। যেন শুনতেই পায়নি। যে কথা বলছিল, তারই জের টেনে বলে চলল, 'এক ছটাক মাছটা ফেললে বছর গেলে ডেড়'সের সাত পো হয়ে যাবে। কত গুণ নাভ হল বলুন দিনি বাবু? কিন্তু এ সেই কাঠুরের গপ্পের মত। নোহার কুড়ুল ফেলে দিল তো ফিরে পেল সোনার কুড়ুল। লোভে পড়ে আর একজন কাঠুরে ইচ্ছে করে ফেলে দিল তার নোহার কুড়ুলটা, সে কিচ্ছুটি পেল নি, খালি হাতে উঠে এল। এমনি কারবার এ। রূপোর টাকা জলে ফেল, সোনার টাকা হয়ে উঠবে। আবার খোলাম কুচিও উঠতে পারে।'

একটা নিশ্বাস নিয়ে আবার বলল, 'কিন্তু মোদের হাতে পড়লে কিছু দিতেই হবে জলকে। পুকুরটায় ফেলেছিলাম দু'সের মাছ গেল বছর। কোন যত্ন করিনিকো। তা এবারে তিশ সের মাছ তবু তো পেইছি।'

শুনতে শুনতে সন্দীপবাবু কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। মিষ্টি কথার পিছলে পথে একসময় তাঁর মন আর বলরামের মন হয়তো অনেকখানি কাছাকাছি এসে পড়তে পারে। কিন্তু একটা জায়গায় এসে হঠাৎ পথ আট্‌কে যায়। কেউ আর এগুতে পারে না, হাত বাড়িয়েও কেউ কারও মনের নাগাল পায় না। ব্যবধানের একদিকে দাঁড়িয়ে একজন সন্দীপ ভাবছে, ওর মিষ্টি কথা সব ভাঁওতা, আসলে ওর মতলব চুরি করে শেষ করে দেওয়া। আর একদিকে দাঁড়িয়ে একজন বলরাম ভাবছে, বাবুর কথা তো মিষ্টি, কিন্তু বাবুর পেটে যে গরল নেই কী করে জানব? কোনদিন ঘুচবে কি এই ব্যবধান? কোনদিন ঘুচেছে কি কারও বেলায়?

আর চলতে চলতে একসময়ে তাদের বাক্যালাপ যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন বলরাম ভাবল, এই ফসা লম্বা সুন্দর চেহারার মানুষটি বেশ ভাল। কখন গালমন্দ করেন না, খারাপ ব্যবহার করেন না। এ অঞ্চলের আর পাঁচটা ভেড়ীওলার মত নন একেবারেই। তারা লেখাপড়া জানে না, হাতে-কলমে কাজ জানে, যদিও তাই বলে তাদের জাতের নয়। তাদের ফাঁকি দেওয়া যায় না, কাজ আদায় করে নিতে জানে, বুঝতে পারে সাত্যি কথা আর ঝুটো কথা। তাদের ব্যবহারেও নেই কোমলতা। বাবুটি তাদের মত নয়। কাজ জানেন না বলে তাকে কাজে ফাঁকি দেওয়া যায়। ভদ্র কথা বলেন বলে সেই সুযোগটাও নেওয়া যায়।

এটাও অন্যায়! বলরাম জানে, যার নুন খাই, তার কাজে ফাঁকি দিলে পাপ হয়। কিন্তু পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশ করতে করতে সে শ্রান্ত। সব জায়গাতেই সেই এক প্রশ্ন। আর পারে না সে অত হিসাব করতে।

ভদ্রলোকের যদি খুব লাভ হয়, তাতে তার আনন্দের কিছু নেই।

ভদ্রলোক খুব ভদ্র, তবু তার লোকসান হলে এতটুকু দুঃখ হবে না বলরামের।

হতেন যদি ধাপার বসু সাহেবের মত প্রকাণ্ড কারবারী! চোখ ধাঁধিয়ে দিতেন, লাল করে দিতেন সব জায়গা টাকা ছড়িয়ে ছড়িয়ে! তবু তো পাঁচ-জনের কাছে বলে বেড়ানো যেত নামটা।

আবার বলেন, 'তোমাকে শেয়ার দেব, বলরাম!' বলরাম কচি খোকা আর কি?

খাওয়া দাওয়া সেরে, নানা উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে, সন্দীপবাবু যখন ভেড়ী থেকে বিদায় নিলেন, তখন বেলা তিনটে সাড়ে তিনটের কম নয়। বলরাম এখন বাড়ীতে গিয়ে নিরিবিলিতে একটু বিশ্রাম করবেই। ম্যানেজারের বাবা এসে বললেও, তাকে এখন ভেড়ীতে আটকে রাখতে পারবে না কিছুতেই।

কিন্তু বলরামের কপালে সেদিন বিশ্রাম লেখা ছিল না। সবে বাড়ীতে পা দিয়েছে, নিতাই এর ছ' বছরের মেয়ে এসে বলল, 'বাবা ডাকতেছে বলাকাকা। বড় বাবু এয়েছে। একবার এস্‌তে হবে।'

বড়বাবু মানে জমিদারের বড় ছেলে। কাঞ্চন রায়ের মত দুর্ধর্ষ জমিদার যে ছেলেকে বাগ মানাতে পারে নি, সেই ছেলে। ইনি এমন কীর্তিমান ছেলে যে বাবার জমিদারিতে পর্যন্ত লুট করেন। জমিদারের কাজকর্ম দেখা-শোনা করার ধার দিয়েও যান না। কিন্তু বাপের মত ক্ষমতা তারও আছে অপর্যাপ্ত। বাপের ভেড়ী ইজারা নিয়েছে যারা তাদের থেকে ইনি ট্যাক্স আদায় করেন, তাদের ভেড়ী লুট করবেন না এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। অথচ এঁর দুর্ধর্ষ লুটের বাহিনীতে যে কারা আছে বলরামরাও তা জানে না। ওস্তাদ ছেলে বটে এই বড়বাবু। এ গ্রামের নিতাই আর বলাইএর সংগেই খুব দহরম মহরম বড়বাবুর। মোড়ল সুধন্যর সংগেও অল্প স্বল্প খাতির আছে। কিন্তু আবার বলরামকে ডাকা কেন বাবা? বলরাম তো আছে দূরে দূরে।

তবু না উঠে উপায় নেই। জমিদারের ছেলে। যে সে ছেলে নয়। সাক্ষাৎ যম।

এসে দেখল ঘরের বারান্দায় খালি মাটীর উপর কাত হয়ে পড়ে আছেন বড়বাবু। মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। রক্ত বর্ণ চোখ-জোড়া আধ-বোজা। মাদুর একখানা পড়ে আছে এক পাশে। গৃহকর্ত্রী পেতে দেওয়ার সময় পায়নি।

নিতাইয়ের খবর নিয়ে জানল এক রাশ বমি করে অস্থির হয়ে পড়ে ঘরে গিয়ে শুয়েছে। ঘরে গিয়ে দেখল, এইটুকু সময়ের মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে বড় বড় মাছি এসে বসেছে মুখে, ভন্ ভন্ করে ঘুরছে আসে পাশে। বিনি পয়সায় পেলেই মদ কি এমনি করেই খেতে হয়?

বৌ ঘরে নেই, রান্না ঘরে ঢুকে বসে আছে। বাচ্চা মেয়েটা ছিল এতক্ষণ, সেও কোথায় সরে পড়েছে। বলরাম বুঝল, নিতাই তাকে ডাকেনি; সে ক্ষমতা তখন তার ছিল না। কাজেই কে ডেকেছে, তা সে বুঝল। কিন্তু

যে ডেকেছে, সে একবারও কাছে এসে বলল না, কেন ডেকেছে বা বলরামকে কি করতে হবে।

কিন্তু বলরামের বুঝতে বাকি নেই তাকে কি করতে হবে। বড়বাবুর ভার নিতে হবে এখন তাকে। মরণ আর কাকে বলে!

বড় ছেলে কাঞ্চন রায়ের দু' চোখের বিষ তা ঠিক। কিন্তু তাই বলে মাতাল অবস্থায় তার ছেলে যদি এ গ্রামে যথোচিত আদর যত্ন না পায় তবে এ গাঁয়ের রক্ষা থাকবে না, তাও বলরাম ভাল করেই জানে।

বলরাম আস্তে আস্তে গিয়ে বড়বাবুর গায়ে হাত রাখল।

'কে?' বলে কষ্টে চোখ মেললেন বড়বাবু। কিন্তু বলরামকে দেখে মহূর্তে চিনতে পারলেন।

'বলরাম? বেশ বেশ! বোস! মহিমবাবুটাকে যা জব্দ করেছি আজকে সেই গল্প বলি শোন।'

মাতালের জড়ানো ভাষায় গল্পটা কিন্তু ঠিক বলে গেলেন বড়বাবু।

'একটু আগে এলে না বলরাম। মদটা বড় ভাল ছেলে—খাঁটি স্কচ। মাংসের চাটটাও বেড়ে রেঁধেছিল নিতাইএর বৌ।'
তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, 'নেতাইয়ের বৌ, ও নেতাইয়ের বৌ। বলি, চাঁচি টাচি একটু আধটু আছে নাকি হে? বলি, সাড়া দিচ্ছ না কেন? তোমার যা রূপ তা দেখাতে আর লজ্জা কি?'

মদের উপর লোভ আছে বলরামের। কিন্তু মাতাল দেখলে লোভ আর থাকে না। কিন্তু বড়বাবুর নাড়ীজ্ঞান তো এখনো বেশ টনটনে!

বলরাম বলল, 'একটু তেঁতুল গোলা খাবেন বড়বাবু?'

বড়বাবু রেগে গেলেন, 'তুই তো বেশ লোক বলরাম? একটু গোলাপী নেশা হয়েছে তা-ও নষ্ট করে দিতে চাস্!'

তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় গলা খাটো করে চোখ মট্‌কিয়ে বললেন, 'তোর না একটা রাঢ় আছে, বলরাম?'

বলরাম গলায় যথাসাধ্য বিস্ময় ঢেলে বলল, 'আমার!'—

কিন্তু আর কিছু বলার আগেই বড়বাবু থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আরে থাক্

থাক্; কষ্ট করে আর না বলার দরকার নেই বলরাম। চল্ যাই, একবার চোখের দেখা দেখে আসি তেনাকে—কী বলিস্ ?

বলরামের তৎক্ষণাৎ ইচ্ছে হল, এই পরিচয়ে জমিদারের ছেলে, কিন্তু যার আকারে এবং চালচলনে বাগদীর ঘরের ছেলের থেকে কোন তফাৎ নেই,—এর গালে তার চড়ের বিরাশী সিক্কার ওজোনের একটা পরীক্ষা দেয়। কিন্তু তা হয় না। জমিদারের ছেলে যে।

'আপনি ভুল শুনেছেন বড়বাবু।'

'মার কাছে মাসীর খবর গোপন করে কী হবে ভাই ?'

জমিদারের গোষ্ঠী যে! এদের কথা শুনতে শুনতে সেইটেই অভ্যেস হয়ে গেছে। হঠাৎ না করা যায় কী করে ? রাগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলরাম বিকৃতভাবে একটু হাসল। ঠিক আছে। সুভদ্রা যে এত এত বলে, একটু পরীক্ষা হয়ে যাক না আজ! যদি মেকী মাল হয় তবে এ ভালই হবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হবে।

বলরামের কাঁধের উপর ভর দিয়ে বড়বাবু দিব্বি চলতে লাগলেন! মদে এঁকে খেয়েছে বটে ; কিন্তু মদের পেটে গিয়েও গলে যাননি! শক্ত জায়গা!

সঙ্গে আর একজনকে দেখে সুভদ্রার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

'তোমার সঙ্গে এটি কে গো ?'

সুভদ্রাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বলরাম বলল, 'মোদের জমিদারের বড় ছেলে। মদে চুড় হয়ে আছে। ভাবলাম, তোর এত অভাব যাচ্ছে। যদি দুটো পয়সা আদায় করে নিতে পারিস্ তো ক্ষেতি কি ? যা মাতাল হয়েছে কিছু করতে তো পারবেনি।'

বলরামের দিকে স্থির দৃষ্টিতে সুভদ্রা তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ।

'তোমার কাছে মাঝে মাঝে পয়সা চাই, তাই পয়সা ওজগারের পথ দেখাচ্ছে ? বেশ! বেশ!'

বলরামের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। কোনরকমে বলল, 'না—না—সুভদ্রা—বিশ্বাস কর্। তুই শুধু দুটো কথা কয়ে মাতালটাকে ছেড়ে দে না। ওটার আর জ্ঞান ট্যান নেইকো।'

আর একবার জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুভদ্রা বলল, 'কী করতে হবে সে আমি জানি। ডাকো তোমার বন্ধুকে।'

বড়বাবুকে নিয়ে ঘরে দরজা দিল সুভদ্রা। বলরাম অনুমান করল, কিছু কড়া কড়া কথা বলে বড়বাবুকে বের করে দেবে নিশ্চয়ই সুভদ্রা। সে ঘেমে উঠল। অপমানিত হয়ে জেরটা বড়বাবু যদি তুলতে চান তার ওপর দিয়ে ?

কিন্তু সময় চলে যেতে লাগল, দরজা আর খোলে না। শেষে নানা দুশ্চিন্তা হতে লাগল বলরামের ! মাতাল মানুষটিকে সুভদ্রা কিছু করল না তো ! মাতাল হওয়া সত্ত্বেও বড়বাবু সুভদ্রাকে কিছু করল না তো ! তবে তো সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। থানা, পুলিস,—সে যে রাজ্যের হাঙ্গামা।

অনেকক্ষণ পরে খুট করে দরজা খোলার শব্দ হল। বড়বাবু টলতে টলতে বের হলেন। সুভদ্রা তাকে হাত ধরে সাহায্য কোরছে। কৈ কিছুই তো হয়নি দেখি ? অপমান, পাল্টা অপমান বা খুনোখুনী, কিছুই তো হয়নি ! নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে এল দু'জন। তবে কী করল এরা এতক্ষণ দরজা দিয়ে ?

সুভদ্রা পিছন থেকে হাতের ভাঁজ খুলে একটা দলা পাকানো নোট দেখালো। তারপর হাসল একটু। বলরাম বুঝতে পারল না কতখানি জ্বালা ছিল সেই হাসিটার মধ্যে।

বড়বাবুকে বাড়ী পেঁৗছে দিয়ে ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল গ্রামের সেরা সয়তানটার সঙ্গে। মনটা খারাপ। তবু নিরিবিলিতে পথ চলবে তার উপায় নেই। ঠিক জায়গা মত ওৎ পেতে বসে থাকবে বজ্জাতগুলো।

পাশ কাটিয়ে যাওয়ারই ইচ্ছে ছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, অন্তত গায়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে পাশ কাটানোর মত জায়গা আছে। বেশ রাত হয়েছে। এতদূরের রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা নেই। তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মানুষজন সব কিছু।

কিন্তু পাশ কাটানো গেল না। মুখোমুখী এসে দাঁড়াল অটবী।

'তুমি নাকি বড়বাবুকে সুভদ্রার কাছে নে' গেছলে বলাদা ?'

কে—কে প্রকাশ করে দিল এ-কথা ? এতটুকু সময়ের মধ্যে ? এ নিশ্চয় নিতাই এর বৌয়ের কাজ রান্নাঘরেরর ভেতর থেকে একমাত্র সেই বড়বাবুর কথাগুলো শুনেছিল। বুনো ওদের সবটুকুই বুনো, ভেতরটাই কি বারটাই কি !

'অটবী, এই দুকুর রেতে তুই কি মোকে অপমান করতে চাস্ ?'

একটু তিক্ত হেসে তেমনি শান্ত গলায় বলল অটবী, 'না। শুধু জানতে চাইছি, বড়বাবুকে সুভদ্রার কাছে নে' গেছলে কি না।'

'সুভদ্রাকে নে', আমি কি করি না করি তা দে তোর দরকার ?'

'কোন দরকার নেইকো। যা খুসী তা করো না, কেউ নিষেধ করবেনি। কিন্তু যে একটা কুকুরেরও অধম তাকে সুভদ্রার কাছে নিয়ে গেলে ?'

কথাটা সে ভুল শুনলো, না ইচ্ছে করে ভুল বুঝল বলরামই জানে। রাগে অন্ধ হয়ে এগিয়ে গিয়ে অটবীর গলার কাছে জামা চেপে ধরল।

'আবার মুখ খারাপ কোরছিস ? সেদিন বলছিলি না, গাঁয়ের বাইরেও জায়গা অছে শক্তি বিচের করবার ? এটা গাঁয়ের বার,—আয় আজ বিচেরটা হয়ে যাক।'

অটবী নড়ল না। ভয় পেল না, প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল না, প্রতি আক্রমনের তো নয়ই। শুধু তার ঈষৎ কুঞ্চিত চোখদুটি আর ঈষৎ বক্র ঠোঁটের পাশ দিয়ে এমন তীব্র ঘৃণা ফুটে বেরুচ্ছিল যে তা অনায়াসে বলরামকে দগ্ধ করে শূণ্য বাতাসে মিলিয়ে গেল।

একটু পরে বলরাম নিঃশব্দে জামাটা ছেড়ে দিয়ে সরে এল। কোন শব্দ নেই কোথাও। শুধু ছেড়ে দেওয়ার সময় জামাটায় একটু টান লেগেছিল পুরোণ জামা সইতে না পেরে পড় পড় শব্দে ফেরে গিয়েছে। সেই শব্দটা শোনা গেল।

তারপর অটবী বলল, 'শোন বলাদা। একটা কথা ভুলে যেওনি যে জমিদার মহাজন, বড় কারবারী আর ফরসা সার্ট-পাঞ্জাবী গায়ে-দেওয়া যে সব ভদ্দরনোক দেখ,—এরা সব ভেন্ন জাত। এরা আমাদের লয়। শোন বলি। আমার ত্যাখন দশ বছর বয়স। বেতুই গাঁ ছেড়ে বাবা গেছলেন বামুনগাঁতে পেসন্ন বাবুর ভেড়ীতে কাজ করতে বেশী পয়সার লোভে। নিজের দু' হাজার বিঘের

ভেড়ী নিজে চাষ করেন, বাবুর অগাধ বেত্ত। লোকের মুখে শুনতাম, বাবুর দয়ার শরীল। গরীবের পিতি খুব দয়া। তা একদিন ভেড়ীতে এইচেন বন্ধু বান্ধব নে'। তাঁবু ফেলা হয়েছে। টেবুল চেয়ারে বসে বেলাতী আর মাংসের চাঁট চলছে। বড় সোন্দর বাস বেইরেছে মাংসের। লোভ হল, দরজার গোড়া থেকে হাত বাড়িয়ে চাইলাম এক টুক্‌রো মাংস। বাবু হেসে বললেন, মাংস খাবে খোকা? দাও তো রামুই এর হাতে এক টুকরো মাংস বলে চোখ মট্‌কে দিলেন রসুইকে। রসুই ভিতরে গে' উনুনে চড়ানো মাংসের থে' এক টুক্‌রো নে' এসে মোর হাতে দিল। চীৎকার করে ফেলে দিলাম মাংস। তক্ষুনি ফোস্কা পড়ে গেল হাতে। বাবু হেসে বললেন, গরীবের ছেলে। পান্তাভাত চাইবে। চাইলে পাবেও। মাংস চাইতে গেলে এমনি শাস্তি হবে। আর যত বাবুনোক বসেছিল মোর হাত পুড়ে গেল দেখে কারও চোখের পাতাটি নড়লনি। সেদিন থে' ওদের চিনেছি বলাদা। কোনদিন আর চিনতে ভুল হয়নিকো। আজ সেই তাদের একজনের হাতে সুভদ্রাকে সঁপে দিলে বলাদা?'

নির্জন পথের প্রান্তে এ কথা শোনার জন্য তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না; কালো আকাশের তারারা মিট মিট করে তাকিয়ে শুনছিল। আর শুনছিল স্তব্ধ হয়ে বলরাম। আজ এই মুহূর্তে অটবীর সংগে তার কোন মতভেদ নেই। অটবীর প্রত্যেকটি কথাতে তার সমস্ত মনপ্রাণ পুরোপুরি সায় দিল। আর ছোটবেলা থেকে শোনা, ভাগবত কাকার কাছ থেকে শোনা, বস্তা বস্তা নীতির বুলি আজ এই মুহূর্তে বাসী পচা রুটি বলে মনে হল। ডাষ্টবিনে না ফেলে দিয়ে উপায় নেই সেই রুটিগুলো।

দিন সাতেক পরে বৈঁতুই গাঁ-এর স্তম্ভিত বাসিন্দারা শুনল বড়বাবুর সঙ্গে সুভদ্রা ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে। কোলের ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়েছে, বড় ছেলেটা আর মেয়েটাকে ফেলে গিয়েছে।

সুভদ্রার স্বামী কুড়ান সেদিন এল বলরামের কাছে। দুটো ছেলে-মেয়েকে পোষার ক্ষমতা তার নেই। বলরামের বলে সন্দেহভাজন ছেলেটিকে সে বলরামকে দিয়ে যেতে চায়।

কৃশ দুর্বল মানুষটা বলরামের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। তার মাত্র বত্রিশ বছর বয়স। কিন্তু কোনদিন, আর কোনদিন, তার ঘরে বৌ আসবে না। আবার বৌ কেনার টাকা কোথায় পাবে সে! বাকী জীবনটা কাটাতে হবে তাকে একা নিঃসঙ্গ। অথচ বৌ তার মরে যায়নি। আর কারও সংগে ভালবাসায় পড়ে বা যাকে ভালবাসত তার সংগে জুটে সে বেরিয়ে যায়নি!

মা-হারা ছেলেটাকে নিজের কাছে রাখল বলরাম।

ছয়

অসুখ করে নয়, ইচ্ছে করেই যে অটবী জমিদারের কাজে যায়নি এ কথা যথাসময়ে জমিদারের কানে গিয়ে পৌঁছল।

শুনে নায়েব সুমন্তবাবু বললেন, ছোঁড়া বড্ড বজ্জাত। কেমন চোঁয়ারের মত কথাবার্তা বলে দেখেছেন তো! ওকে সময় থাকতে সরিয়ে দিন। না হলে ও গাঁ-টাকে উচ্ছন্নে পাঠাবে কর্তাবাবু।'

'সরিয়ে দেব কোত্থেকে? গাঁ থেকে?' কাঞ্চন রায় জিজ্ঞেস করলেন।

'শুধু গাঁ থেকে কেন কর্তাবাবু, পৃথিবী থেকে। মশা-টশা বেশী উৎপাত করলে চড়টা চাপড়টা দিয়ে দুটো চারটে নিকেশ করে দিলে কী ক্ষতি?'

জমিদার শুধু একটু হাসলেন। কোন কথা না বলে নিজের কাজে, অর্থাৎ দলীল দেখায়, মন দিলেন।

খানিক পরে সুমন্তবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'অটবীকে সরিয়ে দেওয়ার কিছু কি করছেন কর্তাবাবু?'

এবার জমিদার রাগ করলেন, 'সুমন্ত মনে রেখ, জমিদারীটা তুমি চালাচ্ছ না, আমি চালাচ্ছি।'

দিন কয়েক পরে অটবীর ঘরের হোগলার ছাউনিতে আগুন লাগল।

রাত গোটা দশেক। অটবী সবে শুয়েছে। একটু ঘুমের আমেজ কেবল এসেছে, এমন সময় একতাল নরম কোমল এঁটেলো মাটী অটবীর সারা শরীর বেষ্টন করে ধরল। মাটী, অথচ ঠাণ্ডা নয়, উষ্ণ। তা, বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ পড়েছে—ভালই লাগল অটবীর। টেনেটুনে আরও ভাল করে জড়িয়ে নিল গায়ে।

এদিকে রাধা ক্রমাগত 'আগুন আগুন! ওঠো ওঠো!' বলে চেঁচাচ্ছে তো চেঁচাচ্ছেই; কোন সাড়া নেই মানুষটার থেকে। শেষে রেগে বলল, 'তাড়ীখোর মুনিষদের সঙ্গে যারা ঘর করে তারা জানোয়ার।'

তা তাড়ী একটু খেয়েছিল অটবী। এত কথার মধ্যে ঐ অত্যন্ত প্রিয় তাড়ী

কথাটা তার কানে গেল। তাইতেই উঠে বসল। বসে বুঝতে পারল আগুন লেগেছে। তবু কি ছাই কোন তাড়া আছে মানুষটার? ধীরে সুস্থে বিছানা গুছিয়ে নিয়ে তবে বেরুল অটবী।

এদিকে বাইরে তখন লোকের ভীড় লেগে গেছে। মই এসে গেছে। মইতে উঠে তিন চারজন বাঁশ দিয়ে উপরের হোগলাগুলো ফেলে দিতে চেষ্টা কোরছে। কয়েকজন গেছে পুকুরে জল আনতে। এলো বলে।

রাধা আর কাঁঠাল হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের সামান্য মালপত্র টেনে বার কোরছে। গাঁয়ের প্রত্যেকে খাটছে যেন তার নিজের ঘর। একমাত্র অটবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল আর ঠোঁটের উপরকার মোচের ক্ষীণ রেখাটার উপর হাত বুলোতে লাগল।

বাগদীর ঘরে আগুন দিয়ে আর কে কী ক্ষতি করবে? ছাউনিটা পুড়বেই। তবে আগুনের ছাঁকা লেগে মাটীয় দেওয়াল বরং একটু শক্তই হবে। ছাউনি তুলতে আর কতক্ষণ? আশ-পাশের কোন বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে আসবে রাতের আঁধারে—পয়সা লাগবে না। ভেড়ী থেকে হোগলা কেটে আনলে ভেড়ীওলা খুসীই হবে। সন্ধ্যেয় সন্ধ্যেয় কাজ করবে, দিনের কাজের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু আগুনটা দিল কে?

খানিক পরে সেই রাত্রে হাজরার 'থানে' গ্রামের বয়স্করা গিয়ে ছুটো টিমটিমে লণ্ঠনের আলোর নিচে জড়ো হলো। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গিয়েছে যে আগুন লাগার একটু পরে রামাইকে দেখা গেছে আলা ঘরের পাশ দিয়ে যেতে! রামাই জমিদারের পেয়াদা। কাজেই কাজটা যে রামাই করেছে জমিদারের নির্দেশে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। যেমন বোকা রামাই! যাদ অশথগাছের পাশ দিয়ে যে সড়কটা গেছে সেইটে ধরে যেত তবে কেউ তার হদিস পেত না। তবে তাতে তাকে তিন মাইলের জায়গায় দশ মাইল হাটতে হত। মাইনের চাকর, অত খাটবে কেন?

কাজটা জমিদারের, এ কথা জেনেই সবাই উত্তেজিত হয়েছে। ছুটে এসেছে পরামর্শ করতে। এ-সব সময় দলাদলির কোন প্রশ্ন নেই। গাঁয়ের

কারও গায়ে বাইরের লোকের হাত পড়লে সে আঘাত সকলের গায়েই পড়ল বলে সবাই মনে করে।

যজ্ঞেশ্বর বলল, 'জমিদারের মতলবটা কি বুঝাত পারতেছ বলরাম? এবার মোদের উচ্ছেদ করতে চায় মনে লিচ্ছে যেন।'

নিতাই বলল, 'তা তো চাইবেই। কথা আছে, কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। তা এখন তো আর তেমন দাঙ্গা-হাঙ্গাম খুন-খরাবির দরকার নেই। এখন মোদের তেইড়ে দিতে পারলে তিশ বিঘে জমি খাসে আসে—দশ হাজার টাকার মাল।'

চরণ বলল, 'কিন্তু এর কি পিতিবিধান নেই?'

'পিতিবিধান আছে', বলরাম বলল. 'এবার মোরা গে' নিরঞ্জনবাবুকে ধরে নে' এসব। এস্‌তে না চাইলে জোর করে নে' এসব। মোদের একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই সে-লোক করে দেবে। দয়ার শরীল তাঁর।'

নিরঞ্জনবাবুর নামটা এ অঞ্চলে খুব পরিচিত। বিপদের সময় এ-নামটা উচ্চারণ করেও তারা খানিকটা জোর পায়। তিনি নাকি গরীবের বন্ধু, চাষী-দের বন্ধু। এই ঘরের কাছের সোনারপুর অঞ্চলের হাজার হাজার কৃষক তাঁর কথায় ওঠে বসে। পুলিশের বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে সভা করে, আন্দোলন করে।—তে-ভাগা আন্দোলন।

নিধু বলল, 'তাঁকে এবারে ডাকবার সময় হয়েছে মনে নাগতেছে যেন।'

এই উত্তেজনার মধ্যে অটবী একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল শান্ত হয়ে। বুকের উপর হাত দু'খানা আড়া-আড়ি ভাবে স্থাপিত। একমাত্র সে-ই জমিদারের ব্যাপারে বিস্মিত হয়নি, ক্রুদ্ধ হয়নি। যেন, জমিদার যে এমন করবে, এটাই সে স্বাভাবিক বলে মনে করে।

সে বলল, 'কিন্তু নিরঞ্জনবাবুকেই বা বিশ্বেস কি। ছেঁড়া হোক, ফর্সা সাট গায়ে দেয় তো সে-নোকটা। বড় নোকের ছেলে। মনের ভিত্‌রে তার কী আছে কে জানে? না কি বল—যজ্ঞেশ্বরকাকা।'

উপস্থিত সকলের থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল।

ঘরে ফিরে এসে দেখে রাধা চীৎকার করে কাঁদছে আর অদৃশ্য শত্রুকে ঘরে

গিয়ে গলায় রক্ত উঠে মরে যেতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে। অটবীকে দেখেই কান্না থামিয়ে রাগে ফেটে পড়ল।

'কেমন মিন্‌সেগা তুমি? আক্কেল বুদ্ধি হবে কি গোয়ালাদের মতন সেই আশী বছর বয়সে? জমিদারের সঙ্গে নাগতে গেছলে কেন? লিশ্চয় মন্দ টন্দ বলেছিলে তুমি, তাইতো এমুন সব্বোনাশটা হল!'

'চুপ্ কর্ মাগী', অটবী ধমক দিল। কিন্তু রাধা কি শোনে! বলে চলল, 'নোকে কথায় বলে, জমিদার বামভন। তাঁদের সব্বদা পেন্নাম করতে হয়। মোরা সামান্যি মুনিষ, ঘর-টর বাঁধব, জন-টন খেটে সংসার করব। বড় নোকের সঙ্গে নাগতে যাব কেন গো বে আক্কেলে মিনসে?'

এইসব সময়ে অটবীর মনে হয়, মাঝে মাঝে বৌকে মারা ভাল। রাধার কানটাকে মচরে ধরে বলল, 'পুরুষ মুনিষের কাজে নাক গলাতে এস্বি আর হারামজাদী?'

তাতেই রাধা ফোঁস করে উঠল। ধাক্কা দিয়ে অটবীর হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, 'মোকে বলরামের বৌ পাওনি। গায়ে হাত দেবেনি বলতেছি। মরদ কত—বৌ মারতে ওস্তাদ!'

ঈস্! আত্মসম্মান জ্ঞান মেয়ের একেবারে টনটনে! এদিকে জমিদারের ভয়ে তো কেঁচো! সহরে গিয়ে গিয়ে বৌ ঝি গুলো বড্ড বেড়ে উঠছে দিন দিন।

রাগ হল অটবীর। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হল খানিক আগে রাধার গা জড়িয়ে ধরাটা কী সুন্দর লেগেছিল! রাধা একটু বেয়াড়া বটে। তবে বড্ড ভালবাসে তাকে।

দিন কয়েক পরে জমিদার বাড়ী থেকে ডাক এল অটবীর। আবার কি নতুন মতলব এঁটেছেন জমিদার কে জানে?

তলব অনুযায়ী সকালবেলা গিয়ে হাজির হল অটবী। আবার একটা বেলা নষ্ট হবে, একটা বেলার অর্থকরী কাজ। জমিদার যখন খাজনা আদায় করতে পাঠান, তখন খাজনা দিয়ে দিতে না পারলে প্যায়দাকে দিনের মজুরী দিতে হয়। জমিদারের এজলাসে অনেক দিন তাদের নষ্ট হয়। দিন-মজুরীর কথা কেউ তোলে না।

খানিকক্ষণ বসতে হল। জমিদার ঘুম থেকে উঠে পায়খানায় গেছেন। পায়খানায় তাঁর ঘণ্টাখানেক কাটে। সুতরাং কিছু দেরী আছে।

এদিকে অর্থী প্রার্থীর ভীড় ক্রমশঃ বাড়ছে। বেলাও বাড়ছে। জমিদার পান চিবুতে চিবুতে বছর দশেক আগে কেনা চটি জোড়া ফট্ ফট্ করতে করতে ঘরে এসে ঢুকলেন। সবাই এক যোগে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালো। যে লোক মাত্র দিন কয়েক আগে ঘরে আগুন দিয়ে তাকে ভিটা ছাড়া করতে চেয়েছিলেন, তাঁকে অটবীও ওঠে দাঁড়িয়ে শরীর আধখানা বাঁকিয়ে নমস্কার জানালো। মানী লোক তো বটে জমিদার।

অটবীকে দেখে জমিদারের সহর্ষ মুখখানাও যেন একটু গম্ভীর হল।

'অটবী এসেছো ? এস, তোমার কাজটাই আগে সেরে দি। কাজের লোক তোমরা।'

আর সবাইকে বসতে বলে অটবীকে নিয়ে জমিদার পাশের ঘরে ঢুকলেন। প্রথমেই অটবীর ঘরে আগুন লাগার জন্য আন্তরিক দুঃখ জানালেন। তাঁর আরও আপশোষ এই জন্য যে কুলাঙ্গার বড় ছেলে যখন এই সব মতলব করছিল তখন তিনি ব্যাপারটা জানতে পারেননি। তবে ছেলের অপরাধও একরকম তাঁরই অপরাধ, কাজেই তিনি ক্ষতিপূরোণ করবেন।

অটবী গম্ভীর হয়ে বসে ভাবতে লাগল। কাঞ্চন রায়ের মত জমিদার, যাঁর বুদ্ধির কাছে উকিল ব্যারিষ্টাররা হার মানে, তিনি একটা কাঁচা চাল দিয়ে ফেলে কী অসুবিধাতেই না পড়ে গেছেন। জমিদার তবে ইতি মধ্যেই বুঝেছেন যে ঘরে আগুন দেওয়ার পিছনে কে ছিল তা তারা জেনে গেছে ?

অটবীকে জমিদার ক্ষতিপূরণ করতে চাইলেন একটা ভাল কাজ দিয়ে।

'তোকে একটা ভাল চাকরি দি অটবী ? যা না সাহেবের লাটে। টাকা চাল্লিশ মাইনে যাতে দেয় তার ব্যবস্থা করে দি, কি বলছিস্ ?'

অটবী ঘাড় নাড়ল।

'আজ্ঞে না কর্ত্তাবাবু, ও নিধিরাম বাগের কাজ করতে পারবনি। ব্যাটা কসাই।'

'করবি না! তবে কি করবি বল্ দেখি অটবী! কাছাকাছি তো ভাল কাজ চোখে দেখছি না।'

'উবগারই যদি করবেন কত্তাবাবু, তো গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার দিন না। ক্যানিং থেকে মাছ এনে ব্যবসা করি।'

জমিদার রাজী হলেন। তৎক্ষনাৎ লেখাপড়া ইত্যাদি হয়ে গেল।

মোটের উপর অটবীকে গ্রামের চৌহদ্দীর থেকে সরিয়ে দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছিল কাঞ্চন রায়ের কাছে। লোকটা বিপজ্জনক। নায়েব যেমন পরামর্শ দিয়েছিলেন, পৃথিবী থেকে ওকে সরিয়ে ফেলা,—সেটা সম্পর্কে এখনো তিনি কিছু ভেবে ঠিক করেননি। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি নিশ্চিত, সে প্রয়োজন যদি সাধন করতেই হয় তো করতে হবে গ্রামের চৌহদ্দির থেকে দূরে যাতে গ্রামবাসীরা কোনক্রমে তাকে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করতে না পারে। বাগদীদের তিনি কোনক্রমেই অসন্তুষ্ট করতে পারেন না। তারা জানে না, কিন্তু তারা যদি বিরোধী কোন জমিদারের হাতে গিয়ে পড়ে তবে তাঁর ভীষণ বিপদ ঘটতে পারে। তারা তাঁর জীবনের এমন অনেক কিছু জানে যেগুলো তাঁর বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার হতে পারে।

তা অটবী নিজেই ক্যানিং যেতে চাইছে, যাক্ না। তবু খানিকটা সময় বাড়ীর থেকে দূরে থাকবে।

ক্যানিং যাওয়ার কথা অটবী দিন কয়েক ধরেই ভাবছিল। ঘরে বসে করার মত যে সব কাজ তারা সচরাচর পায় তার উপর নির্ভর করে এখন আর সংসার চলছে না। রোজগারের সুবিধার জন্য গ্রামের লোকেরা এখন চুরি টুরি করার ব্যাপারে দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তাতে যে জন পিছু রোজগারের পরিমাণ তেমন একটা কিছু বেড়েছে তা নয়। মুস্কিল এই যে চুরি করার ক্ষেত্রই এখন খুব সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। ভাল মাছ-ভর্ত্তি ভেড়ী গুলো আজকাল এত সুরক্ষিত যে সে-সব জায়গায় ঢুঁ মারা যায় না। তাদের পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক হল ওদেরই জমিদারের অধীনস্থ ভেড়ীগুলো। কিন্তু

তাদের সংখ্যা আর কয়টা। তা ছাড়া এখন শীত আসছে। এ সব অঞ্চলে শীতকালে চুরিটা বিশেষ লাভজনক নয়। মাছগুলো সব একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে বলে জালে বেশী মাছ আট্‌কায় না। আর এই শীতকালটায় ভেড়ী ভাড়ায় জন-মজুরীর কাজও খুব কম হয়। বলতে গেলে এ সময়টায় ভেড়াওলারা বসে বসে শুধু ঝিমোয়। সব দিক মিলিয়ে এই শীত কালটা বেতুই গাঁ এবং আশ পাশের লোকেদের পক্ষে খুব খারাপ সময়।

অনেকেই এ সময়টা বাইরে এদিকে সেদিকে বেরিয়ে পড়ে কাজের চেষ্টায়। অটবীও সেই কথাই ভাবছিল। এবং ভাবতে গিয়ে তার মনে হয়েছিল, দূরে কোথাও গিয়ে জনমজুরীর কাজ করার চেয়ে ক্যানিং থেকে মাছ কিনে মাছের পাইকারের কাজ করলে কেমন হয়? এ-লাইনে সে ইতিপূর্বে কাজ করেনি। একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি? হয় তো এই সামান্য আরম্ভের থেকে ভবিষ্যতের একটা ভাল রকমের হিল্লে হয়েও যেতে পারে।

মূলধনের ব্যাপারটাই ছিল সমস্যা। ভাগ্য ভাল। জমিদার সদয় হয়ে টাকাটা ধার দিতে চাইছেন। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির নেক-নজরটাও অবিশ্যি সন্দেহের ব্যাপার। কিন্তু মনের সন্দেহ মনেই থাক, আপাতত তো কার্যোদ্ধার হোক।

নদীর ধারে রাত দুটোর থেকে ক্যানিং-এর মাছের বাজার বসেছে। হ্যারিকেন আর ঝোলানো লম্ফের টিমটিমে আলোয় স্যাতস্যেতে মেঠো জায়গাটা দর-দস্তুরের কোলাহলে এবং ঠাসাঠাসি লোকের ভীড়ে সরগরম হয়ে উঠেছে।

রাত প্রায় চারটের সময় বাজার প্রায় ভাঙে ভাঙে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে অটবী ছুটে এল বাজারে। হোটেলের ছাড়পোকা-বহুল বেঞ্চির উপরেও সে এমন ঘুমিয়ে পড়েছিল যে সময় মত ঘুমই ভাঙেনি। নতুন নতুন কাজে হাত দিয়েছে, মাপ মত ঘুমটা এখনো রপ্ত করে উঠতে পারেনি।

এসে দেখল, পাইকারদের অনেকেরই কেনাকাটা হয়ে গিয়েছে ; এমন-কি মাছে বরফ মিশিয়ে চাকনে ভর্তি করে প্যাক করা পর্যন্ত কারও কারও শেষ। ফাঁকে ফাঁকে দুটো চারটে লম্ফের আলো দেখে বোঝা যায় দু'চার ঝুড়ি মাছ

এখনো অবিক্রীত আছে, এবং তারই উপর মক্ষিকার মত পাইকারের দল হুমাড় খেয়ে পড়েছে।

একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা য়জাগায় বসেছিল এক বুড়ো এক ঝুড়ি বাগদা চিংড়ি নিয়ে। অটবী তার সংগে পঁয়তাল্লিশ টাকায় দর সাব্যস্ত করে টাকা গুনতে লাগল। হঠাৎ কোত্থেকে এক পাইকার হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত।

অটবী সাবধান করে দিল, 'ইদিগে লয় ; এ-মাছ কেনা হয়ে গেছে।'

'কেনা হয়ে গেছে ? কতয় কিনলে ?'

'পঁয়তাল্লিশ ?'

'আমি পঞ্চাশ দোব। মাছটা আমাকে দাও বুড়ো।'

বলে লোকটা নিমেষের মধ্যে খান কয়েক নোট বুড়োর হাতে গুঁজে দিয়ে মাছের ঝুড়ির দিকে হাত বাড়ালো।

বলরাম গিয়ে লোকটার গায়ের গেঞ্জীর গলার কাছটা চেপে ধরল।

'কি রে ব্যাটা. ব্যাপার কি ? বললাম যে মাছটা আমি কিনেছি, কানে নাগলোনি বুঝি ?'

লোকটা ঝাঁজের সংগে বলল, 'তুমি মাছ কিনেছ কি না কিনেছো সেটা কি ঝুড়ির গায়ে লেখা আছে নাকি ? গলা ছাড়ো বলছি।'

'ভাল মুখে বললাম তাতে হলনি বুঝি ? বেশ কোথায় লেখা আছে তা তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি বজ্জাত।'

অটবীর আর একখানা হাত নড়ে চড়ে মুঠো তৈরী কোরছে দেখতে পেয়ে লোকটা তৎক্ষণাৎ ভোল পাল্টিয়ে ফেলল। দুই হাত দিয়ে অটবীর একটা হাটু চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বলল, 'দাদা, বুঝতে পারিনি। ক্ষেমা ঘেন্না করে ছেড়ে দাও এবারটি। তুমি আজা নোক। গরীব মনিষটাকে মাছ ক'টা ছেড়ে দাও এবারের মত। না'লে মোর একদিনের বাজার কামাই যায়।'

যেন অটবীরও সেই একই সমস্যা নয় ! লোকটার মিনতি-করুণ রেখাবহুল মুখখানার দিকে ঘৃণাভরে তাকালো অটবী।

অটবী বলল, 'তোর উপর আবার দয়া কিরে ? তুই তো গায়ের জোরে মাছ লিতে এইছিলি ? আয় না, নে না গায়ের জোরে ?'

লোকটা তেমনি অটবীর হাটু ধরে রেখে বলল, 'আমি তোমার পায়ে ধরছি দাদা। আমি তোমার পায়ে লাক ঘস্‌ব।'

অটবীর রাগ আরও বেড়ে গেল। পূরো এক মিনিট জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লোকটার মুখের দিকে। সে মুখখানা অনুনয় আতঙ্ক আর লোভ মিলিয়ে কী যে বীভৎস দেখাচ্ছিল। অবশেষে অটবী ছেড়ে দিল সে-লোকটাকে, এবং আর একটীও কথা না বলে সে-জায়গাটা ত্যাগ করল।

ঠিক সেই সময় একখানা মাছের নৌকা এসে পাড়ে ভিড়ল। তৎক্ষণাৎ অটবী ছুটে গিয়ে নৌকায় লাফিয়ে উঠল। নৌকা ভর্তি মাছ—এখানেও সেই বাগদা চিংড়ি। এক ঝুড়ি মাছ যাট টাকায় রফা করে ফেলল অটবী।

অটবীর পিছনে পিছনে আরও দু'তিন জন পাইকার এল। তারাও ঐ দামে এক ঝুড়ি করে মাছ নেবে।

এমন সময় আরও একটি লোক এল। লোকটি বোধকরি তাদেরই জাতের তেমনি কালো রঙ গায়ের। কিন্তু গায়ে চড়িয়েছে ধোপ দুরস্ত কাপড় আর ফুল-হাতা সার্ট। দেখেই বোঝা যায় শাঁসালো খদ্দের, হয়তো বা কোলকাতার কোন মাছের আড়তের লোক।

মাঝিটা নিশ্চয়ই তার পূর্ব-পরিচিত। তাকে দেখেই হাসল।

'তোমার নৌকার সব মাছ আমি কিনলাম মাঝি।'

মাঝি হেসে বলল, 'কত দর দেবে ঠিক হলনি। আগেই বলে, কিনলাম!'

'তা তোমার দর কত বল?'

'তিনশো টাকা।'

মাঝখান থেকে অটবী বলে উঠল, 'তোমরা দর দস্তুর করার আগে মোদের মাছটা দে' দাও বাছা।'

শাঁসালো খদ্দেরটি অটবীর আপাদ-মস্তক একবার তাকিয়ে দেখল।

'নবাবের ব্যাটা আমার। মুখখানা চাঁদের পারা! দেখছিসনি নৌকা সুদ্ধু মাছ কিনছি। তোমরা দু' পয়সার খদ্দের, কেটে পড় এখান থে'।

'সাবধানে কথা বলবি হারামজাদা। মোরা আগে দর করিচি—মোরা মাছ নেবই।'

'বটে ? আস্পদ্দা তো কম নয় ! ফাঁদ বুঝি দেখিসনি বেজন্মার পুত !'

বলে লোকটা এগিয়ে এসে অটবীর গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। তাতে অটবীর কিছুই হল না। কিন্তু অটবী যে পাল্টা চড়টা বসাল তাতে লোকটা এক পাক ঘুরে এসে ঝিম মেড়ে দাঁড়াল।

এত বড় পয়সাওলা লোকের গায়ে হাত দিতে দেখে মাঝিটা একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর রুখে গেল অটবীর দিকে। অটবী তৎক্ষণাৎ নৌকার একটা লগি তুলে নিয়ে জানালো, যে কেউ ইচ্ছে এগিয়ে আসতে পারে।

গোলমাল আশঙ্কা করে অন্যান্য পাইকারেরা আস্তে আস্তে সরে পড়ল। তারপর, অনেক বাগ-বিতণ্ডা হল, শেষে অনুনয় বিনয়ও হল। অটবী নির্বিকার। এক ঝুড়ি মাছ নিয়ে তবে সে ছাড়ল।

চাকন মাথায় করে ছুটতে ছুটতে এসে যখন অটবী গাড়ীতে উঠল তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। চলছে আস্তে আস্তে! দরজায় মুখ গলিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখল একটু আগে যেখানে মাছের বাজার বসেছিল সেই জায়গাটা। মাছের ঝুড়ি থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে জল পড়েছিল, ভিজে সপসপে হয়ে আছে জায়গাটা। আসন্ন সকালের অস্পষ্ট আলোয় চিক্‌চিক্ কোরচে। জায়গাটায় এখন একটি লোকও নেই, না বা একটি ঝুড়ি। সকাল বেলায় শহরের বাবুরা বাজার করতে এসে কল্পনাও করতে পারবে না রাত্রি বেলা এখানে কী কাণ্ডটা চলছিল।

দাম ভাল পাওয়া যাবে এই আশায় অটবী চলে এল গড়িয়াহাটার বাজারে। এবং সেখানে আবার আর একটা দুর্ঘটনা ঘটল।

বাজারে ঢোকার সময়ও অটবী বেশ খুশী-খুশী বোধ কোরেছিল। ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করেছে বাগদাটা বেশ ভাল দামে বিক্রী হচ্ছে বাজারে। আড়াই তিনের কমে যায় না কোনদিনই। যদি দু' টাকায়ও যায় আজকের বাজারে সময়টা কোটালের মুখে মুখে বলে, তবু তার লাভ ভালই থাকবে। ষাট টাকায় যে মাছটা কিনেছে, থাউকো হিসাবে কিনলেও, তার পরিমান মনটাকের কম হবে না। বরফ গলা জলে ফুলে ফুলে পরিমাণটা আর একটু বাড়বে, তাতে

বরফের দামটা অন্তত উঠে যাবে। তা ছাড়া নিজের হাত সাফাই এর ক্ষমতার উপরও সে খানিকটা আস্থা রাখে বই কি! তাতেও খানিকটা আয় দেবে।

কিন্তু হায়, বাজারে ঢুকেই দেখল আদ্ধেকটা বাজার জুড়ে খালি বাগদা আর বাগদা। মাছগুলো যুক্তি করে দুনিয়ার যত বাগদা ছিল সব জালে পড়েছে একসঙ্গে। পাইকারেরা দেড়টাকা দেড়-দেড় টাকা বলে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলছে। বাবুর দল গম্ভীর মুখে এক হাতে ছেঁড়া থলি নিয়ে আর এক হাতে গোঁফে তা' দিতে দিতে এ ঝুড়ি ও ঝুড়ি শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছেন। মাছ কিনবার নামটি নেই। নিশ্চয়ই পুলকিত চিত্তে ভাবছেন, এতটাই যখন দাম নেমেছ, তখন আরও একটু কি আর না নামবে।

অটবী অত চেঁচামেচি করতে পারে না। ডালাতে মাছ সাজিয়ে গোঁজ হয়ে বসে রইল। তবু তার মাছের চেহারাটা ভাল বলে দু'চার জন খদ্দের যে না ঝুঁকল এমন নয়। অধিকাংশেরই দর-দস্তুর করার মতলব। নেহাৎ যাদের তাড়া আছে তারাই অল্প-স্বল্প যা কিনছিল।

এক ভদ্রলোক, সিল্কের লুঙ্গি পরা, ফিণফিণে আদ্ধির পাঞ্জাবী গায়ে, বেশ মাংসল চেহারা, খানিকটা মাছ মাপালেন অটবীকে দিয়ে কিনবেন বলে। তিন পো'র বাটখারা দিয়েও মাছের দিকের পাল্লাটা ঝুঁকে রইল নিচের দিকে। অটবী বাড়তি মাছটা নামিয়ে নিচ্ছিল। ভদ্রলোক নিষেধ করলেন। অটবী কতটা বেশী গেল দেখে নিয়ে মাছটা ঢেলে দিল ভদ্রলোকের প্রসারিত ঝুলিতে।

'এক টাকা তিন আনা হয়েছে বাবু।'

ভদ্রলোক ধীরে-সুস্থে একটাকা দু' আনা বের করে দিলেন।

পয়সাটা হাতেই রেখে অটবী জানালো, 'আর এক আনা দিতে হবে বাবু।'

'আর এক আনা আর দেব না। ওটুকু ফাউ।'

'ফাউ-টাউ দিতে পারবনি বাবু। ল্যায্য ওজোন দিয়েছি, ল্যায্য দাম দেবেন।'

ভদ্রলোক এবার রেগে গেলেন।

'একটা আনা তুমি ছাড়তে পারো না বাপু? এক আনার জন্য মরে যাবে?'

তবু অটবীর সেই এক কথা, 'হ্যা বাবু, তাই। একটা আনাও ছাড়তে পারবনি।'

'তবে ফিরিয়ে নাও তোমার মাছ। যত সব ছোটলোক!'

অটবী নির্বিকার মুখে মাছটা ঢেলে রেখে পয়সাটা ফেরৎ দিল। তারপর বলল, 'মিছি মিছি যে এতটা খাটালেন তার দাম কে দেয়? আপনি দেবেন?'

যতখানি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ভদ্রলোক তাকালেন অটবীর দিকে, তারচেয়েও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অটবী তাকালো ভদ্রলোকের দিকে।

সামান্যই বিক্রি হল। বেলা ন'টা সাড়ে ন'টার সময়েও অটবীর ঝুড়ি ভর্তি মাছ। এমন সময় এক ঝুড়ি মাছ মাথায় করে হস্ত দস্ত হয়ে বাজারে এসে ঢুকল একটি মেয়ে। সেই মেয়েটি। মনসাপোতার ভেড়ীর কাছে রাত্রিবেলায় যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। হাসি-হাসি মুখখানায় ঘাম চিক্ চিক কোরছে। ঘামে লেপ্টে রয়েছে কয়েক গাছি উড়ো চুল।

অটবীদের সারিতেই তার থেকে তিন চারটে ঝুড়ির পরেই মেয়েটি মাছ নামাল। মাছ ডালায় তুলতে তুলতেই মেয়েটি চীৎকার করে বাজার মাথায় করল, 'লে লে বাবু বাগ্দা চিংড়ি। পাঁচ পাঁচ শিকি করে যাচ্ছে। লিলেম দরে যাচ্ছে লড়া-তাজা মাছ। বরফ ছাড়া মাছ যাচ্ছে মাত্তর পাঁচ পাঁচ শিকি দামে।'

অটবী কিন্তু দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছিল মেয়েটার মাছ মোটেই টাটকা নয়। অন্ততঃ দিন দুয়েকের বাসি হবেই। তবে চিংড়ি মাছ,—অভিজ্ঞ চোখ না হলে বঙ দেখে মাছ চিনতে পারবে না।

বাজারের ব্যাটাছেলেরা পর্যন্ত হার মানল মেয়েটার গলার কাছে। তার মিষ্টি চওড়া সুরেলা গলায় আকৃষ্ট হয়ে মাছির মত খদ্দেরের দল গিয়ে ভিড়ল চারপাশে। তা তো ভিড়বেই! সস্তার পচা মাল দেখলে মাছিরা গিয়ে ভাড় করেই থাকে।

অটবীর আর সহ্য হল না। ধমক দিয়ে উঠল, 'এই মাগী, দর নেইবে বাজার নষ্ট কচ্ছিস যে!'

জবাবে মেয়েটি উপস্থিত ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নোকটা কি

বলতেছে শুনছ গো বাবুমশায়রা? দাম কইমে দে' অন্যায়টা কি করলাম, বল দিনি? যে-আক্রার বাজার,—দুটো মাছ কেউ চোখে দেখে না। পারলে দর কইমে দেওয়া উচিৎ লয়? তবু একদিন গিন্নীরা দুঠো মাছ খেয়ে বাঁচুক। তোর এত চোখ টাটায় তো তুই চৌদ্দ আনা করে দে না। আমি কি ত্যাখন বাধা দিতে যাব? না কি বল্ছো বাবুমশায়রা, অন্যায্য কথা বলতেছি কিছু?'

বাবুরা শুধু তার কথায় সায়ই দিলেন না, ধমকিয়েও দিলেন অটবাকে। আর, যা স্বাভাবিক, তাদের সকলের ঝোলাতেই গিয়ে উঠল সেই মেয়েটার পচা মাছ।

আধ ঘণ্টায় মধ্যে সমস্ত বেচা-বিক্রি শেষ করে মেয়েটা বিড়ি ধরালো একটা। গুণের আর অন্ত নেই,—মেয়েটা বিড়িও খায়। অথচ এই সময়ের মধ্যে অটবীর বিক্রি হয়েছে তিন চার সেরের বেশী নয়। নিজের ঝুড়ির দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে রইল অটবী।

মেয়েটি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। নিজের শূন্য ঝুড়িটা অমনি ফেলে রেখে হঠাৎ চলে এল অটবীর কাছে। তার ঝুড়িটা টান দিয়ে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'সরো দিনি হাঁদারাম, আমি বেচে দিচ্ছি মাছকটা। অমন বেগুন-বেচা মুখ করে বসে থাকলে মাছ বিক্রি হয়? মাছ বিক্রির মুখ চাই আলেদা।'

অটবীকে মাছ বেচা শেখাতে এসেছে একটা পুঁচকে মেয়েমানুষ! ধৃষ্টতারও একটা সীমা থাকে, সেটা ছাড়িয়ে গেলে রাগ করাও শক্ত। অটবীরও রাগ হল বটে, কিন্তু কৌতূহলও হল। চুপ করে বসে দেখতে লাগল মেয়েটা কী করে। মাছের ঝুড়িটা গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, একটু আস্বস্তও হল।

ঠিক আগের মতই অল্প সময়ের মধ্যেই মেয়েটি হাঁক ডাক করে ভীড় জমিয়ে ফেলল। পাঁচ শিকা করে দরেই বেচতে লাগল মাছ! অটবী তাতেও বাধা দিল না; শেষ বাজারে এর চেয়ে বেশী দামে আর কে মাছ নিচ্ছে? বিক্রী শেষ হয়ে গেলে অটবী অবাক হয়ে দেখল, দেড় টাকা দরে বেচলে যা হতে পারত, মোট টাকার পরিমাণ তার চেয়ে কম হয়নি। মেয়েটি শুধু বিক্রিতেই ওস্তাদ নয়, হাত সাফাইতেও অটবীর গুরুগিরি করতে পারবে বেশ কিছুদিন।

অগত্যা অটবীকে মেয়েটির সংগে ভাব করতে হল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি ?'

'পৈরী। ঐ যে আকাশে উড়ে যায়, দেখনি ? সেই পৈরী।'

পরী অটবীর নামটাও জেনে নিল অভিনব কায়দায়।

বলল, 'তোমার নাম আমি জানি, তাই জিজ্ঞেস করলাম না।'

'জানো ! কি নাম বল তো ?'

'বলব ? আচ্ছা, তবে আগে বল তোমার নামের পেথম অক্ষরটা কি ?'

অটবী বলল।

'তা' পরের অক্ষরটা বল।'

অটবী তাও বলল।

পরী একেবারে নির্লজ্জ, জিজ্ঞেস করল, 'তারপরের টা ?'

'বা: ! তবে তো আমি সবই বলে দিলাম।'

'না, আর বলতে হবে হবেনিকো। শুধু তার পরের অক্ষরটা বল।'

অগত্যা অটবী বলল।

'এবার বলব তোমার নাম ? তোমার নাম অটবী।'—পরী এমন ভাব করে বলল যেন অনেক আঁক জোঁক করে বের করেছে নামটা। বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল।

এত বেশী কথা বলে মেয়েটা ! আর যত কথা বলে হাসে তার চেয়ে আরও বেশী !

উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা হিসাবে অটবী প্রস্তাব করল, 'চল না পৈরী, একটা দোকানে যাই। একটু জল-টল খাওয়া যাক। খিদে পেয়েছে তো ?'

'খিদে আবার পায় নি ?' বলে পরী পেটের কাপড় সরিয়ে মাংসপেশী ইচ্ছে করে সংকুচিত করে দেখিয়ে দিল খিদের পরিমাণটা।

'কিন্তু কী খাওয়াবে ? যা তা জিনিষ খাবনি কিন্তু তা বলে দিচ্ছি।'

তারপর চলল খাদ্য সম্বন্ধে গবেষণা। কী খেতে তার ভাল লাগে, তা বলল। কী কী খেতে অটবীর ভাল লাগে তা জিজ্ঞেস করল। অটবীর রুচির

সমালোচনা করল। কিন্তু এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে, তবু ওঠার আর নাম করে না।

শেষে অটবী বলল বিরক্ত হয়ে, 'কৈ গো! উঠছ না যে? যাবেনি?'

'কোথায়? দোকানে?'

পরী এবার আর-মোড়া- ভাঙল, তা না না না করল, শেষে বলেই ফেলল, 'বুঝেছ ভালমুনিষের পো, আজ না হয় থাক্‌গে। ঘরে যে বসে আছে সে তোমার চেয়েও মেজাজী। দেরী করে ফিরলে পেট ফেইড়ে খাবার বের করে ছাড়বে।'

'খুব বকে নাকি তোমার বর?'

'বকেও, মারেও!' তারপর আবার হাসতে হাসতে বলল পরী, 'তবে মোকে মেরে আর কী করবে বল? মোর হাড্ডি যা শক্ত!'

এত বেশী যারা কথা বলে তাদের কি আর কথার মাত্রা থাকে? কোন্‌ কথা যে পরের কাছে বলতে নেই তাও খেয়াল নেই মেয়েটার!

কিন্তু মেয়েটা তবু অদ্ভুত, আশ্চর্য। কোন কিছুই দাগ কাটে না মেয়েটার মনে। প্রবল হাসির স্রোতে সব দাগ ধুয়ে মুছে যায়। বকলেও দাগ কাটে না, মারলেও দাগ কাটে না, হয়তো বা না- খেয়ে থাকলেও দাগ কাটে না।

কিছুতেই কি দাগ কাটা যায় না এ মেয়েটার মনে?

মেয়ে মানুষের থেকে সাহায্য গ্রহণ করার ফলে সহকর্মী পাইকারদের কাছে অটবীকে বড় বে-ইজ্জত হতে হল। তারা বলল, মেয়েমানুষ পালন করে শিশুকে। অটবী তবে স্বীকার করুক, সে চেহারাতেই শুধু ধারী মরদ, আসলে সে শিশু। প্রতিবাদ করতে গিয়ে অটবী দেখল, যে-কথা সে নিজে বিশ্বাস করে না, তাই সে সজোরে প্রচার কোরছে। সে প্রতিপন্ন করতে চাইছে, পুরুষের সারা জীবনই মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণে কাটে; শৈশবে মায়ের, যৌবনে বৌ-এর এবং বার্ধক্যে মেয়ের।

না, আত্ম-সম্মান আর রইল না দেখা যাচ্ছে এত বড় একটা জোয়ান পিলে-চমকানো মরদ অটবীর! যে-অটবীকে স্বয়ং জমিদার পর্যন্ত ভয় করেন, সে হার মানল একটা পুঁচকে মেয়ের কাছে!

তবু অটবী নিজের মনকে বোঝালো, গড়িয়া বা যাদবপুরের বাজার সস্তার বাজার, গরীব লোকের বাজার ; আর গড়িয়াহাট মাগগি বাজার, বড় লোকের বাজার। কাজেই কারবার করতে হলে গড়িয়াহাট ছাড়া যায় না। তেমনি পরী অনায়াসে বুঝতে পারল ঢাকুরিয়ার বাজারটা, এতকাল সে যেখানে যাতায়াত করেছে, নিতান্তই ছোট। এখন সে ক্রমশঃ বড় কারবারী হচ্ছে, বড় বাজারেই যাওয়া দরকার এখন তার পক্ষে। কাজেই পরীর পক্ষেও নিয়মিত গড়িয়াহাটার বাজারে আসা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

কাজেই অটবী আর পরীর প্রথম সাক্ষাতের দুর্ঘটনাটা ক্রমশঃ নিত্য নৈমত্তিক ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেল।

প্রায় রোজই পরীর নিজের মাছ বিক্রি যখন শেষ হয়ে যায় তখনো অটবীর ঝুড়িতে মাছ ভর্তি থাকে। পরী আর কী করে,—একদিন মানুষটাকে সাহায্য দিযে সে তো এখন চোরের দায়ে ধরা পড়েছে। এখন সাহায্য দিতে না গেলেই বলবে যে মেয়েটার দেমাক বেড়েছে। কাজেই যেতে হয় তাকে ; অটবীর ঝুড়িটা টেনে নিয়ে বসতে হয় বিক্রি করতে। চোখা চোখা টিপ্পনি কাটতে সে অবিশ্যি ছাড়ে না। এই আদান-প্রদানের কারবারে সেইটুকুই যা তার লাভ।

হযতো অটবী বলে, 'থাকগে পৈরী আজকে আর তোমার দরকার নেই।'

অমনি পরী জবাব দেবে, 'ঐজন্যিই তো বসে আছ বাবু! কেন আর মিছিমিছি ভালমনিষ সাজা!' তারপরেই বলবে, 'জানো, শাস্তরে আছে, যাদের গতর যত ভারী, তাদের মগজ তত হাল্কা।'

অটবীও ছাড়ে না, জবাব দেয়, 'শাস্তরে এও আছে যে বিধেতা ছিষ্টি করার সময় ভুল করে মেয়েনোকের মগজটা এখেছিলেন তার চোপার নিচে।'

'কার মগজ কোথায় আছে তার পেমাণ তো দেখাই যাচ্ছে।' পরী বলে, আর পরীর কথায় সায় দিয়ে উপস্থিত সবাই হেসে ওঠে।

পরী অটবীর সব কিছুতেই দোষ ধরে। তার চাকণের, তার পালা-পোড়েণের, তার ডালায় মাছ সাজানোর কায়দার। এমনকি অটবীর চেহারাটাও পরীর পছন্দ নয়।

'তোমার মুখখানা এত গোল কেন গা। ঠিক যেন ভাতের হাঁড়ির মুখ।'

'চুলগুলো কদমছাঁটা করেছো কেন ? সাধু টাধুর চেলাগিরি কর নাকিগো ? গাঁজা-টাজা খাও ?'

'বুকের নোমগুলো কামিয়ে ফেললেই পারো ? লোকে জানোয়ার-টানোয়ার বলে ভুল করতে পারে তো !' ইত্যাদি।

লঘু হাস্য-পরিহাস অটবীর বড় আসে না। মানুষটা সে কাঠ-খোট্টা ! তার হাসি ঠোঁটের সীমা পেরোয় না বলে গাঁয়ে দুর্ণাম আছে। সে হাসির কথা বলতে গেলেও তাতে এত ধার থাকে যে লোকের গায়ে ছাঁকা লাগে। কিন্তু পরীর সংগে অনেক সময় সে লঘু পরিহাসে যোগ দেয়। এমন-কি হাসে দাঁত বের করে ঠোঁট বিস্ফারিত করে। না, তাই বলে মেয়েটির সংস্পর্শে এসে অটবীর স্বভাব যে বদলাচ্ছে, তা নয়। এসব সে করে শুধু মেয়েটিকে একটু খুশী রাখার জন্য। তার জন্য এত খাটছে, শুধু তারই প্রতিদান হিসাবে। এসব মেয়ে তো হাসি-মস্করা ছাড়া আর কিছু বুঝবে না।

কিন্তু ঠাট্টা ইয়ারকি করতে করতেও এক একদিন অটবী হুল ফুটায়।

'এত বেশী হাসিস কেন গা মাগী ? পেটের মধ্যে হাসির ফোয়ারা আছে ? একটু লাজ নেই, সরম নেই,—মাগী, তোর স্বভাব-টভাব ভাল তো ? ভাতার বলে না কিছু তোকে ? না তারও মাথায় উঠে বসে আছিস ?'

আবার বলে, 'আবার একখানা বেলাউজ কেনা হয়েছে,—মাগীর সখ দেখে আর বাঁচবনি ! তা শাড়ীর নিচে পরে,—কী যেন বলে,—তাও একটা কিনে ফেল্ !'

জবাবে পরী অবিশ্যি দশ কথা শুনিয়ে দেয়, কিন্তু রাগ করে না। ঐ একটা আশ্চর্য গুণ মেয়েটার।

ওদের এত ঘনিষ্টতা এখন পর্যন্ত শুধু বাজারের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একবার বাইরে বেরুলে কারও কথা নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। সেই জন্যই ওদের এত মেশামেশিতেও তেমন কোন বক্র সমালোচনার উদ্রেক হয়নি।

পরী অটবীকে অনুরোধ করেছিল এক সঙ্গে কস্‌বার পাইকারী বাজার থেকে মাছ কিনতে। সে সেখান থেকেই মাচ কেনে ভোর পাঁচটায় এসে। দু' জনে এক সঙ্গে গেলে হয়তো দেখে শুনে কেনা কাটার সুবিধা হতে পারে। অটবী

তখনকার মত রাজীও হয়েছিল এ প্রস্তাবে ; কিন্তু সন্ধ্যা পার তার হলেই মন ক্যানিং-এর দিকে টানতে থাকে। দু জনের আয়-ব্যায়ের তুলনামূলক হিসাব করে দেখেছে যে ক্যানিং থেকে মাছ আনে বলে তার যে খুব একটা বাড়তি লাভ হয়, তা নয়। পাইকারের সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছে যে মনে হয় ঝুড়ি পিছু পাঁচজন করে পাইকার আসে, প্রতিযোগিতায় দাম যায় বেড়ে,—পড়তা মত মাছ কেনা যায় না। তেমনি বিশ্বাসঘাতক এই কোলকাতার বাজার,—কালকে বাজার কেমন হবে তা আজকে অনুমান করা যায় মা। আগেকার দিনে হাত সাফাইটা ছিল বাড়তি মুনাফা। এখন হাত সাফাইটাই একমাত্র লাভে দাঁড়িয়েছে, বা লোকশান বাঁচানোর একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অত কষ্ট করে ক্যানিং গিয়ে যদিই বা কোন কোনদিন কিছু বাড়তি লাভ থাকে, তো তারও পরিমাণ এমন নয় যাতে ক্যানিং যাওয়াটা সমর্থন করা চলে। কোন কোনদিন এমন কি ক্যানিং থেকে আনার জন্যই লোকশানের পরিমাণটা বেড়ে যায়। তবু অটবী ক্যানিং-এর মোহ ছাড়তে পারে না। জোয়ান বয়স, সমর্থ শরীর, না হয় একটু কষ্ট করলই অটবা। কানিং থেকে মাছের কারবার করে কত লোক ধনী হয়ে গিয়েছে। কার ভাগ্যে কী আছে তা তো বলা যায় না।

অটবী ভেবেছিল কস্‌বার বাজারে না যাওয়াতে পরী তার উপর রাগ করবে। পরী কিন্তু রাগ করেনি, বরং তার হাবভাবে মনে হয়েছে, এইটেই সে মনে মনে আশা করেছিল। মেয়ে মানুষ তো, চট্‌ করে কারও সাহায্য নিতে ভয় পায়।

একটা ব্যাপারে অটবী কিন্তু যেমন বিস্মিত হল, তেমনি বিরক্তও হল। তিন চারদিন চেষ্টা করেও পরীকে সে কিছুতেই খাওয়াতে পারেনি। দু' দুদিন দোকানে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। টাকা পাঁচশিকের করে দু' প্লেট মিষ্টির অর্ডার পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটা না একটা ছুতো করে পরী ঠিক কেটে পড়বেই। একদিন একটা বেনেতী জিনিষের নাম করে বলল, মনে থাকতে থাকতে কিনে নিয়ে আসবে ; যাবে আর আসবে। আর একদিন হঠাৎ একেবারে চোখ-মুখ শুকনো করে বলে বসল, তার কোন এক সংগীর কাছে তার টাকা

রয়েছে, নিয়ে নেওয়া হয়নি। বলেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল,—মেয়েটা যদি চলে যায় তাহলে নাকি তার ভারী অসুবিধা হবে। বলাবাহুল্য; 'এক্ষুনি এসব' যদিও বলে গিয়েছিল, সে এক্ষুনিটা আজ অবধি আসেনি।

অটবী অবিশ্যি পরীকে আজকাল মাঝে মাঝে ধমকি-ধামকি দেয়। পরদিন পরী বাজারে আসতেই কড়া গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিরে মাগা,—কাল যে পেইলে গেলি শেষ তক? ব্যাপারটা কি? পয়সার দেমাক হয়েছে বুঝি খুব? অ্যা? ইদিগে তিন টাকার মিষ্টি খেতে হল একা একা।'

পরী এতটুকু অপ্রতিভ না হয়ে, এতটুকু আমতা আমতা না করে বলল, 'তা আমার কি দোষ বল? আস্তায় নাবতেই দুটো তিনটে গাঁয়ের মেয়েছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ছাড়লনি, ধরে নে' গেল। তা ছাড়া বুঝে দেখ, দু কোশ পথ সেই একা একা যেতে হত তো। সঙ্গী জুটে গেল দৈবাৎ, তা কি ছাড়া যায়? তুমি তো আর মোকে এগিয়ে দে' এসতে যেতে না! তাতে হয়েছে আর কি,— অত বেজার হচ্ছ কি জন্যে বাবু? মিষ্টি তো আর পেইলে যাচ্ছেনি দোকান থে'। পাঁচটাকার মিষ্টির কমে কিন্তু আমার পেট ভরবেনি, বলে রাখলাম আগেই।'

মিছে কথাগুলো কেমন অনর্গল বলে চলেছে মেয়েটা দেখ। চোখের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না। কত গুণ যে আছে এই মেয়েটার!

আচ্ছা এই মেয়েটার কি একটাও গুণ নেই?—অটবী, অবাক হয়ে ভাবতে চেষ্টা করল। মেয়েটার মধ্যে একটাও গুণ আছে কেউ যদি দেখিয়ে দিতে পারে তবে অটবী, সোনার পাতে লিখিয়ে বাঁধিয়ে রাখবে।

সাত

পরী অল্পবয়সী বৌ,—জোর বছর কুড়ি বয়স হবে। কিন্তু তার এইটুকু জীবনে যে ইতিহাস আছে, তা নিতান্ত নগণ্য নয়। তার হাস্যমুখর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখে সে ইতিহাস কোন দাগ রেখে যায়নি। তার মনেও কোন রেখাপাত করতে পেরেছে কিনা তা সেই জানে।

দু' চারটে গ্রামের মধ্যে ডাক-নামের সুন্দরী ছিল বলে বাপ মার বিশেষ দৃষ্টি ছিল তার উপর। তাদের অনেক প্রত্যাশাও ছিল। ঘুমে-বোজা চোখ নিয়েও পরী কত রাত্রে অনুভব করেছে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমের প্রতীক্ষার ফাঁকে তারা যে আলোচনা কোরছে তার কেন্দ্র সে নিজে। পরীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল সব ব্যাপারেই, খাওয়ার, শোওয়ার, পরিধানের। তাকে রদ্দুরে যেতে দেওয়া হত না বা আগুনের আঁচের সামনে যেতে দেওয়া হত না রঙ নষ্ট হবে বলে। বলতে গেলে কাজ কর্ম তাকে কিছুই করতে দেওয়া হত না। মাঝে মাঝে তার গায়ে মাখানো হত হলুদ বাটা; মাঝে মাঝে নারকেল-বাটা মুখে মেখে বসে থেকে ভাই বোন বা বান্ধবীদের ঈর্ষা-প্রসূত কৌতুকবাণ সহ্য করতে হত। তার আরও দুই ভাই এবং দুই বোন ছিল। তারা যে তাকে বিশেষ ঈর্ষা করত তা নয়। তারা জানত, সে আলাদা। মাঝে মাঝে নতুন কী-ভাবে পরীর সৌন্দর্য-বৃদ্ধি করা যায় এ সমস্যায় তারাও সাহায্য করত বাপ-মাকে। পরী ছিল এক মূল্যবান খেলার সামগ্রী, তাকে নিয়ে সেই খেলার আয়োজনে বাপ মা ভাই বোন সবাই ছিল সমান অংশীদার।

একটি মাঝারী গোছের চাষী পরিবার হিসাবে পরীদের অবস্থা খুব যে অস্বচ্ছল ছিল তা নয়। অন্ততঃ পরীর এখন সেইরকমেরই অনুমান। তাদের অবস্থাটা যে ঠিক ঠিক কি পর্যায়ের ছিল, শিশু পরীর পক্ষে সেদিন তা জানা সম্ভব ছিল না; আর আজকে সে কথা জানতে হয় শুধু লোকের মুখে শুনে। ছোটবেলার কথা শুধু এইটুকু মনে আছে যে বছরের কোন সময় বাড়ীর উঠান নতুন ফসলে ভরে উঠত, রান্না ঘরে চলত খাবার তৈরীর প্রচুর আয়োজন।

আবার আর এক সময়ে বাবা-কাকারা অলস অপরাহ্ণে ম্লান মুখে বসে তামাক টানতেন; সেদিন রান্নাঘরের পাট বড় সামান্য, পূরো পেট শুধু ভাতের আয়োজনটাও দুর্লভ। সারা বছর ধরে রান্না ঘরের এই যে ঋতু-বদলের পালা চলত তার কারণ সেদিন পরী বুঝতে পারত না। বছরের সময়ের অত অপর্যাপ্ত ধান পাট কলাই কোথায় যে শূন্যে মিলিয়ে যেত তা তার কাছে ছিল রহস্যময়। আজকে পরী সব বুঝতে পারে। কিন্তু সে-জীবনটা আজ দূরে, কত দূরে চলে গিয়েছে।

বারো তেরো বছর বয়স থেকে পরীর বিয়ের চেষ্টা আরম্ভ হয়, কেন যে এত বেশী বয়স পর্যন্ত তাকে বিয়ে না দিয়ে রাখা হয়েছিল তার কারণ সে তখনই জানত। মা-বাবার গোপন পরামর্শ শুনেছিল আড়ি পেতে। একটা বিশেষ বয়সে পা দিলেই বর্ষাকালের চারা গাছের মতই তার দেহ নতুন পাতায় ভরে উঠবে এবং বিয়ের বাজারে তখন তার দাম অনেক বেড়ে যাবে,—বাবা-মার এইটেই ছিল প্রত্যাশা। বর্ষাকালের উপমাটা বাবা প্রায়ই ব্যবহার করতেন। আর বাস্তবিক হয়েছিল তাই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে তার শরীর হঠাৎ অনেক বড় আর ভারী হয়ে গেল : ফরসা রঙে এবার যেন আগুন ধরল। বাবা এমন গর্বভরে তাকিয়ে থাকতেন যে লজ্জা করত। তারপর সুরু হল বিয়ের চেষ্টা, অর্থাৎ দর-কশাকশি।

বাবা ধনুকভাঙা পণ করে বসলেন, পাঁচশো টাকা না হয়ে এমন মেয়েকে বিয়ের আসরে নামাবেন না। কিন্তু তিনি যেমন আশা করেছিলেন, ভবিষ্যৎ বরের দল তেমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ল না তাদের বাড়ীর উপর। তার জন্মসংক্রান্ত গুজবটার জন্য এবং পণের কথা শুনে সবাই পিছিয়ে যেতে লাগল। বাবা তাকে বিয়ে দিয়ে টাকা পাবেন এটা ভাবতে পরীর তখন ভালই লাগত। সেই টাকায় বাবার সম্পত্তিতে আরও দু' চার বিঘা জমি যোগ হলে তাতে শ্বশুড়বাড়ী যাওয়ার পর তার বিশেষ লাভ হবে না তা তখন তার মনেও হত না। বরং যারা এই পণ দিতে অস্বীকৃত হয়ে পিছিয়ে যেত তাদের উপর ভীষণ রাগ হত পরীর। শুধু এই জন্যই তাদের বর হিসবে অযোগ্য বলে মনে হত। তার

মত একটী সুন্দরী মেয়ের জন্মদাতা হিসাব তার বাবা-মার এ টাকাটা ন্যায্য প্রাপ্য বলে সেদিন সে বিশ্বাস কতর।

এমনি করে অনেক বিলম্বে, যখন তার বয়স পনেরো, তখন তার বর জুটল। বিয়ের আগে বর আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে দেখতে আসেনি কাজেই তাকে সে প্রথম দেখে একেবারে বিয়ের আসরে। প্রায় বাবার বয়সী সেই লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড মানুষটা তার রোমশ বলিষ্ঠ মোটা ডানহাতখানা দিয়ে যখন তার ভীরু নরম বাঁ হাতখানা ধরেছিল তখন কী যে ভয় হয়েছিল! সেই ভয়টা হয়ে রইল পরীর বরাবরের সঙ্গী; ভাঙল শুধু সেদিন যেদিন সেই প্রকাণ্ড লোকটার প্রকাণ্ড বাড়ীটার দরজা পেরিয়ে সে চিরদিনের মত বেরিয়ে এসেছিল।

স্বামী মথুরানাথের বাড়ী দেখে পরী অবাক হল। কোন কৃষকের এত বড় বাড়ী এর আগে আর তার চোখে পড়েনি। বাড়ীটার দুই মহাল। অন্দর মহলে পাঁচ ছ' খানা বড় বড় টিনের ঘর। এক পাশ বরাবর জুড়ে রয়েছে একটি মাত্র টিনের ছাপড়া, তার একটা অংশ গোয়াল এবং অন্য অংশটা ঘেরা জায়গা, কুঁচোনো খড়, ভুঁসি ইত্যাদি রাখবার জায়গা। গোয়ালে দশ বারোটা দুধাল গাই। বাইরের মহালেও দু' তিনখানা ঘর এবং চার পাঁচখানা ধানের মস্ত মস্ত মাড়াই। তা ছাড়া দু' তিনটে পুকুর, আম বাগান, কলা বাগান, তরিতরকারীর বাগান ইত্যাদি তো আছেই।

বড় বৌ, অর্থাৎ পরীর দিদি, মথুরানাথের প্রথমা স্ত্রী, তাকে বরণ করে নিল। চারদিকে গোল করে মাটীর প্রদীপ সাজানো ডালাটা তার কপালে ছুঁইয়ে দিল। চারদিক থেকে মেয়েরা উলু উলু দিয়ে উঠল। চিবুক ধরে মুখখানা তুলে দেখে বড় বৌ বলল, 'বাঃ, খাসা মুখখানা!'

ভীড়ের মধ্যে থেকে আর একটি মেয়ে বলল, 'মাকাল ফলের মত নয় তো ভাই?'

আর একজন বলল, 'একবার পোয়াতী হতে দে না! জলের রূপ জলে ধুয়ে যাবে দেখিস।'

পরীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে বড় বৌ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল,

'ভাল করে দেখে শুনে লাও ভাই। এ বাড়ী-ঘর সবই তোমার। আমরা আছি ঝি-দাসীর দল, যা হুকুম করবে তাই তামিল করব।'

পরী একবার আড় চোখে তাকিয়ে দেখল দিদিকে। দুর্গা প্রতিমার অসুরটিকে মেয়েমানুষ বলে কল্পনা করলে যা হয়, তার এ দিদিটি ঠিক তাই। চওড়া মুখখানার হা-টা আরও চওড়া। অনবরত তামাক ব্যবহারের ফলে দাঁতগুলো কালো-কালো। তিরিশ বছরের এতবড় প্রকাণ্ড একটা মেয়ে মানুষ, যে অনায়াসে পরীকে হাত দিয়ে টিপে মেরে ফেলতে পারে, যদি এমন কথা বলে তো পরীর মত মেয়ের কাছে তা খুব নির্ভরতার আশ্বাস দেয় কি?

কথা বলার পরে দিদি আবার একটু হেসেছিল। সে-হাসির অর্থ পরী কোনদিনই বুঝতে পারবে না।

প্রথম দিনই পরী জানতে পারল, এই দিদিটি এবং তার মাঝখানে আরও দু'জন বৌ এ-বাড়ীতে এসেছিল। একজন মারা গিয়েছে, আর একজনকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বারো চৌদ্দটি নানা সাইজের ছেলে মেয়ে বাড়ীর চারদিকে ঘুরছে, তারা এই তিন বৌ-এর মারফৎই পৃথিবীতে এসেছে। তাদের বেশীর ভাগই দিগম্বর। সামান্য কৃষাণরা বা আশ্রিত বিধবারাও তাদের চড়টা ধমকটা দিচ্ছে। এ-বাড়ীর বড় কর্তার ছেলে মেয়ে বলে তাদের মনে করা শক্ত। মাত্র গুটি তিনেকের গায়ে প্যাণ্ট জামা ফ্রক ইত্যাদি আছে। এরা বড় দিদির ছেলে-মেয়ে, পাঠশালাতেও নাকি যায়। এরা আর ওরা যে একই রকমের ভাই-বোন, একই বাপের সন্তান, বলে না দিলে তা অনুমান করা যায় না।

সেই প্রথম দিনই আরও একটা জিনিষ পরীকে কম বিস্মিত করেনি। একজন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের জোয়ান লোক খুব দাপটের সংগে বাড়ীর মধ্যে কৃষাণদের দিয়ে কাজ করাচ্ছিল। কাজের বাড়ী। ঘরগুলো একটু আধটু সংস্কার করা, কাঠ কেটে লাকড়ী বের করা, ইত্যাদি নানারকম কাজ তারা কোরছিল। সেই লোকটা ওদের যেমন খাটাচ্ছিল, তেমনি হাতে হাতে একখানা কোদাল নিয়ে নিজেও উঠোনের থেকে ঘাস সাফ কোরছিল। অন্য কৃষাণদের মতই একখানা খুব খাটো ধুতি মালকোচা মেরে পরেছে সে। পরী

ভেবেছিল, লোকটা বোধ হয় সর্দার কৃষাণ-জাতীয় কেউ হবে। একসময় মথুরানাথ ভিতরে এসে তাকে 'হারামজাদা', 'শুয়ার', কুকুর দিয়ে খাওয়াব', ইত্যাদি বাক্যে সম্ভাষণ করে তার কী যেন একটা কাজের ত্রুটি বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

পরে পরী জানতে পারল, এই লোকটি তার স্বামীর সর্বকনিষ্ঠ ভাই, অর্থাৎ এই বাড়ী-ঘর জমি-সম্পত্তির একজন শরিক। ভাই যে শরিকও, চাষীর মেয়ে পরী তা ভাল করেই জানে। অথচ তার স্বামীর গায়ে জামা, পরণে পুরো হাতি ধুতি, পায়ে জুতো। কিন্তু এ-লোকটির সে সবের কিছুই নেই। এ-লোকটি সারাদিন কাজ কোরছে, ঘাম ঝড়ছে সারা গা দিয়ে ; অথচ তার স্বামী হুকো হাতে করে শুধু সর্দারি করে বেড়াচ্ছে। পরী আরও শুনল, তার স্বামী চারবার বিয়ে করেছে, এ লোকটির কিন্তু পয়সার অভাবে এখন পর্যন্ত একবারও বিয়ে হয়নি।

দাদার ধমক শুনে লোকটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। আবার দাদা চলে যেতেই কৃষাণদের উপর হম্বী তম্বী করে জানিয়ে দিল তার দাপটও নেহাৎ কম নয়।

পরী বুঝতে পারল, এরাও চাষী বটে ; কিন্তু আর এক ধরণের, তার বাপ-কাকা-ভাইদের মত নয়।

দেখে শুনে কী যে ভয় করতে লাগল কচি মেয়ে পরীর ! মনে হতে লাগল, হঠাৎ যেন তার জন্ম হল নতুন এক পৃথিবীতে। এখানকার রীতি-নীতি চাল-চলন হাল-চাল কিছুই তার জানা নয়। এখানকার মানুষগুলো তার কাছে অপরিচিত। শুধু নতুন মুখ বলেই নয়, আরও গভীরতর অর্থে। নতুন জন্ম হলে একজন নির্ভর করার মত বন্ধু পাওয়া যায়,—মা। কিন্তু এখানে বন্ধু বলা যায় এমন কাউকে যে পাওয়া যাবে এমন মনে হল না।

রাত্রি বেলা নির্দিষ্ট ঘরে পালঙ্কের উপর তৈরী বিছানার উপর বসে বসে ভয়ে তার বুকটা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যেতে লাগল। কর্তার জন্য নির্দিষ্ট এ বাড়ীর একমাত্র পালঙ্কের বিছানায় শোবে তার মত একজন হঠাৎ-আসা সামান্য মেয়ে ? যে মহিষাসুর দিদিটি অপ্রতিহত শক্তিতে এ-বাড়ীর অন্দর-

মহলকে শাসন কোরছে তাকে স্থানচ্যুত করে? পরী কিছুতেই ভাবতে পারল না এটা তার পক্ষে উচিত কাজ হচ্ছে। অথচ সেই দিদি স্বয়ং যে ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছে, তার বিরুদ্ধে কিছু বলবে সেটাও অসম্ভব ব্যাপার।

একটু পরেই সেই প্রকাণ্ড লোকটা আসবে এবং শোবে তার পাশে। ভাবতেও বুকটা কেঁপে উঠছে পরীর। সারাদিন এই মানুষটাকে সে এ-বাড়ীতে যত্র-তত্র ত্রাস সৃষ্টি করে বেড়াতে দেখেছে। বাড়ীর প্রতিটি মানুষ তাকে যমের মত ভয় করে। অন্য লোকেরা তবু তো থাকে এ লোকটার থেকে অনেকটা দূরে দূরে। লোকটা নিতান্ত কাছে এসে পড়লেও চারদিকে থাকে খোলা পৃথিবী; দরকার হলেই পালিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু দরকার হলেও পরী পালিয়ে যাবে কী করে? এ পালঙ্কের বিছানার দু পাশে রেলিং। রেলিং টপকে যদি বা নীচে নামা যায় তো লোহার ঘরের পাকা সেগুন কাঠের দরজার শক্ত খিল সে খুলবে কী করে?

যে-লোকটাকে পরী যত ভয় পাচ্ছিল, সেই মথুরানাথের ব্যবহারটা কিন্তু হল তার প্রত্যাশার ঠিক বিপরীত। খাটো করে কাপড় পরে পান চিবুতে চিবুতে হুকো হাতে মথুর এসে ঢুকল ঘরে। মুখে হাসি আর ধরে না। পা-ভর্তি ধূলো নিয়েই অনায়াসে উঠে বসল বিছানার উপরে। ভক্ ভক্ করে তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জড়োসড়ো হয়ে বসা পরীর দিকে। তারপর সুরু করল প্রথম দাম্পত্য আলাপ।

'তোমার নাম কি?'

এত সহজ প্রশ্নেরও কিন্তু পরী তক্ষুণি জবাব দিতে পারল না। ভয় হতে লাগল, গলা দিয়ে স্বর যদি না বের হয়। আবার তার চেয়েও বেশী ভয় হতে লাগল, কথা না বলায় দোষ ধরে লোকটা যদি রাগ করে বসে।

মথুর কিন্তু তেমনি মোলায়েম স্বরে তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল।

পরী এবার আস্তে আস্তে নিজের নামটা উচ্চারণ করল। নিজের কানেই নিজের নাম শুনে অবাক হল, আশ্বস্তও হল।

'এ বাড়ীটা তোমার কেমন নাগ্‌তেছে পরী', মথুরের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

প্রশ্নটা সাংঘতিক। কিন্তু সহজাত মেয়েলী বুদ্ধির থেকে পরী জানত মথুর এর একটা মাত্র উত্তরই প্রত্যাশা করে।

পরী বলল, 'ভালো।'

'ভালো? তোমার বাপের বাড়ার চেয়েও?'

পরী ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। মথুরানাথ আবার প্রশ্ন করল, 'কি হিসেবে ভাল? কোন্ দিক দিয়ে ভাল? না—না, পরী, বলতেই হবে।'

অগত্যা পরী জবাব দিল, 'এ-বাড়ী কত বড়।'

মথুর যেন এ-জবাবে খুসী হল না।

'শুধু তাই? আর আমার কথা বললে না! আমি যে এ-বাড়ী নিজের হাতে বাইনেছি। যা-কিছু দেখ্তেছ, সব আমার। মানে, সব তোমার। ঐ যে দিদিকে দেখেছ, ও তোমার চাকরাণী হয়ে থাকবে। ভালো কথা, বড় বৌ তোমার কোন অযত্ন করে নি তো আজকে? কিছু করে তো মোকে বলবে। জুতিয়ে ভুতছাড়া করে দোব বজ্জাত মাগীর।'

আর তিন চারদিন আগেও সেই বজ্জাত মাগী মথুরের পাশে শুয়েছিল। তখন মথুর কী কথা বলেছিল তাকে?

কত সন্তর্পণে যে মথুর পরীর দেহটা স্পর্শ করল। অত বড় মানুষটা, অনায়াসে শুধু দেহের ভারে পরীকে চ্যাপ্টা করে দিতে পারত। কিন্তু সে তার কিছুই করল না। অত্যন্ত আস্তে আস্তে পরীর বাহুখানা, একবার টিপে দেখল। আলগোছে পরীর মাথাটা ধরে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে এসে পরীর চুলের সুগন্ধি তেলের ঘ্রাণটা একবার শুঁকে দেখল। পরীর পরণের সিল্কের শাড়ীখানার উপর বারবার হাত বুলাতে লাগল, কিন্তু দেখ্‌তে না পেলে পরী বোধ হয় তা টেরও পেত না। যেন একটা খুব মূল্যবান আসবাব অত্যন্ত সন্তর্পণে পরীক্ষা কোরছে মথুর। একটু অসাবধান হলেই পড়ে ভেঙে যাবে খানখান হয়ে।

কিন্তু কেন মানুষটা পরীর উপর এতটুকু জোর-জুলুম করল না? পরীর দোষ ধরে সে কেন বকাবকি করল না? যেমন সারাদিন ধরে করেছে এ বাড়ীর

আর সবাইকে ? কেন পরীর হাত ধরে এমন জোরে চেপে ধরল না যাতে রক্ত জমে যায় ? পরীর বুকের উপর এমন চাপ দিল না যাতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় ?

তারপর দিন এগিয়ে চলতে লাগল। নতুন বৌ ক্রমশঃ পুরোণো হয়ে আসতে লাগল। নতুন বৌ দেখতে আসার ভীড় কমে এল। কিন্তু পরীর জীবন-যাত্রা এগিয়ে চলল সেই প্রথম দিনের ধারাতেই। সেই 'বজ্জাত মাগী' দিদির থেকে শুরু করে বাড়ীর মেয়ে পুরুষ ছোট-বড় প্রতিটি বাসিন্দাই তাকে সমীহ করতে লাগল, আদরে-যত্নে ডুবিয়ে রাখতে চাইল তাকে। সে হেঁটে গেলেও যেন তাদের গায়ে ব্যথা লাগে। বৌ-মানুষ এটা সেটা ঘর- সংসারের কাজ করবে, সে তো দূরের কথা; নিতান্ত নিজের ব্যক্তিগত কাজ করতে গেলেও সবাই হা হা করে ছুটে আসে। পরী যদি নিজেই কাজ করবে, তবে তারা এতগুলো লোক আছে কেন ? কাজ করার জন্য তো তারা সব সময়েই তৈরী, শুধু বদলে তারা পরীরাণীর সুদৃষ্টি চায়।

এক গরীব চাষীর দুর্বল ভীরু মেয়ের সুদৃষ্টি পেলে কৃতার্থ হবে এক প্রকাণ্ড বাড়ীর জাঁদরেল মেয়ে পুরুষগুলো ? ভাবতে গেলে এক এক সময় হাসি পায় পরীর। বাপের বাড়ী আসতে কয়েকবার পূজা-পার্বণের সময় তাকে জমিদার-বাড়ী যেতে হয়েছিল বেগার খাটতে। তখন জমিদারের পুত্র-কন্যাদের যেমন আদরে যত্নে রাখতে তারা চেষ্টা করত, ঠিক তেমনি আদর যত্ন জুটছে পরীর ভাগ্যে। এও যদি আশ্চর্য ঘটনা না হয় তবে আর আশ্চর্য ঘটনা কি ?

জমিদার-কন্যা আর তার মধ্যে পার্থক্যটা কি তা পরী বুঝতে পারে। সে বোকা নয়। জমিদার কন্যা সকলের আদর পেয়েছে স্বাভাবিক জন্মের অধিকারে। জন্ম যাদের সম্মান দিয়েছে, তাদের সম্মান দেখাতে পারলে তারা চাষী সামান্যিরা বাস্তবিক কৃতার্থ বোধ করত। পরীর কিন্তু জন্মগত কোন অধিকার নেই, সামান্য মানুষের ঘরে তার জন্ম। পরীকে যে আদর দেওয়া হচ্ছে তা তার ন্যায্য প্রাপ্য নয়, এবং যারা দিচ্ছে তারাও তা জানে। তারা যে জানে তা বুঝতে পারা যায় তাদের আদর করার আড়ালে যে ঔদ্ধত্যটা লুকিয়ে আছে তা দেখে। পরী সেই ঔদ্ধত্যটা দেখাতে পায় মাঝে মাঝে। আর তখুনি তার মনে পড়ে, তার এই রাণী-গিরি নির্ভর কোরছে একটি অত্যন্ত

পরাক্রমশালী পুরুষের উচানো তর্জনীর উপর। সেই তর্জনী যদি কোন সময় লুটিয়ে যায়, তবে সেই রাণীগিরি এমনি করে মিলিয়ে যাবে যে কোনদিন তা ছিল বলেও বুঝতে পারা যাবে না।

তার জীবনে আরও একটা মানুষের হস্তক্ষেপও পরী টের পায়। তাকে যে একেবারেই কোন কাজ করতে দেওয়া হয় না, বাড়ীর এমন-কি যাদের সে সম্পর্কে মা তাদের সংগেও মিশতে দেওয়া হয় না, এর পিছনে পুরুষের নয়, একটি মেয়েমানুষের আদেশ আছে। স্বামীর ভাষায় 'সেই বজ্জাত মাগী,' দিদির আদেশ। তাকে দূরে রেখে সে-মেয়েমানুষটি যেন বলছে, আমার পালঙ্কের বিছানা তুমি কেড়ে নিয়েছ, নাও, কিন্তু আমার এই হাতে-গড়া সংসারে তোমাকে ছুঁচ ফুটাতে দোব না ; এ আমার, আমার।

সেদিন পনেরো বছর বয়সের অতটুকু মেয়ে পরী অত কথা ভাবতে পেরেছিল। জন্ম থেকেই সে ভাবতে শিখেছে, কাজ করতে শেখেনি। যদি সে কাজের মেয়ে হত তবে হয়তো কিছু ভাববার আগেই কাজ করার তাগিদেই জোর করে কাজ করে এ সংসারে তার স্বত্ব কায়েম করে নিতে পারত। কিন্তু পরী শুধু বসে বসে ভাবতে লাগল, আর অনেক আদর যত্ন সোহাগের মধ্যে ভয়ে কাঠ হয়ে রইল। ভয়ের সমুদ্রে ডুবে গিয়ে কোনরকমে যেন মাথাটাকে জাগিয়ে রাখল সে। যে-আঘাতের জন্য ভয়, সে-আঘাতটা নামল না। তাতে তার ভয় দূর হল না। তার মনে কোন সন্দেহ রইল না, সে আঘাত একদিন নেবে আসবে। শুধু তার জোর সেদিন আরও বেশী হবে। তার জীবনের চারদিকে পরী উ চানো লাঠির কুচ-কাওযাজ দেখতে পেল।

যে-মানুষটা এই ভয়ের উৎস, সেই মানুষটাও যে পরীকে ভয় করে তা যদি পরী জানত! জানলে হয়তো পরীর জীবন অন্য রকমের হতে পারত। কিন্তু এ কী করে কল্পনা করবে যে পঞ্চাশ বছর বয়সের জাঁদরেল পুরুষের পনেরো বছরের মেয়েকে ভয় করার সঙ্গত কারণ আছে? স্তিমিত যৌবন পুরুষ বিরাটাকার হলেও একজায়গায় অত্যন্ত দুর্বল, একজায়গায় তার সদ্য-জাগা যৌবনের কাছে অনুগ্রহ-প্রার্থী। ভয়ে ভয়ে সে অত্যন্ত সন্তর্পণে পরীর গায়ে হাত ছুঁয়েছে। সেটা ছিল তাকে গ্রহণ করার জন্য পরীর কাছে করুণ

আবেদন। পরী তা বুঝতে পারল না। পরী ভাবল, এ শুধু মুলতুবি রাখা, আঘাতকে মুলতুবি রাখা।

পঞ্চাশ বছরের বুড়োর মনেও কামনা থাকে। কিন্তু পঁচিশ বছরের যুবকের মত বেপরোয়া ভাবে সে অনিচ্ছুক মানুষের থেকেও জোর করে তার কামনা আদায় করে নিতে পারে না। অনেক তোয়াজে যত্নে তবে তার উত্তেজনা আসে। বড় বৌ জানত কী করে তোয়াজ এবং যত্ন করতে হয়। ছোট বৌ জানত না, জেনে নিতেও চেষ্টা করল না। সুন্দরী মেয়ের সদ্য-জাগা যৌবনের অপরূপ চেহারা মথুরকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু সে পাথরের যৌবন তাকে পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে চন্দনে সিক্ত করে ডেকে নিল না যৌবনের মন্দিরের ভিতরে। বাইরে থেকে অভুক্ত মথুর রাতের পর রাত জাগতে লাগল আশায় আশায়। সাফল্যের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

এমনি করে একটা বছর কাটল। তারপর পরিবর্তন সুরু হল। প্রথমটায় বুঝতে পারা যায়নি, চোখে দেখা যায়নি। যখন বুঝতে পারা গেল, বাড়ীর বেড়ালটাও, এঁটো-কাটা ফেলার জায়গার অনুগ্রহ-প্রার্থী কুকুরটাও, তা জানতে পারল।

একদিন রাত্রে মথুর তার পালংকের বিছানায় শুতে এলো না। উদ্বেগে অশান্তিতে রাত কাটিয়ে শেষ-রাতে বেরিয়ে গিয়ে পরী জানতে পারল, সে গিয়ে শুয়েছে বড় বৌ এর সংগে মাটীতে পাতা বিছানায়। পরদিন অবিশ্যি তার দেখা হয়েছিল মথুরের সংগে। মথুর লজ্জিত ভাবে হেসেছিল। কিন্তু পরী কোন অনুযোগ জানায়নি, রাগ-অভিমানও প্রকাশ করেনি। এ-সব করে যে বিরূপ পুরুষকে ফিরিয়ে আনা যায়, তা তার মনেও আসে নি। এ-সংসারের সব কিছুকেই পরীর শুধু ভয় করারই কথা। এ পরিবর্তনে তার সেই ভয়টাই শুধু আরও শক্তিশালী হল।

আস্তে আস্তে পরীর উপর কাজের ভার পড়তে লাগল। যে পরী জীবনের এতগুলো বছর শুধু বসে বসে কাটিয়েছে, এ-বাড়ীতে আসার পরেও যে-পরী নড়ে বসলেও লোকে ব্যথা পেত, সেই পরীকে নামিয়ে দেওয়া হল সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোতে, উঠোন—লেপা, গোয়াল সাফ করা, পুকুর থেকে জল নিয়ে

আসা, ধান ভানা ও ঝাড়া ইত্যাদি। সব কাজে নীরব বিমর্ষ একটি মেয়ে চরকীর মত ঘুরতে লাগল সারাদিন। এতদিন এ-কাজ করত বাড়ীর তিন-চার জন আশ্রিত বিধবা; তাদের মধ্যে দু'জন মথুরের নিজের বোন। এখন পরী তাদের সঙ্গী হল; এবং বাড়ীর সবচেয়ে নীচু মানুষটাও অনায়াসে তাকে আদেশ দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে লাগল। বাড়ীর গিন্নীর নির্দেশ আছে, ভয় কি? অনভ্যস্ত কাজে ভুল হত, কিন্তু ভুল হলে রক্ষে ছিল না। বড় বৌ-এর চীৎকার শুনে মনে হত এর চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। কী-যে কষ্ট হত প্রথম প্রথম! —তবু পরী প্রাণপণে সব কাজ করে যেত। সারা গা ব্যথায় টন্‌টন্ করতে লাগল। তবু ভয় যখন আঘাত হয়ে নেবে এল, মনে হল, এই ভাল। অনিশ্চিত প্রতীক্ষার চেয়ে এ অনেক ভাল।

একদিন পরীই গিয়ে বলল মথুরকে কথাটা। নিজে এগিয়ে গিয়ে কথা বলা তার এই প্রথম। তখন তার হাতে কাদা-মাখা, শস্তায় কেনা জোলার তৈরী নীলাম্বরীখানায় কাদা লেগেছে, কাদা ছিটে লেগেছে ঘামে ভেজা মুখে, অযত্নে জড়িয়ে রাখা চুলে। সামনা সামনি পড়ে গিয়ে মথুরানাথ একটু লজ্জিত হল। কত যত্নে রেখেছিল এ মেয়েটিকে মাত্র ক'দিন আগে!

পরী বলল, 'শুনছ গা? খাটের অত বড় বিছনায় একা একা শুই—বড্ড নজ্জা করে। নোকে দেখলেও মন্দ বল্‌বে। আপনি এক কাজ কর। দিদিকে নে' আজ থে' শোও এই বিছনায়। আমি ও ঘরে শোবখুনি।'

মথুর যেন কত দোষ করেছে, এমনি ভাবে হাসল। মাটীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার তাই ইচ্ছে ছোট বৌ? তবে তাই হবে।'

কিন্তু শুধু বিছানার কথা ছাড়া আর কিছু কি বলার ছিল না পরীর? এত আদরের বৌ ছিল সে; তাকে এত নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে আজ,—সে কি একটু কাঁদতে পারত না? মথুরের কাছে অনুনয় করে প্রতিকার চাইতে পারত না?

কিন্তু কিছুই না বলে নিজের কাজে ফিরে গেল পরী। পিছন থেকে তার দিকে তাকিয়ে মথুর দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল।

এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটল, যা পরী সহজে ভুলতে পারবে না। সেদিন

সন্ধ্যের একটু পরে তিন চার লড়ী চাল এসে উঠল বাড়ীতে। তার স্বামী চালের চোরাকারবার করে তা সে জানত। আজকে রাত্রের মধ্যে এই চাল হিসাব-নিকাশ করে গুদামে তোলা হবে। আবার তিন চার দিনের মধ্যে তেমনি রাত্রে রাত্রে এই চাল পাচার হয়ে কোথায় চলে যাবে। অনেকদিন ধরে এই কারবার চলছে। এই করেই তার স্বামী বড়লোক হয়েছে। কাজেই এ-ব্যাপারে পরীর আর কোন ঔৎসুক্য থাকার কারণ ছিল না। যথাসময়ে রাত্রের কাজ কর্ম শেষ করে সে নিজের একক বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ শেষ রাত্রে তার ঘুম ভেঙে যায় ডাকাডাকিতে। তার এক বিধবা ননদ ডাকছে 'ছোট বো. ছোট বো' করে।

'কি হয়েছে ?' পরী ধড়মড় করে উঠে জিজ্ঞেস করল।

'ছেঁড়া কাপড় আছে তোমার ঠেঁয়, ছেঁড়া কাপড় ?'

'ছেঁড়া কাপড় দে' আবার কী হবে ?'

উত্তরে ননদ সংক্ষেপে ঘটনা জানালো। স্বামীর ছোট ভাই শম্ভুই সাধারণতঃ চালের তদারক করে থাকে। আজও কোরছিল। চাল মাপানো, চালের বস্তা গুণে গুণে 'জনের' মাথায় তুলে দেওয়া, কাগজে ঢেরা কেটে হিসাব রাখা, এ-সবই করতে হয় তাকে একা। আজ প্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত একটানা কাজ করেও সব বস্তা ঘরে তুলতে পারেনি। কয়েক শো বস্তার কাজ তো সোজা নয়। বোধকরি খুব পরিশ্রম হয়ে যাওয়ায় একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসেছিল বস্তাগুলোর উপর; অমনি হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কুলীরাও শ্রান্ত: সুযোগ পেয়ে তারাও জিরোতে সুরু করেছে। এদিকে চারটে বাজলে কর্তা খোঁজ নিতে বাইরে এসে দেখেন. চারদিক ফরসা হয়ে এসেছে, কিন্তু সব বস্তা এখনো ঘরে তোলা হয়নি। গ্রাম জায়গা, এক্ষুনি লোকজন চলতে সুরু করলেই তো সব দেখতে পাবে। কর্তা তো অমনি মানুষ,—একদিকে খুব ভাল, আবার কাজে গাফিলতি দেখলে সাংঘাতিক রেগে যান। রাগের চোটে, হাতে ছিল হুঁকোটা, তাই ছুঁড়ে মেরেছিলেন শম্ভুর দিকে। কল্কের আগুন গায়ের উপর ছড়িয়ে পড়ে পুড়ে গিয়েছে কয়েকটা জায়গা। এমন কিছু নয়, কয়েকটা ফোস্কা পড়েছে, আপনা আপনি গলে-টলে গিয়ে শুকিয়ে যাবে। তা

কর্তার আবার ভাই এর উপর দরদ তো খুব,—হুকুম হয়েছে ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধতে হবে।

পরী গিয়ে দেখল সমস্ত বুকে পেটে দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া হয়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছে। কুলিরা কলা গাছের খোসা কেটে এনে তার রস দিচ্ছে ক্ষতগুলোর উপর। যন্ত্রণায় অল্প অল্প আর্তনাদও কোরছে শম্ভু। তবে কল্কেটা ভাঙেনি, ইতিমধ্যে আবার তামাক সাজা হয়েছে। মথুরানাথ একটু দূরে একটা টুলের উপর বসে গম্ভীরভাবে হুঁকো টানছে। চাল তোলার জন্যও লোক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই।

পরী বুঝতে পারল, যেটুকু ন্যাকড়া এনেছে তার কম্মো নয়। আরও নেওয়ার জন্য ফিরল ঘরের দিকে।

দিন যেতে লাগল। পরীর গায়ের রঙ রদ্দুরের আঁচে ঝলসে গেল। নরম হাত পা কড়া পড়ে পড়ে শক্ত হয়ে উঠল। মাংসপেশীগুলো পুষ্ট আর কর্মক্ষম হয়ে উঠল। তবে কাজ শিখল পরী। জীবন ভরেই চারদিকে কাজ দেখেছে, তবু নিজে যে এত তাড়াতাড়ি কাজ শিখে উঠতে পারবে এটা তার নিজের মনেও ভরসা ছিল না। আরও একটা জিনিষ শিখল সে। কাজ করতে করতে শরীর যখন অচল হয়ে আসে, তখন প্রতিবাদ করতে শিখল। প্রতিবাদ করা মানেই ঝগড়া করা। শক্তিশালী প্রতিপক্ষরা গালাগালি দেয়। কাজেই পরীকে গালাগালি দেওয়াও শিখতে হল।

একদিন দুপুর বেলা পরী গোয়ালের লাগোয়া ঘরে বসে বিচালি কাটছিল। এ-কাজটা পুরুষের কাজ, মানে শম্ভুর কাজ। কিন্তু শম্ভু অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল, এদিকে গরুগুলোর খোরাক বন্ধ হওয়ার জোগাড়। কাজেই পরীকেই এ-কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ পেছন থেকে একখানা লোহার মত হাত এসে পরীর একখানা বাহু চেপে ধরল। পরী ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, শম্ভু। হা করে চীৎকার করতে যাচ্ছিল, একখানা বিরাশী শিক্কা ওজোনের চড় এসে গালের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চাপা রূঢ় গলার শাসানি শুনতে পেল, 'চুপ, হারামজাদী, চুপ! টু শব্দটি করেছিস তো মাংস চেঁচে হাড্ডি বের করে ভাগাড়ে ফেলে দে' এসব।'

মনে হল, এই মারের ভাষাটা পরী ভাল বুঝতে পারল। শম্ভু তাকে একটা হেঁচকা টানে সরিয়ে এনে খড়ের গাদার উপর ধুপ করে ফেলে দিল। নেহাৎ খড় বলেই বেশী ব্যথা পেল না পরী। তারপর শম্ভু হাটু গেড়ে বসল পাশে। পরী কোন প্রতিবাদ করল না, আত্মরক্ষার জন্য একটু চেষ্টা পর্যন্ত করল না।

তারপর এমনি ঘটনা চলতে লাগল মাঝে মাঝেই।

পরী একবছর স্বামীর সঙ্গে শুয়েছে। তখন তার কিছু হয়নি! একবছর সে স্বামীর কাছ ছাড়া, অথচ সে অন্তঃসত্বা হয়ে বসল। সকলের আগে বড় বৌ-এর শিকারী চোখেই ধরা পড়ল ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে এত বড় কেলেঙ্কারীর খবরটা মথুরানাথের কানে গিয়ে পৌঁছল।

কী রাগটাই যে রাগল মথুর। পরীর উপর এই তার প্রথম এবং শেষ রাগ করা। তল পেটে তাক করে লাথি দিযে পরাকে শুইযে ফেলে দিল। তারপর উঠে বসবারও সুযোগ না দিযে চুল ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাইরে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল।

'নষ্ট দুষ্টু মেয়ে মুনিষের মোর ঘরে থাকা চলবেনিকো। চলে যা', যেদিগে দু' চোখ যায় চলে যা'। ফের এ বাড়ীতে পা দেবে তো ঠ্যাং বেইড়ে ভাঙব।'

পরীর এই দুঃসময়ে, আশ্চর্য, পরীকে আশ্রয় দিল শম্ভু। পুকুর ধারে যে বাখারির বেড়া দেওয়া ঘরখানায় সে থাকত সেখানে তাকে নিযে তুলল। বড় ভাই এর ভয়ে সে তটস্থ। অথচ বড় ভাই যে-মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাকে জায়গা দেওয়ার মত দুঃসাহস করে বসল অনায়াসে।

মথুর তো রেগে কাঁই। তার বাড়ীতে এমন অনাচার করবে তার ভাই তারই চোখের সামনে? সে কি মরে গেছে নাকি?

কিন্তু রাগ প্রকাশ করার আর সুযোগ হল না। এতকালের বাধ্য মেষ শাবকটি আজ অনায়াসে এসে বলে বসল, 'দাদা, এবার তবে আমরা আলেদা হই!'

তাতো বটেই! এমন না হলে আর লোকে বলবে কেন, ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই! এতকাল ধরে যে মথুর তার ভাইকে পাথার আড়ালে করে সহস্র দোষ

ঢেকে নিয়ে এত আদরে যত্নে পালন করল, সে তো আসলে দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা হয়েছে। পোষা সাপ শুধু যে পালিয়ে যায়, তাই তো নয়, সে আবার কাউকে না কাউকে ছোবল দিয়েও মেরে রেখে যায়। তা শম্ভুও তো তাই করেছে, বড় ভাই-এর এত সাধের ছোট বৌকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। ঐ বৌটাকে ঘরে আনতে মথুরের পাঁচশো টাকা শুধু নগদ পণই লেগেছিল, এ-কথাটা শম্ভুর মনে আছে কি? এত দামের এত আদরের বৌটাকে শম্ভু নিয়ে ঘরে তুলছে বিনি পয়সায়। ভায়া, এত অকৃতজ্ঞতা বড় ভাই সয়ে যেতে পারবে,—তার ভাই-অন্ত প্রাণ,—কিন্তু ধর্মে সইবে না।

এমন অকৃতজ্ঞ চরিত্রহীন ভাই আলাদা হয়ে যাবে সে তো খুব ভাল কথা। মথুরের ঘাড়ের থেকে একটি অপগণ্ডের দায় নেবে যাবে। তবে আলাদা হয়ে কি ভায়ার খুব সুবিধে হবে? কুল্লে আঠারো বিঘে জমি আছে পৈতৃক। দাদের দুই ভাই-এর বারো বিঘা বাদ দিলে শম্ভুর থাকবে ছ' বিঘা। তা বেশ! পাঁচজন সাক্ষী ডেকে মথুর আজই মাপ জোঁক করে দিয়ে দেবে শম্ভুর জমি শম্ভুর হাতে।

মাত্তর ছ' বিঘে? তাই কি হয়? শম্ভুকে অবাক হতে দেখে মথুর তৎক্ষণাৎ জমি-জমার দলীল-দস্তাবেজ সব নামিয়ে আনল।

'নিজে তো ক' অক্ষর গোমাংস। তা যা, লেখাপড়া জানা যাকে তোর পছন্দ হয় ডেকে নে' আয়। দেখে টেখে বলে দে' যাক, কার কতটা ন্যায্য পাওনা।'

তাই করা হল। তিন চার জন মাতব্বর গোছের লোককে ডাকা হল। তারা কিন্তু দেখে শুনে মথুরের কথাই সমর্থন করল। শম্ভুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তারা ধমকালো, 'ধম্মের ষাঁড়, এতকাল নাকে তেল দে' ঘুইমেছ আর বড় ভেয়ের জো-হুকুমগিরি করেছ। তা দাদা দিব্বি থালা থালা রাজভোগ সাইজ্যে এখেছে। যাও, খাও গে যাও।'

সেই ছ' বিঘে জমি নিয়ে শম্ভু আলাদা হয়ে গেল। পুকুর পাড়ের যে ঘরখানায় সে থাকত, সে ঘরখানা মায় চারপাশের কাঠা দুই জমি মথুর ছেড়ে দিল। শম্ভু কু-ভাই হতে পারে মথুর তো আর কু-দাদা নয়।

কিন্তু ধম্মের ষাঁড়টির প্রতি গাঁয়ের লোক কিন্তু এত দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতে রাজী হল না। গাঁয়ের বুকের উপর কেষ্ট-লীলে চলবে তারা তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে নাকি? সমাজ বলে একটা জিনিষ আছে তো,—কলি কাল বলে তো সব কিছুই উল্টে যেতে পারে না। এত বড় অনাচার তারা মুখ বুজে যদি সয়ে যায় তবে গাঁয়ের যত জোয়ান চ্যাংড়ার দল আছে তারাও তো একে একে মাথায় উঠবে। যা হোক করে নীতি ধম্মো বজায় রাখতে হবে তো। এখনো তো চন্দ্র স্যিযি উঠছে! বর্ষাকাল গ্রীষ্মিকাল আসছে ফিবছর ঘুরে ঘুরে।

দিন কয়েক ধরে প্রচণ্ড আন্দোলন চলল, তারপর বসল গ্রাম-পঞ্চায়েতের মীটিং। অনেক আলাপ-আলোচনা বাগ-বিতণ্ডার পর শম্ভুর উপর দুই দফা শাস্তি ধার্য্য করা হল। প্রথমতঃ, বড় ভাই-এর বৌ-এর সংগে অবৈধ প্রণয় করার জন্য পঁচিশ টাকা জরিমানা করা হল; সেটা অবশ্য দেয়। দ্বিতীয়তঃ, ভ্রষ্টা মেয়েকে ঘরে নিয়ে তোলার জন্য পঁচাত্তর টাকা জরিমানা করা হল, সেটা শম্ভু এড়াতে পারে যদি পরীকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। হুকুম জারীর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত এও ঘোষণা করল, শম্ভুর আর্থিক দুর্বলতার জন্যই জরিমানার পরিমাণ এত কম করা হল। না হলে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি আরও বেশী হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

শুধু এই নয়, এর পরে এল পরীর বাপ-ভাই-এর দল। তারা তাদের মেয়ের উপর দাবী জানালো। পথের মেয়ে তো নয় যে যে-কেউ ইচ্ছা ধরে নিয়ে ঘরে তুলবে। জামাই তাড়িয়ে দিয়েছিল তো কী হয়েছিল? তাদের এমন সোনার পারা মেয়েকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দিয়েও তারা কোন্ না দু' আড়াইশো বাগিয়ে নিতে পারত। কাজেই হয় শম্ভু তাদের মেয়েকে ফিরিয়ে দিক, আর নয় তো ঐ পরিমাণ টাকা দিক ক্ষতিপূরোণ বাবদ। অনেক বকা-ঝকার পর গাঁয়ের ভালো লোকদের মধ্যস্থতায় অবশেষে পঞ্চাশ টাকায় রফা করল শম্ভু।

পরীর সঙ্গে তারা একবার দেখাও করল না। যে-মেয়ে তাদের মুখে চুন-কালি দিয়েছে তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি? সে দুঃখে পড়েছে বলে গলা জড়িয়ে ধরে তার সঙ্গে কাঁদতে হবে নাকি? কোন সন্দেহ নেই, এ-

মেয়েকে তারা এককালে খুবই ভালবাসত। সে রদ্দুরে গেলে, বা আগুনের আঁচের সামনে গেলে, সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠত। তা তারা যেমন মেয়েকে ভালবাসত, তেমনি ভাল ঘরে-বরে তাকে বিয়েও দিয়েছিল। নিজের দোষে নষ্টামী করে মেয়ে সব হারাল। আজ তাকে অনেক রদ্দুরে পুড়তে হবে, জলে ভিজতে হবে, আগুনের আঁচে ঝলসাতে হবে। সে দোষ তাদের নয়। তাদের কর্তব্য তারা ঠিকই পালন করেছে।

এই দেড়শো টাকা এবং উপস্থিত খরচা-খুরচি মেটানোর জন্য শম্ভু মনসা-পোতার ভেড়ীর মালিকের কাছে আড়াইশো টাকা ধার করল সেই ছ' বিঘা জমি বন্ধক রেখে। বলা বাহুল্য, পরী একথা জানতে পেরেছিল অনেক পরে, যখন, দু' বছর পরে, শম্ভু জমিটুকু মনসা পোতার মালিকের হাতে তুলে দিয়ে তারই ভেড়ীতে চাকরি নিয়েছিল মাস মাইনেয়।

মথুরের শেষ লাথিটার ফলে পরীর পেটের ছেলেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল মাস কয়েক। একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই শম্ভু তাকে জানালো বাইরে যেতে হবে মজুরাণী খাটতে। কী বাধাটাই সেদিন পরী দিয়েছিল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। চাষীর ঘরের মেয়ে, চাষীর ঘরের বৌ পরের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরবে মজুরের কাজ করতে? কত লোক গা ঘেঁসা-ঘেঁসি করে চলে যাবে, কত লোক লোভের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে তার দেহের দিকে,—মান-সম্মানের কিছু কি আর বাকি থাকবে তার? কিন্তু শম্ভু না-ছোড় বান্দা। ঘরে বাইরে কাজ না করলে এ-সংসার ঠেকিয়ে রাখা তার কর্ম নয়। শক্ত দাওয়াই জানা ছিল তার, মারের চোটে পরীর সব মান সম্ভ্রমের বালাইকে ধোবাবাড়ী পাঠিয়ে দিল।

তারপর থেকে নতুন জীবন সুরু হল পরীর। জীবনের দেবতা একটি ভয়তড়াসী অকর্মণ্য নির্বাক মেযেকে ভেঙে চুরে আগুনের আঁচে গালিয়ে ছাঁচে ঢেলে একটি নতুন মেয়ে গড়ে তুললেন। আজ পরী বেপরোয়া সাহসী, নিপুণ কর্মী, নাকে-মুখে কথা বলে, আর যত কথা বলে তার চারগুণ হাসে। অভিজ্ঞতার থেকে পরী এটুকু বুঝেছে, অপরিচিত মানুষ হলেই সে কিছু একটা শত্রু হয় না, আবার মিত্রও হয় না। তাকে মিত্র করে নিতে হয় নিজের গুণে:

সে-গুণ হল হাসি আর কথা। সব সময় বুদ্ধিমানের মত কথা না-ই বলা গেল, সব সময় জায়গামত না-ই হাসতে পারল,—তাতে কী ? হাসি আর কথা মানুষ সব সময় ভালবাসে।

একসময়ে শম্ভুর বাইরে বেরোনোর প্রস্তাবে সে যে কেন অত আপত্তি করেছিল, এখন তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে পরীর। এ মানুষটা গোঁয়ার গোবিন্দ বটে, কিন্তু এমন নিরেট বোকা, একা-একা সংসার চালানো যে তার কাজ নয়·বাড়ীর কলাগাছটাও তা বোঝে। কিন্তু পরী বুঝতে পারেনি। কী গর্বেটই না পরী ছিল সে-সব দিনে !

কিন্তু সে ভীরু মেয়েটা কোথায় হারিয়ে গেল এই পৃথিবীর জনারণ্যে ? পরীর মনের উপরেও কি সে একটু ছাপ রেখে গেল না ? পরীর মন কি স্বচ্ছ কাচের টুক্‌রো,—সামনে দাঁড়ালে ছায়া পড়ে, সামনে থেকে সরে গেলে চিহ্নও থাকে না ? হয় তো তাই, তবু সেই ভীরু মেয়েটার জন্য মাঝে মাঝে করুণা জাগে পরীর মনে।

আট

গোপার সংগে নিধুর ঝগড়ার যেন আর শেষ নেই। সকালবেলায় কাজে বেরুতে যাবে নিধু, গোপা ঠিক তখুনি কথাটা তুলবে। আবার হয়তো দুপুরে কাজ-কর্ম সেরে এসে জিরিয়ে টিরিয়ে সবে খেতে বসেছে নিধু, একটু ফাঁক বুঝে গোপা ঠিক কথাটা পাড়বে। রাত্তিরবেলা নিধুর মেজাজটা একটু ভাল থাকে। দু'চারটে ভাব-সাবের কথা বলতে চায় প্রাণে। কিন্তু কে তার খোঁজ রাখে? গোপা তক্ষুনি তার মহাভারত খুলে বসবে।

দিব্বি নরম-সরম ভালমানুষ বৌটা। বেশ সুন্দর দেখায় হাসলে। চুল আছে এক রাশ মাথায়,—মুঠো করে নিয়ে আঙুলে জড়াতে বেশ লাগে। কিন্তু হলে হবে কি, মেয়েটা বড্ড জেদী। মেয়েমানুষের এত জেদ কি ভাল?

সেদিন রাত দুপুরে আরও ক'জন গাঁয়ের লোকের সঙ্গে নিধুকে যেতে হয়েছিল কিষ্টবাবুর ভেড়ীতে জাল দিতে। দিনের বেলাও জাল দিয়েছিল একবার; কিন্তু যথেষ্ট মাছ হয়নি বলে রাত্রে আবার এই ব্যবস্থা। কিন্তু শীতের দিনে মাছেরা সহজে খাড়ীঘর থেকে বের হয় না; রাতেও বিশেষ মাছ ধরা পড়েনি। তাতে কিষ্টবাবুর একটু উষ্মা হওয়ায় তিনি নিয়মমাফিক মজুরির চেয়ে কম দেবেন বলে শাসিয়েছেন। সেইজন্য নিধুর মনটা একটু খারাপ।

আবার মাছের পেছনে পেছনে বাজারে ছুটতে হবে মাছ বিক্রি হওয়ার পর মজুরির টাকা আদায়ের জন্য। তার আগে একবার বাড়ীতে এল কচি বৌটাকে একবার দেখে যাওয়ার জন্য। আর পুরুষমানুষের মন-ভোলানোতে ওস্তাদ গোপা তৎক্ষণাৎ খড়কুটো শুকনো পাতা দিয়ে একটা আগুনের কুণ্ড করে রাখল নিধুর সামনে। ঠাণ্ডায় কালিয়ে গিয়েছে লোকটা, একটু গরম হোক।

বলল, 'আগুণটা পোহাও ততক্ষণ। চাড্ডি পান্তা ভাত আছে। নুন-লঙ্কা দে' মেখে এনে দি।'

নিধু বলল, 'জানলি বৌ, তোর বুদ্ধি হবে আশী বছর বয়স হলে। তার আগে লয়।'

'তার মানে মোকে গোয়ালা বলতে চাস্। আচ্ছা, বুদ্ধিডা তোকে বাৎলে দি', তা'পর বলিস, মোর বুদ্ধি আছে কি লয়। বাজারে যাওয়ার লেগে কথাটা বললি তো,—বাজারে যাস্‌নি, যজ্ঞেশ্বরদাকে পেইঠে দে।'

তারপর গোপা পান্তা ভাত সামনে এনে দিয়ে আরম্ভ করল, 'এই দেখ তো! সারা দিন আত কাজ করে পাচ্ছিস্ তো মোটে আড়াইটে টাকা। তাও দিনকালের যা গতিক,—ফের দু'দিন হয়তো বিনি কাজে বসেই থাকবি। ওজটাও জুটবেনি। এমনি করে কি তিন তিনটে পাণীর সম্‌সার চলে? আর ঠেকলেই সেই' ঠাকুরের ঠেঁযে হাত পাত্‌বে—তাই কি ভালো দেখায়? তাই বল্‌তেছিলাম। এই তো ঘরের কাছে ধাপা। চাড্ডি চাড্ডি কয়লা অ'নলে ওজ আটগণ্ডার পয়সাও তো হয়।'

নিধু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বলল, 'তাই যা না ঘর-জ্বালানী, এক্ষুমি যা। বিন্দু খুড়ী মনে লিচ্ছে এখনো অওয়ানা দেয়নিকো।'

গোপা রাগ গায়ে না মেখে বলল, 'আগের কথা লয় নক্ষীটি। ভেবে সেবে দেখ তো দিনি মোর কথাটা। খারাপ কথা বলিচি কি কিছু?'

'খারাপও বলিস্‌নি, তোকে আমি আট্‌কেও রেখবনি। কিন্তু আর দুটো বছর যাক। সবে তো ক' মাস হল এয়েছিস। আর তা ছাড়া তুই এখন বেরুবার কথা বলিস কী করে!'

বলে নিধু গোপার পুরন্ত পেটের দিকে ইঙ্গিত করল। গোপা একটু লজ্জিত হয়ে পেটটা একটু ঢেকে ঢুকে নিল।

গোপা আবার নতুন পথে আক্রমণ সুরু করল। এমনি করে চলল প্রায় বেলা দশটা অবধি।

বেলা দশটার সময় রণে ভঙ্গ দিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে সবে নিধু বেঁটে গাব গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছে। পায়ের নিচের ঘাসগুলো এখনো ভিজে-ভিজে,—শিশির পড়ে রাত্রে ভিজেছিল, সেইটেই আছে, না কেউ জল ফেলেছে কে জানে? আশে-পাশের ঘাসগুলো পরীক্ষা করে নিধু বুঝতে পারল যে-জায়গাগুলোতে রদ্দুর পড়েছে, সে-জায়গাগুলো শুকিয়েছে। এ-জায়গাটা ছায়ার

নিচে তাই এখনো শুকোয়নি। শীতের দিনে এত ঠাণ্ডা শিশির পেয়েও ঘাসগুলো কুঁকড়ে যায়নি, বরং আরও সতেজ হয়ে উঠেছে।

এমন সময় বলরাম এসে উপস্থিত হল। সে বোধহয় কাছাকাছি কোথাও ঘুরছিল। নিধুকে দেখেই বলল, 'এতক্ষণে বেইরেছিস্ নিধে? শরীল-গতিক ভাল আছে তো?'

'হ্যা, বলাকাকা।'

বলরাম এগিয়ে এসে তার কাঁধের উপর একটা হাত রাখল। বলরামের গায়ে একটিমাত্র গেঞ্জি, বোধহয় আলা থেকে দিয়েছে; তাতে উনপঞ্চাশটা ছিদ্র।

'শোন্ নিধে! একটা কথা বলি। বৌমার সংগে তোর এত কথা কাটাকাটি হয় কিসের রে? সেই অবধি শুনতে নেগেছি! বৌ-মুনিষের এত কথা শোনা যাবে কেন গো? তুই বলতে পারিসনি কিছু?'

নিধু লজ্জিত হয়ে বলল, 'মোটে কথা শোনে না কাকা। কেবল তক্‌রার করবে। ছেলেমানুষ তো, বায়না ধরেছে বিন্দু কাকিমার সংগে ধাপায় যাবে কয়লার ব্যবসা করতে।'

বলরাম তাতে এতটুকু কৌতুক বোধ না করে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'খারাপ, খুব খারাপ। নতুন বৌ শ্বাসের সঙ্গে কথা বলবে,—পাঁচ হাত দূর থে' শোনা যাবে না। মোদের সোমাজে এই র'ম চলে আসতেছে হাজার বছর ধরে। তুই আবার বলতেছিস তক্‌রার করে! খুব সাংঘেতিক কথা! মরদের কথার উপর মাগা কথা কইবে কিরে? সে আবার কি? কলিকাল বলে কি ছুনিয়া শুদ্ধু উল্টে দিবি তোরা?'

নিধু নতমস্তকে পায়ের বুড়ো আংগুল দিয়ে ঘাস খুঁড়তে লাগল।

বলরাম আবার বলল, 'দিন যায়, আত আসে। স্বয্যি ওঠে, অস্ত যায়। এর কোন নড়ন-চড়ন নেই কো। মোদের সম্‌সারের নিয়মও তাই। বৌকে জব্দ রাখতে হবে, তবে সম্‌সার শান্ত থাকবে। বৌকে আস্কারা দিয়েছিস কি নাফ মেরে মাথায় উঠে বসবে। ত্যাখন বুক চাপড়িয়ে মরবি। বৌ খুব ভাল জিনিষ নিধে,—ভালবাসার জিনিষ। কিন্তু য্যাতক্ষণ পায়ের তলায় রাখতে

পারবি, ত্যাতক্ষণ। ও বড় সাংঘেতিক জাত,—ঢিল দিয়েছিস কি গোখ্রো সাপের মত ফণা তুলবে,—তোকেই ছোবল মারবে সকলের আগে।'

স্বামী হিসাবে নিজের কর্তব্য পালন করতে পারেনি বলে নিধু যেন লজ্জায় মরে গেল। কোনরকমে বলল, 'আর এর'ম হবেনি বলাকাকা। আমারই ভুল হয়ে গেছে।'

বলরাম ভিন্ন দলের মানুষ বলে তার ন্যায্য উপদেশও শুনবে না, নিধু তেমন ছেলে নয়। তেমন শিক্ষা নিধু পায়নি।

নিধুর মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, গোপা যে তার উপর অন্যায় সুযোগ নিচ্ছে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার বাপ-মা এখানে থাকলে বৌ কক্ষনো এমন করতে পারত না। একগলা ঘোমটা দিয়ে মাটীর সংগে লেগে চলা ফেরা করতে হত মাগীকে। ঘরের টিকটিকিটাও গলার শব্দ শুনতে পেত না। একা নিধুকে ছোকড়া স্বামী পেয়ে গোপা একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান কোরছে! নাঃ, সে ও বাবা পুরুষ মানুষ! একটা পুঁচকে বৌকে শায়েস্তা করতে পারবে না?

রাত্তিরটা জাগা গিয়েছে,—দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিল নিধু। বিকেল বেলা কয়েকটা জায়গা যাওয়ার কথা আছে কাজের চেষ্টায়। গোটা তিনেক বাজতে না বাজতেই নিধু বেরিয়ে পড়ল। এখুনি রদ্দুরের তেজ বেশ কমে এসেছে। এ বছর বেশ শীত পড়বে বলে মনে হচ্ছে।

পূব-মুখো যাচ্ছিল নিধু। নিতাই-এর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা দমকা আর্তনাদ শুনতে পাওয়া গেল। কোন আচমকা তীব্র আঘাতে কেউ আর্তনাদ করে উঠছে, আবার তক্ষুনি থেমে যাচ্ছে। আর্তনাদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই একটা রূঢ় পরুষ কণ্ঠের চাপা ধমকানি শোনা যাচ্ছে।

পরুশ কণ্ঠটি বলছে, 'চুপ চুপ। আবার চেঁচায়? বল্‌তেছি যে গলা দে' শব্দ যেন বের হয় না,—কানে যায়নি সে কথা? চেঁচাবি তো আরও বেশী মার খাবি হারামজাদী। ও সব ঢং চল্‌বেনি বজ্জাত মাগী! আট আনার পয়সা—কড় কড়ে রূপোর আধুলীটা—কী কোরেছিস বের কর শিগ্গির। না' সে আজ তোর অঙ্কে নেইকো।' ইত্যাদি।

তারপর আবার একটা দমকা আর্তনাদ! সেই পুরোণো ব্যাপার,—আর ভাল লাগে না। নিতাই মারছে তার বৌকে।·এ-মার বড় সাংঘাতিক। মারের কোন শব্দ নেই, যে মার খাচ্ছে সে-ও প্রাণ খুলে চেঁচাতে পারছে না আরও বেশী মারের ভয়ে। কাজেই নিতান্ত কাছাকাছি না এসে পড়লে কেউ জানতে পারবে না যে নিতাই-এর বাড়ীতে কিছু একটা ঘটছে। বলরামকাকা যে মারে সেটা সকলের চোখে পড়ে বটে, কিন্তু সে মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের ব্যাপার। নিতাই এর মার চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এ বেলার মুলতুবি মার ও-বেলা আবার সুরু হয়। এ-গাঁয়ের সব চেয়ে নিষ্ঠুর মানুষ এই নিতাই। গাঁয়ের সবাই ব্যাপারটা জানে, কিন্তু কেউ এ-নিয়ে টু শব্দটি করে না। নিধুরা তিন চারজন সমবয়সীরা তবু মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু যারা বয়স্ক তারা এ-নিয়ে কথা বলতেও নারাজ।

মাত্র আট আনার পয়সার জন্য বৌটাকে এমন করে মারছে নিতাই। পয়সাটা যে বৌ-ই নিয়েছে এমন কোন চাক্ষুষ প্রমাণ নেই। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে নিতাই মেরে চলেছে। অথচ, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে পয়সাটা বৌ-ই নিয়েছে, তবু স্বামীর রোজগারের মাত্র আট আনার পয়সার উপরও কি বৌ-এর অধিকার নেই? বৌ নাকি স্বামীর সুখ-দুঃখের ভাগী? দুঃখের ভাগী তাকে অবশ্যই হতে হয়। কিন্তু সুখের ভাগী হওয়ার এই কি নমুনা?

এই জন্যই নিধু নিজের গাঁ-এর লোকদের নিজের জাতের লোকদের দু-চক্ষেও দেখতে পারে না। চেহারায় পোষাক আশাকে এরা যেমন অসুন্দর, তেমনি অসুন্দর এদের মন। এরা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি কর্কশ। যেন বনের জানোয়ার! সুন্দরবনে বুনো জানোয়ারদের সঙ্গে বাস করেছে তো এদের পূর্ব-পুরুষেরা—এরা সেই জানোয়ারের চেয়ে কত আর ভাল হবে! যারা মানুষ, তারা কি কখনো নিজের বৌ-এর উপর এমন করে অত্যাচার করতে পারে? নিজের বৌ, যে তোমাকে এত আদর-যত্ন করে, যে তোমাকে এত আনন্দ দেয়, তোমার আনন্দের জন্য ভগবান যাকে এত নরম আর কোমল করে তৈরী করেছেন,—তার উপর অত্যাচার করা সবচেয়ে জঘন্য কাজ নয়?

এই সব কারণেই নিধু শহরের ভদ্দর লোকদের বেশী পছন্দ করে। তাদের সঙ্গে মিশতে টিশতে ভালবাসে। তারা মানুষের সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলতে জানে,—গাঁয়ের লোকদের মত প্রতি কথায় এত বিষ ঢালে না। তারা সুন্দর সেজে গুজে থাকে। বৌ ঝিদের নিয়ে তারা রাস্তায় বেড়াতে বের হয়। নিজেরা যে পোষাক পরে, তার চেয়ে দামী পোষাক পরায় মেয়েদের। মেয়ে জাতকে কী করে যত্ন করতে হয় তা তারা জানে। ভদ্দর লোকদের পয়সা আছে বলে হিংসে করলেই তো হবে না,—তাদের গুণগুলোও তো দেখতে হবে। এক কথায় তারা সুন্দর—অনেক সুন্দর। তাদের মানুষ বলা চলে, আর নিধুরা তো জানোয়ার।

নিধুদের জাতির মধ্যেও তো ধনী লোক আছে। তারা জানে শুধু পয়সা জমিয়ে মাটীর তলে পুঁতে রাখতে। ভদ্দর লোকদের মত অত সুন্দর করে তো তারা বাঁচতে জানে না।

নিধুও আর খানিকটা এগিয়ে আসতেই নিত্যানন্দের বাড়ী পড়ল সামনে। দাওয়ায় বসে বুড়ো নিত্যানন্দ পায়ের বাতে তেল মালিশ কোরছে আর অসহায়-ভাবে ঘরের মধ্যে বসা ছেলে বৌ-এর ধমকানি শুনছে। তাকে দেখে ডাকল, 'নিধু, ও নিধে! আরে একবার এসই না। মরতে চলেছি, তবু একবার দেখতে এসবেনি ভাই?'

অগত্যা নিধু দাওয়ায় উঠে এসে এগিয়ে দেওয়া জল-চৌকিটার উপর বসল, 'বালাই! মরবে কেন নিত্যাদা? দিব্যি তো সমর্থ শরীল রয়েছে তোমার এখনো।'

'ঐ দেখ! আবার চোখ দিচ্ছে! ইদিগে যে বাতে বাতে শেষ হয়ে গেলাম।'

নিধু ভাবছিল, কী বলে এবার ওঠা যায়।

একটু থেমে বুড়ো আবার বলল, 'নিধে, শুনলাম নাকি তোর বৌটা বড় বজ্জাত হয়েছে? আতদিন গালমন্দ করে?'

নিধু বিরক্ত হল।

'কে বলেছে?'

'কলিকাল কিনা,—মেয়েছেলেগুনো এখন ওরকমই্ হচ্ছে দিনকে দিন। তা বুড়ো মুনিষের একটা উপদেশ মনে রেখিস দাদা। মেয়ে নোককে আস্কারা দিতে নেই। জো পেলেই ওরা মাথায় ওঠে। মেয়ে জাত বড় সাংঘেতিক।'

সকাল বেলা বলরামের মুখে ভাল লাগছিল কথাগুলো। এখন ভাল লাগলনা।

'সেজন্য ভেবনি নেত্যদা।'

'আর শোন্। তোর বৌ-র বুঝি এই সাত মাস চলতেছে ?'

'সাত মাস কী করে হবে গো ? মোটে তো পাঁচ মাস হল মোর কাছে আছে !'

'এমনি পুরুষমানুষ বটে তুই নিধু। তুই ছাড়া আর বৌ পোয়াতী হতে পারে না, নারে ? পোয়াতী বানানোর মন্তর এই দুনিয়েয় এক তুই-ই জানিস ?'

হাসতে হাসতে নিধু উঠল।

'ঠাকুদ্দার মুখের লাগাম নেইকো।'

মানুষ হিসাবে নিত্যানন্দকে নিধু দেখতে পারে না সে ছেলে-বৌদের পর্যন্ত শাসনে রাখতে পারে না বলে। কিন্তু তার কথাটা তাই বলে সে উড়িয়ে দিতে পারল না। বুড়ো অভিজ্ঞ মানুষ নিত্যানন্দ। একবার শাদা চোখে দেখে যা বলে দেবে সহজে তার নড়ন-চড়ন হয় না। সেবার মোড়লের পুকুরের জল খারাপ হয়ে মাছ খাবি খেতে সুরু করেছিল। তখন এই নিত্যানন্দের পরামর্শেই জলে চূণ দিয়ে জল ভাল হয়ে গেল। সেইজন্যই ওদের সমাজে বুড়োমানুষের বড় কদর।

নিতাই এর কাণ্ড দেখে সকালে বলাকাকা যা বলেছিল তা অনেকটা ফিঁকে হয়ে এসেছিল নিধুর মনে। নিত্যানন্দের কথাতে সংশয়টা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। গোপার যে এমন বারমুখো মন, বাইরে যাওয়ার জন্য রাতদিন যে এত ঝগড়া কোরছে,—এ-মনোভাবের পিছনে শিকর কদ্দুর অবধি গড়িয়েছে কে জানে ?

কাজেই রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে গোপা যখন আদর সোহাগে তাকে প্রায়

গলিয়ে দিতে চেষ্টা কোরছিল, বল্‌ব কি বল্‌ব না ভাবতে ভাবতে নিধু কথাটা শেষ পর্যন্ত বলেই বসল, 'আজকে বলাকা কি বলেছে জানিস ?'

'কি বলেছে ?'

'বলেছে যে-মেয়েনোক সোয়ামীর মুখে মুখে কথা বলে, কথা শোনে না, সে মেয়েনোক সাংঘেতিক।'

গোপা হেসে উঠল, বলল, 'বাঃ! সে আর লতুন কথা কি গো ? সে তো সবাই জানে।'

'জানে ? তুই জানিস্ ? তবে তুই সব্বদা মোর মুখে মুখে তকরার করিস কেন ?'

'সে তুই করতে দিস্ তাই করি। ঘরে গুরুজন মান্যিজন কেউ নেইকো। তুই মোর কথা শুনতে ভালবাসিস্, তাই এত কথা বলি। তুই যদি আগ করতিস্, তবে দেখতিস্ আমি একবারে বোবা হয়ে গিইছি।'

কথাগুলো এমনিতে খুব ন্যায্য আর স্বাভাবিক। বাড়ীতে যখন গুরুজন নেই, তখন না হয় একটু স্বাধীনতা ভোগ করলই গোপা। তাতে কার কী ক্ষতি। কিন্তু গোল বাধিয়েছে নিত্যানন্দ ঐ কথাগুলো বলে। এমন কোমল নরম মেয়েমানুষটি আদরে সেবায় যত্নে নিধুর অন্তরকে একেবারে রস-নিসিক্ত করে রেখেছে। অমন একটা প্রসঙ্গ সরাসরি তার মুখের উপর তুলে তার মনে দুঃখ দিতে সে কক্ষনো পারবে না। না, নিধু তা পারবে না। কিন্তু নিধু এও জানে, নষ্ট-দুষ্ট মেয়েমানুষেরা পুরুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখার ক্বায়দা ভাল করেই জানে।

মনের কাঁটাটা উপড়ে ফেলা গেল না। যাক্ গে! সত্যি কথাটা একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই। ব্যস্ত কি ? সত্যি কখনো গোপন থাকে না।

বৌ-মানুষের আদব-কায়দার কথাটা নিধু তুলল বলে বাপের বাড়ীর কথাটা মনে পড়ে গেল গোপার। বাপের বাড়ীতে তার বড় ভাই-এর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সারাদিন একগলা ঘোমটা দিয়ে বৌদি বাড়ীতে চলাফেরা কাজকর্ম করে। চারদিকে গুরুজন বলে তাদের সাবধানতার অন্ত নেই। কথা বলে ফিস্‌ফিস্ করে। কচিৎ কখনো দুপুরে টুপুরে কোন নিরাপদ জায়গায় বসে তারা

একটু ঘোমটা সরিয়ে সহজ হয়ে বসতে পারে বা সইদের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারে। তা সে বাপের বাড়ীর দেশের কথা এখন ভেবে আর লাভ কি? সে-সব হল সত্যিকারের গৃহস্থ বাড়ী,—মানুষের বাড়ী যে-রকমের হওয়া উচিত, তাই। সেখানে কত ঘর, গোয়াল ঘর, শব্জীর বাগান, মাড়াই ভরা ধান, ঢেকি, কত কি? গোপার কপাল মন্দ,—তার বিয়ে হয়েছে এক লক্ষ্মীছাড়ার দেশে। এগুলো তো বাড়ী নয়, বস্তী। কত রাত্রে গোপা স্বপ্ন দেখে, সে যেন একটা সত্যিকারের চাষীর বাড়ীতে একগলা ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৌ বলতে তো তাই বোঝায়!

এখানকার বাড়ীতে ও যে-ভাবে চলাফেরা করে তাতে তো ওকে বৌ ই বলা চলে না। ও যেন এ-বাড়ীর মেয়ে, বৌ নয়। সত্যিকারের বৌ না হতে পারার জন্য মাঝে মাঝে কত আপশোষ হয় গোপার। তবু আবার পরদিন সকালে উঠেই সে নিধুর কাছে বায়না ধরে ধাপায় যাওয়ার জন্য। যতখানি স্বাধীনতা সে পেয়েছে তার পরিধিটা আরও একটু বিস্তার করার জন্য মনটা আকুল হয়ে ওঠে।

দিন কয়েক পরে প্রথম পোয়াতী বলে গোপাকে নিধু তার ভাইদের কাছে রেখে এল। নিজে গেল বানতলার একটা ভেড়ীতে চাকরি নিয়ে। কর্পোরেশনের ময়লা জলের ভেড়ী বলে এ-সব ভেড়ীতে মাছ জন্মে অনেক বেশী। এ-ভেড়ীর মালিকও মস্ত-লোক—নফর বাবুর বাজারে তাঁর মাছের আড়ৎ আছে।

কড়া মালিকপক্ষ কর্মচারীদের থেকে ষোল-আনা কাজ বুঝে নেন। বলাকা'র মত এখানে তাঁর ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। মাইনে যদিও তাই বলে বলাকা'দের চেয়ে বেশী নয়। এ-সব ভেড়ী-ভাড়া অঞ্চলে ত্রিশের উপর মাইনে তুলতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। মুড়ি-মুড়কীর এখানে একদর।

রাত্রে ডিউটি ছিল বলে নিধু দুপুরবেলা একটু চোখ মট্‌কা দেওয়ার অনুমতি পেয়েছিল। সবে দুপ্পুরে শুয়ে একটু চোখ বুজেছে, এমন সময় দু'জন বা' কোথেকে এসে নিধুকে ডেকে তুলল।

নিধু উঠে দেখল দু'জন স্যুট-পরা তরুণবয়সী ছেলে তাকে ডাকছে মানুষ বলে মনে হল না; কিন্তু তাদের হাতে বন্দুক, কাঁধে ঝোলানো

জল রাখার হ্যাভারস্যাক দেখে নিধু বুঝতে পারল বাবু দু'জন কোলকাতা থেকে এসেছে পাখী শিকার করার জন্য। শীতকালে এ সব অঞ্চলে প্রচুর পাখীর সমাগম হয়; কাজেই শিকার-বাতিক-গ্রস্ত লোকদের আনাগোনাও প্রায় লেগেই থাকে।

নিধু উৎসাহিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল, 'আসুন না বাবুরা। ভিতরে এসে বসুন। শিকার করতে বেইরেছেন বুঝি?'

দু'জনের মধ্যে যে একটু বয়স্ক সে বলল, 'ঠিক ধরেছ। কিন্তু যা হয়রাণিটা গেল! বাপ্‌রে! বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে।'

নিধু লক্ষ্য করে দেখল, সত্যিই রদ্দুরে এবং পথশ্রমে তাদের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। নিশ্বাস জোরে জোরে বইছে। কিন্তু নিধুর লোভ বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রাখা বন্দুকের দিকে। দু'একবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে শেষে সে একটা বন্দুকের গায়ে সস্নেহে একটু হাতও বুলিয়ে দিল।

বয়স্ক জন, নিধু পরে জেনেছিল তার উপাধি বোস, অর্থাৎ বোসবাবু, বলল, 'ছুঁড়তে জান?'

'যদি হাতে ধরতে দেন তো দু'চারটে পাখী মেরে দিতে পারি।'

'পার? আরে সেইরকম একজনকেই তো খুঁজছি। কি বলব ভাই, সাত আট-টা বুলেট খর্চা করে একটাও পাখী মারতে পারলাম না। অথচ দু'চারটে পাখী না নিয়ে যেতে পারলে তো বাড়ীতে মুখ দেখানো যাবে না।'

সে কথা নিধু ভাল করেই জানে। সৌখীন বাবুরা সব আসেন পাখী ধরতে; নিজেদের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হয়ে শেষে ভেড়ীর লোকদের শরণাপন্ন হন। অন্যের মারা পাখী বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের সামনে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেন কী করে অদ্ভুত বুদ্ধি আর কৌশলের সাহায্যে তারা পাখীগুলো শিকার করেছে। বন্ধুবান্ধব মহলে শিকারী বলে তাদের নামও ছড়িয়ে পড়ে। বেশ [illegible]মে আছে এই বাবুদের জাতটা! অন্যেরা পরিশ্রম করে কাজটা হাসিল [illegible], নামটা হয় তাদের।

দু'জনকে সংগে নিয়ে গিয়ে নিধু অল্প সময়ের মধ্যেই কুড়িখানেক [illegible]রে দিল।

ছোটজন, অর্থাৎ পালবাবু, বলল, 'ভারী সুন্দর হাত তো তোমার!'

বোসবাবু বলল, 'আমিও তাই বলব বলে ভাবছিলাম। অনেকদিন ধরে শিখেছ বুঝি বন্দুক ছোঁড়া?'

নিধু হেসে বলল, 'শেখার জন্যি মোদের হাতে বন্দুক দেবে কে তা বলুন?' এ সব তুরুচ্ছু কাজ মোদের কষ্ট করে শিখতে হয়নিকো। জর্মের থে'ই মোদের হাতের আন্দাজ খুব বেশী।'

তারপর প্রায় প্রায়ই বোসবাবু আর পালবাবুরা নিধুর কাছে আসতে লাগল। বিশেষ করে বোসবাবু লোকটাকে ভারী ভাল লেগে গেল নিধুর। খুব অমায়িক লোক। নিধুকে একেবারে বন্ধুর সামিল বলে ধরে নিল। শিকার-করা পাখী দু'টো একটা তো নিধুর মিলতেই লাগল; তা ছাড়া তারা যে টিফিন সঙ্গে করে আনে তার ভাগও নিধুকে না দিয়ে তারা ছাড়ে না।

একদিন তো বোসবাবু নিধুর হাত ধরে বলেই বসল, 'আমাকে তুমি বন্ধু বলে স্বীকার করো তো নিধু?'

নিধু তৎক্ষণাৎ জিভ্ কেটে বলল, 'কী যে বলছেন বাবু! আপনারা হলে কত বড় নোক, বাবুনোক। আর মোরা সামান্যি নোক, ছোট নোক। মোরা আপনাদের পায়ের তলায় থাকার যুগ্যি বৈ তো নয়।'

শুনে বোসবাবু ধমক দিয়ে উঠেছিল, 'ফের আবার ঐ সব কথা বলছ নিধু? তুমি যে তফাতের কথা বলছ সে শুধু পোশাকের তফাৎ। আসলে তুমি তো কারও চেয়ে ছোট নও। তুমি হলে গুণী লোক।'

একদিন এসে বোসবাবু নিধুকে ধরল, তাকে বোসবাবুর থেকে কিছু একটা জিনিষ নিতে হবে। নিতেই হবে। তাদের বন্ধুত্বের স্মারক চিহ্ন হিসাবে।

নিধু কিছু নিতে রাজী নয়,—সে যে অকৃত্রিম স্নেহ পেয়েছে তাইতেই তার অন্তর ভরে গেছে। বোসবাবুও ছাড়বে না। শেষে নিধু জানাল, বোসবাবু তবে তাকে একদিন ফার্ষ্টক্লাশে বসিয়ে সিনেমা দেখিয়ে দিন না। সিনেমা দেখার বড় সখ নিধুর। কোলকাতা গেলেই, এবং হাতে পয়সা থাকলেই সিনেমা তার দেখা চাই-ই। কিন্তু সে দেখে সাড়ে ছ' আনার টিকিটে। তার বড় ইচ্ছা, যে-জিনিষ সাড়ে ছ' আনা খরচ করেই দেখা যায়, সেই একই জিনিষ

সাড়ে তিন টাকা খরচ করে দেখে' বাবুরা কতখানি বেশী আনন্দ পায় একবার পরীক্ষা করে দেখে।

দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে একবেলার ছুটি নিয়ে নিধু তার বিশেষ সময়ের জন্য জমিয়ে রাখা ধোবাবাড়ীতে ধোয়ানো সার্ট এবং ধুতি পরে রওয়ানা হল।

বাস থেকে ভবানীপুর নেমে বোস নিজেও একটা সিগারেট ধরাল, নিধুকেও একটা দিল। সিগারেট টানতে টানতে দু'জনে যাচ্ছে, এর মধ্যে হঠাৎ বোস বোঁ করে হাতটা পিছনে নিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে গাড়িয়ে দিল। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারল না নিধু; তার হাতে তখনো সিগারেট জ্বলছে।

মিনিট খানেক পরে একজন মোটাসোটা সুবেশ বয়স্ক ভদ্রলোক তাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন।

'কোথায় চলেছিস রে হাবুল?'

'সিনেমা দেখব ভাবছি, বাবা।'

'পাঠ্য বই-এর কথা বুঝি আজকাল সব সিনেমার পর্দায় রিফ্লেক্ট করা হয়? বেশ বেশ! তা সঙ্গের এ মহাপুরুষটি কে?'

বলে ভদ্রলোক ভ্রূর সাহায্যে নিধুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। মহাপুরুষ কথাটার অর্থ নিধু ভাল বুঝল না, তবে বুঝল, ওটা কোন প্রশংসাসূচক কথা নয়।

বোস বলল, 'ও? ও এমনি মানে, এমনি বেড়াতে এসেছে কোলকাতা। মানে ভেড়ীতে কাজ করে কিনা,—যেখানে আমি শিকার করতে যাই।'

'সে আমি বাবুর কাপড় পরার ঢং দেখেই বুঝতে পেরেছি। আবার ধোবাবাড়ীর কাপড় পরা হয়েছে! ছোটলোক মরে কি সাধে? তা বন-বাদারের বন্ধুকে শহরে নিয়ে এসেছ কি বন্ধুবান্ধবদের দেখানোর জন্য? বেশ বেশ! কালো ঠোঁটে সাদা সিগারেটটা তো বেশ মানিয়েছে! অনুমান কোরছি ওটাও তোমারই দেওয়া। ভাল, ভাল, খুব ভাল। এবার তবে প্রাণের বন্ধুকে কোন সিনেমা ঘরে নিয়ে গিয়ে সাহেব মেমের খেম্‌টা নাচ দেখিয়ে দাও!'

বলতে বলতে ভদ্রলোক উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন।

কথাগুলোর চেয়েও, কথাগুলো বোসের মুখে কি-ভাবের সৃষ্টি করে সেইটেই নিধুর কাছে বেশী কৌতুকের বিষয় হয়ে উঠল। বোসের ফর্সা মুখ আকর্ণ লাল হয়ে উঠেছে। সেই যে সে মুখ নীচু করল, তারা অনেকটা পথ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল, তবু সে আর মুখ তুলল না। বাপের কথায় নিধুর মনে আঘাত লাগতে পারে ভেবেই কি বোস এত লজ্জা পেয়েছে? নিজে না বুঝে একটা অশোভন কাজ করতে চলেছিল, বাপের কথায় চৈতন্য হয়েছে বলে কি এত লজ্জিত হয়েছে? কোন্‌টা ঠিক?

সিনেমা দেখার ইচ্ছাটা কেমন ফিকে হয়ে এল নিধুর মনে। সিনেমার ফার্ষ্ট ক্লাশের সীটগুলোতে বোসের বাবার মত ভারি চেহারার লোকেরাই বসে থাকবেন। পাশে নিধুকে দেখে তাদের কী রকম যে মুখের ভাব হবে সহজেই অনুমান করা যায়। নিরুপায় রাগ এবং ঘৃণার সেই চেহারা নিধুর দেখার অভ্যেস আছে। ট্রামে বাসে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। খুব ফর্সা জমকালো পোষাক-পরা কোন ভদ্রলোকের পাশে একটু খালি জায়গা দেখে ওরা হয়তো অম্লান বদনে গিয়ে বসে। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত মুখে শরীরটাকে যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করে ছোঁয়াচ বাঁচাতে চেষ্টা করেন ভদ্রলোকটি। ভদ্রলোকের অস্বস্তি বুঝতে পেরে নিধুরা ইচ্ছে করে আরও ভাল করে ভদ্রলোকটির গায়ে গায়ে ঘেঁসে বসে। তাদের ময়লা জামার আঁশ আর ঘামের গন্ধ একটু গিয়ে মিশুক না হয় ভদ্রলোকটির কাপড়ের এসেন্সের গন্ধের সঙ্গে!

কিন্তু ট্রামে-বাসে ভদ্রলোকদের তবু একটু সান্ত্বনা থাকে। পয়সার মায়ায় ট্যাক্‌সীতে না ওঠার শাস্তি হিসাবে তাঁরা নিতে পারেন জিনিষটাকে। কিন্তু সিনেমার সবচেয়ে দামী সিটেও যদি তাঁদের নিধুর পাশে বসতে হয়, তবে তো আর তাঁদের সে দুঃখ আর আপশোষ রাখবার জায়গা থাকবে না। হাতে চাঁদ আর কপালে সূর্যি নিয়ে যারা জন্মেছে, কাজ কি তাদের এতখানি মনোকষ্ট দিয়ে?

নিধু বলল, 'থাক গে বোসবাবু, সিনেমায় গিয়ে আর কাজ নেই।'

বোস যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। 'যাবে না বলছ? অবিশ্যি এ-ছবিটাও বিশেষ ভাল না। তোমার তো মোটেই ভাল লাগবে না। তবে বরং এক

কাজ কর নিধু। যে-পয়সা দিয়ে সিনেমা দেখতে, সে-পয়সাটা বরং নগদ নিয়ে যাও। কিছু কিনে টিনে খেও।'

তা পয়সা পেলে নিশ্চয়ই নেবে নিধু। শুধু ঐ একটা প্রয়োজনের জন্যই ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেশা-টেশা চলে।

নিধু হাত বাড়িয়ে বোসের থেকে কড়কড়ে সাড়ে তিনটে টাকা নিয়ে পকেটস্থ করল। তারপর রওয়ানা হল কোন শুঁড়ির দোকানের উদ্দেশ্যে।

বোস ভাবল, ভদ্রলোকের ছেলে হলে কক্ষনো এ-ভাবে অপমানিত হবার পর টাকা নিতে পারত না। ছোটলোক আর ভদ্রলোকে এইখানটাতেই তফাৎ।

এই কিছুটা অস্বস্তিকর কিছুটা লজ্জাকর ঘটনাটি বোসবাবু দু চারদিনের মধ্যেই ভুলে যাবেন। কিন্তু ঘটনাটি সামান্য হলেও নিধু এটা কোনদিন ভুলতে পারবে না। এই মুহূর্তে অবিশ্যি নিধুর মনে সামান্য একটু জ্বালা ধরেছে মাত্র। কিন্তু যত দিন যেতে থাকবে, ততই এই জ্বালাটুকু নিধুর মনে একটি ক্ষত সৃষ্টি করবে ; সেই ক্ষতটি ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে একটা পুরোণো পচা দগদগে বিষাক্ত ঘায়ে পরিণত হবে। এটা সেই স্বল্প-সংখ্যক ঘটনার একটি যেগুলো সময়ের প্রবাহে মুছে যায় না, বরং সময় যাকে সযত্নে লালন-পালন করে দিনের পর দিন বাড়িয়ে বাড়িয়ে বিরাটাকার করে তোলে।

ভদ্রলোকদের সম্পর্কে নিধুর মনে একটা মোহ ছিল। তাদের চেয়ে ভদ্রলোকেরা শ্রেষ্ঠতর জাতি বলে তার বিশ্বাস ছিল। বোসবাবু তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করায় সে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। জীবনে আর কোনদিন আর কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে সে এতখানি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবে কিনা সন্দেহ। কাজেই বোস এবং তার বাবা আজ তার মনে যে মনোভাবটি সৃষ্টি করে দিলেন, এ-মনোভাবটি বদলানোর সে কোন সুযোগ পাবে না। যতদিন যেতে থাকবে, ততই নিধুর মনে বোস আর তার বাবা নিছক দু'জন ব্যক্তি বলে গণ্য হবেন না। তার মনে অক্ষয় হয়ে জেগে রইবে এই বিশ্বাস যে ওঁরা দু'জন সমস্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতিনিধি, এবং সমস্ত ভদ্রলোকই ঠিক এই একই ধাতু দিয়ে গড়া। ছোটজাতের সঙ্গে কথা বলার সময়ে ভদ্রলোকেরা মুখে মিষ্টি ব্যবহার করেন, কিন্তু অন্তরে একটি ছোরা লুকিয়ে রাখেন। ভবিষ্যতে নিধুও ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করবে, কিন্তু অন্তরে একটি ছুরি লুকিয়ে রাখবে।

নয়

মাস দুই পরে অটবী মাছ কেনা-বেচার কাজ ছেড়ে দিল। কী যে হয়েছে এবার মাছের বাজারে,—মোটেই আশানুযায়ী লাভ করা গেল না এতদিনের রাত-জাগা খাটা-খাটুনি সত্ত্বেও! এবার যে অটবী বাজারে নেমেছে,—মাছের বাজারে আগুন তো লাগবেই! মাছের কারবারে এত লাভ স্যাত লাভ, এ শুধু চিরকাল ধরে অটবী শুনেই এল। কাজে হাত দিয়ে তার কোন নমুনাই দেখতে পেল না। আর পাইকারের কী ভীড়! যেন দেশে কাজের আকাল পড়েছে, তাই যত উট্‌কো লোক সব হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছে মাছের কারবারের মধ্যে।

জমিদারের থেকে পঞ্চাশ টাকা আর সুধন্যর থেকে পনেরো টাকা, এই পঁয়ষট্টী টাকা নিয়ে অটবী কারবারে নেমেছিল। যেদিন কারবার বন্ধ করে দিল, সেদিন হিসাব-পত্র করে দেখল হাতে মোটে গোটা চোদ্দ টাকা আছে। অবিশ্যি ইতিমধ্যে সুধন্যের টাকাটা সে দিয়ে দিয়েছে,—গরীব মানুষের টাকা ক'দিন আর আটকে রাখা যায়! জমিদারকেও এক কিস্তিতে পঁচিশ টাকা দিয়েছে। টাকাগুলো যখন হাতছাড়া কোরছিল তখন দিন কয়েক বেশ লাভ হচ্ছিল। কিন্তু তারপরেই ডায়মণ্ড হারবারের ইলিশের মরশুম লেগে লাভ-টাভ শিকেয় উঠল। ফলে পুঁজি ক্রমশঃ ক্ষয় পেতে পেতে আজকে চোদ্দ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অনেকটা এই কারণেই কারবার গুটিয়ে ফেলতে হল, এত কম পুঁজিতে কী আর মাছের কারবার চলে!

অবিশ্যি এ-সময়টা কারবারের টাকার থেকে সংসার খরচের জন্য টাকা টানতে হয়েছে তাকে। সে তো স্বাভাবিক,—তাদের তো আর জমানো পুঁজি থাকে না যে তাই দিয়ে সংসার চলবে? আর, যে-বদনামটা তাদের সবাই দেয়,—তাড়ী মদেও কিছু খরচা হয়েছে। লোকে অবিশ্যি শুনলে নিন্দা করবে, তা করুক। তাই বলে সেই হাড়-কিপ্টেদের মত প্রতিটি পয়সা হিসাব করে খরচ করতে পারবে না অটবী। মানুষের জন্যই টাকা, টাকার জন্য তো মানুষ নয়।

আশ্চর্য, দিন দু'একের মধ্যেই জমিদার টের পেয়ে গেলেন যে অটবী কাজ ছেড়ে দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ অটবীর কাছে তলব চলে গেল।

অটবী যখন কাছারি ঘরে এল, তখন জমিদার তার পরামর্শ-ঘরে কার সঙ্গে গোপন আলাপে ব্যস্ত। নায়েব সুমন্তবাবু তাকে দেখেই একগাল হেসে সম্বর্ধনা জানালেন, 'এসো বাগ্দীর পো, বস। তারপর ভাল তো?'

অটবী বসতে বসতে গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'ভালো।'

'তারপর চুপি চুপি বড় যে কারবার ছেড়ে দিয়েছ! খবরটাও জানাবার দরকার বোধ করলে না একবার? টাকাটা মেরে দেওয়ার মতলবটা তো ভালই করেছিলে কিন্তু সুবিধে হবে কি? কর্তাবাবু ভীষণ রেগেছেন!'

বলে সুমন্তবাবু আবার দাঁত বের করে হাসলেন। অটবীর উপর কর্তাবাবুর ভীষণ রাগার সঙ্গে সুমন্তবাবুর এতখানি খুসী হয়ে ওঠার সম্পর্ক কি, অটবী অনুমান করতে চেষ্টা করল।

'আমার ব্যাপার আমি বুঝব। আপনি আপনার কাজ করুন নায়েব মশা।'

'তোমাদের কাজই তো আমার কাজ। আমার আবার আলাদা কোন কাজ আছে নাকি?'

মিনিট কয়েক পরে জমিদার বের হয়ে অটবীকে দেখেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। নিজের গদিতে এসে বসে গড়গড়াটা হাতে তুলে নিলেন।

'মাছের কারবারটা তবে ছেড়ে দিয়েছ অটবী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তাবাবু। কারবারে বিশেষ সুবিধে হল না কিনা।'

'বুঝেছি। তা একটা খবর তো দিতে পারতে?'

'আজ্ঞে, সময় পাইনি।'

'সময় সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। টাকা শোধ দেওয়ার ব্যাপার কিনা।'

জমিদারের কথায় ঘর সুদ্ধ লোক হেসে উঠল। অটবী লাল হয়ে উঠল অপমানে। আত্মপক্ষ সমর্থনে সে যত জোরালো যুক্তিই দিক, এই মানুষদের কাছে তার কোন দাম হবে না। এদের কাছে জমিদারের বাক্যই বেদ-বাক্য।

জমিদার আবার বললেন, 'যাকগে, টাকা এনেছ তো? টাকাটা শোধ করে দে' যাও।'

'পঁচিশ টাকা তো আগেই দিয়ে দিইছি কত্তাবাবু। আর বাকী আছে পঁচিশ। দোবখুনি দিন কয়েকের মধ্যেই।'

'সুমন্ত, অটবীর হিসাবটা একবার শুনিয়ে দাও তো।'

সুমন্তবাবু বললেন, 'হিসেব আর কি? হিসেব তো মুখে-মুখেই রয়েছে। 'অটবী, তোমার কারবার কদ্দিন হয়েছে?'

'ষাট দিন।'

'একেবারে গোণা-গুনতি ষাট দিন? বেশ। তবে দাঁড়াল, দিনে এক টাকা করে ষাট দিনে ষাট টাকা লাভের বখরা, আর আসল পঞ্চাশ।—মোট হল গিয়ে একশো দশ। তার থেকে পঁচিশ বাদ দিন। মোট পঁচাশী টাকা পাওনা আছে অটবীর কাছে।'

শুনে অটবী যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'সে কি কথা বলতেছেন নায়েবমশা? পঞ্চাশ টাকা আসল তার ষাট টাকা সুদ? টাকা যখন নিইছিলাম তখন তো সুদের কোন কথাও হয়নি!'

শুনে ঘরের সবাই আর এক দফা হেসে উঠল। যেন এটা কতই অসম্ভব কথা।

জমিদারের মুখেও হাসি প্রায় আসি-আসি কোরছিল। বললেন, 'রোসো, অত ব্যস্ত হয়ো না অটবী। সুদে আমি তোমাকে টাকা দিইনি। সোনা-দানা জমি জিরেত কিছু বন্ধক রাখতে পারবে না, তোমাকে সুদে টাকা দেবে কে? এ-সব টাকা দেওয়া হয় বখরা হিসেবে। তোমার লাভের থেকে দিন এক টাকা করে দেবে এই হিসাবে। তা দিনে আট দশ টাকা করে লাভ করবে, ঝুঁকি নিয়ে টাকাটা যে দিচ্ছে তাকে মোটে একটা করে টাকা দেবে না?

দিন আট দশ টাকা লাভ! শুনতে ভালই লাগে! অটবী মনে মনে গরম হয়ে বলল, 'কিন্তু, কর্ত্তাবাবু, টাকা দেওয়ার সময় তো এসব কথা বলেননিকো।'

'কি বলেছিলাম না বলেছিলাম তা কি আমার মনে আছে? আমি নানান্ ঝামেলার মানুষ। সেইজন্য আমার সব কাজ লেখাপড়ার মধ্যে থাকে। তুমি দলীলে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়েছ,—জাল-জুয়াচুরির ব্যাপার নয়তো।'

চমৎকার কথা! কি বলেছিলেন তা বাবুর মনে নেই। দলীলে কি লেখা হয়েছিল তা তাকে কেউ পড়ে শোনায়নি। অথচ এতগুলো টাকার দায় তবু অনায়াসে তার ঘাড়ে চাপবে! জমিদার সেদিন নিজে সেধে টাকা দিয়েছিলেন তার উপকার করার জন্য। সে-কথাও বোধকরি তিনি ভুলে গিয়েছেন আজ। এত ব্যাপারের মধ্যে শুধু এইটুকুই মনে আছে যে অটবী টাকা নিয়েছিল এবং শোধ দেয়নি!

অটবীকে চুপ করে থাকতে দেখে জমিদার গরম হয়ে বললেন, 'ওঁ রকম বোকা সাজলে চলবে না অটবী। টাকা দেওয়ার সময় সব্বাই অমন বোকা সাজে। দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। দু'হপ্তা সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে টাকা শোধ করে দিয়ে যাবে। আমার বাপু পষ্ট কথা।'

অটবী গোঁজ হয়ে বসে বলল, 'কিন্তু অত টাকা আমি দোব না তো। আমি যা ন্যায্য সুদ হয় তাই দোব,—টাকায় মাসিক এক পয়সা করে।'

জমিদারের মুখের উপর এত বড় বে-আদবীর কথা শুনে উপস্থিত সবাই থ' হয়ে গেল। অটবীর পাশে বসেছিল বুড়ো গোছের এক চাষী। চুপি চুপি উপদেশের ভঙ্গীতে বলল, 'জমিদার দেব্‌তা। তার মুখের উপর অমন করে কথা বলতে হয়? ছিঃ! অত টাকা দিতে না পার, হাতে পায়ে ধরে মাপ চাও। কত্তাবাবুর দয়ার শরীল। কিছু টাকা মাপ হয়ে যাবেই।'

হ্যা, চাষী না হলে অমন বুদ্ধি হয়? পায়ের ধূলো খেয়ে খেয়েই জন্ম সার্থক কোরছে হাদারাম! অটবী তার কথায় কানও দিল না।

সুমন্তবাবু বললেন, 'আপনাকে তো আমি সব সময় বলি কত্তাবাবু, ছোটলোককে আস্কারা দিলেই মাথায় উঠে। কথাটা ঠিক কিনা দেখুন এবারে।'

'তাই দেখ্‌ছি। 'জমিদার বাবু গড়গড়ার নল টেনে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'এবারের মত মাপ করে দিলাম অটবী। আবার এরকম কথা বললে প্যায়দা ডাকিয়ে জুতিয়ে লাস করে দোব। যাও।'

অটবী উঠল। চলে যেতে যেতে বলল, 'জুতোলেই হল! অতটা সোজা নয়।'

তৎক্ষণাৎ নায়েবের সুউচ্চ আদেশে দু'জন দ
ধরল। এত লোকের মধ্যে শক্তি-প্রয়োগ নিষ্ফল বুঝে
দারোয়ান দু'জন অটবীকে পরামর্শ-ঘরে কয়েদ করে রাখল।

কিন্তু সভা ভঙ্গ হলে জমিদার তাকে ডাকিয়ে অমনি ছেড়ে
'তোরা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারিস ;
বাপের মত, আমি তা পারি না। যা, বাড়ী যা। টাকাট
মত।'

ঈশ্! কত দয়া! গাঁয়ের আর কেউ হলে হয়তো আহ্লাদে গদগদ হয়ে
উঠত। অটবী যে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অটবী ভাবল,
আচ্ছা, সে-ও দেখে নেবে, তার থেকে টাকা ইনি কী করে আদায় করেন।

দিন কয়েকের মধ্যেই অটবী একটা খুব ভাল কাজ পেয়ে গেল। তাদের
গাঁয়ের পাশেই কেষ্টবাবুর পাঁচশো বিঘার ভেড়ীতে জাওলা মাছ ধরার কাজ।
পর পর দু' সন এ-ভেড়ীতে জাওলা মাছ বিশেষ ধরা হয়নি। এ-বছর বর্ষায় জল
বেশী হয়নি ; ফাল্গুন পড়তে না পড়তেই জলে টান ধরেছে। কেষ্টবাবুর ইচ্ছা
ভেড়ী এবার ছেঁচে ফেলবেন। তাই একদিকে পাম্প বসিয়ে দিয়েছেন, আর
অন্যদিকে লোক লাগিয়ে দিয়েছেন জাওলা মাছ ধরতে। আদ্ধেক আদ্ধেক
বখড়া।

বলরামের দল ইতিপূর্বেই বেতুইওয়াড়া ভেড়ীতে জাওলা মাছ ধরার কাজে
লেগেছে। কিন্তু অটবী এত বড় একটা কাজ ধরাতে তাদের আর ঈর্ষার সীমা
রইল না। নিতাই তো দল ছেড়ে দিয়ে নানা কথায় অটবীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে
তার দলেই মিশে গেল।

বলরাম সকলকে শুনিয়ে বলতে লাগল, 'ঐ যে কথা আছে, একবার নাক
কাটলে যায় বাড়ীর বার দে' আর সাত বার নাক কাটলে যায় বাড়ীর মধ্যি দে'।
তা অটবীর হয়েছে তাই। এই কিষ্টবাবু দু'বছর আগে চাকরীতে জবাব দে'
দিইছেলো। আবার দেখ সেই কিষ্টবাবুর কাছেই কাজ লিচ্ছে। বেহায়া
আর কাকে বলে?'

অটবীও শুনে জবাব দিল, 'পয়সা লিয়ে কাজ করব, তা সে যমের বাড়ীই

..হাক,—আপিত্তটা কিসের? যারা কাজ পায় না
..য।'

..িয়েই বুঝতে পারা গেল এ-বছর ..ওলা মাছের ফলন হয়েছে
শুধু তাদের ভাগেই সোয়া মণ দেড় মণ করে মাছ হচ্ছে।
..ছে- এখানে মেয়ে-পুরুষে মিলিয়ে প্রায় চৌদ্দ পনের জন।
..নক প্রায় পাঁচ সাত টাকা করে মজুরী উঠে আসছে। ব্যাপার
. কেষ্টবাবুর মন মেজাজ দুই-ই ভারী খারাপ হয়ে গেল। দৈনিক নিয়ম-মাফিক রোজের পরিমাণ থেকে প্রত্যেকে এত বেশী পরিমাণ রোজগার করে নিচ্ছে, অথচ কিছু করারও উপায় নেই। তিনি চুক্তি বদ্ধ। বিনা অজুহাতে এদের যে ছাড়িয়ে দেবেন তারও জো নেই। একেবারে ভেড়ীর গায়ে এদের বাস, একই জমিদারের প্রজা,—হঠাৎ কিছু অন্যায় করে বসাটা নিরাপদ নয়।

মোটা টাকা আয় হওয়ায় বেতুই গাঁয়ের লোকদের ভোল একেবারে পাল্টে গেল। সন্ধ্যে হলেই তাড়ী আর কীর্তনের আসর বসতে লাগল। আসর ভাঙে সেই রাত বারোটায়। তারপর আবার ভোর চারটেয় উঠে তারা কাজে লেগে যায়। শেষ ফাল্গুনের প্রচণ্ড রোদের তাপে সারাদিন জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা মাছ ধরে। দিনের এই হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের পর রাত্রের সামান্য তিন-চার ঘণ্টা ঘুম খুবই অপ্রচুর। তবু কারও মুখে এতটুকু ক্লান্তির ছাপ নেই। যেমন খাটুনি, তেমন মজুরি পাওয়া যাচ্ছে যে। উপযুক্ত মজুরী পেলে তারা পর্বতও উল্টিয়ে ফেলতে পারে।

দু'চারদিন যেতে না যেতেই অনেকের গায়েই নতুন রেডি-মেড্ সার্ট চড়ল। ছেলে মেয়েরা বহুকাল পরে শস্তা দামের রঙ-চঙা ফ্রক-সার্ট পরে পরে নেচে বেড়াতে লাগল।

বেতুই গাঁ-এর লোকেরা যে কীরকম দাঁও মারছে সেটা কথা-প্রসঙ্গে কেষ্টবাবু সখেদে জানিয়েছিলেন নায়েব সুমন্তবাবুকে।

পরদিনই জমিদারের হুকুম এসে হাজির: অটবীর ভাগে প্রতিদিন যে মাছটা ওঠে তার আদ্ধেক কেটে রাখতে হবে জমিদারের পাওনা বাবদ। কেষ্টবাবু দায়ী থাকবেন হিসাবের জন্য।

শুনে অটবী তর্ক করতে লাগল, 'কেন বাবু, আপনি আমার মাছ কাটতে যাবেন কেন? আপনার ঠেঁয়ে আমি তো আর কিছু ধারি না!'

কেষ্টবাবু হেসে জবাব দিলেন, 'সে-সব যুক্তি পরামশ্য আমি ভালই জানি। কিন্তুক কিছু করার জো নেইকো। যে বাঘা জমিদারের রাজ্যিতে বাস,—তাঁর হুকুমের নড়নচড়ন করতে লারব বাবা।'

হ্যা হ্যা—ও-সব সাউকারী কথা অটবীর ভালই জানা আছে। এইসব জমিদার, মহাজন, ভেড়ীওলার দল, এদের নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাতে কি, গরীব মানুষদের সংগে বোঝাপাড়ার বেলায় সবাই এককাট্টা। আর গরীব লোকেরাও তেমনি বোকা-হাবার জাত। আজ ওরা কাজ বন্ধ করলে কালই আর এক দল নাচতে নাচতে আসবে কাজটা ধরতে। বাধা দিতে গেলে খুনোখুনি বেধে যেতে পারে। গরীব জাত কি সাধে মার খায়?

অটবী ঠিক করল তার দল এখানে কাজ করবে, কিন্তু সে এ-কাজ ছেড়ে দেবে। এখন চারদিকে জাওলা মাছ ধরার হিড়িক। ভাল কাজের লোক বলে তার প্রসিদ্ধিও আছে। কাজেই আর কোনোখানে কাজ পেতে তাকে খুব বেগ পেতে হবে না।

মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করে সেদিন দুপুরেই অটবী কাজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমেই একটা গোপন তাড়ীখানায় গিয়ে খানিকটা তাড়া খেয়ে নিল। তারপর যাদবপুরে এসেই ঢুকল একটা মিষ্টির দোকানে। বেশ চন্‌চনে খিদে লেগেছিল পেটে, আর দোকানীও বেশ গরম গরম জিলিপি ভাজছিল।

এক দমে টাকাখানেকের, অর্থাৎ প্রায় পো তিনেক, জিলিপি খেয়ে ফেলল অটবী। এবারে পেটটা একটু সুস্থির হওয়ায় চারদিকে তাকিয়ে দেখল।

বাবুর ভেড়ীর সেই ছোকড়া কর্মচারিটিও দেখি জিলিপি খাচ্ছে এক কোনে বসে!

অটবীকে দেখেই ছোকড়া বলল, 'অটবীদা, রাক্কস নাকি গো তুমি! অতগুনো জিলিপি খেলে, পেটে ধরল?'

'তুই ক'খানা খেইছিস?'

'আমি দাদা গরীব নোক। মাত্তর চারখানা খেয়েছি।'

এই ছোকড়াটাকে অটবী মোটে দেখতে পারে না তার স্বার্থপর কৃপণ স্বভাবের জন্য। পঁচিশ টাকা মাইনে পায়, খাওয়া-দাওয়া ছাড়া। বে' থা করেনি। কিন্তু একটা পয়সা বের করে কার সাধ্য ছোকড়ার হাত থেকে! তাড়ী পর্যন্ত নিজের পয়সায় কিনে খায় না। কাজেই এমন লোককে দেখানো দরকার কেমন করে খরচ করতে হয়।

'পোড়াকপাল! কি করে খেতে হয় তাও শিখিসনি? দাও তো দোকানী, একে আধসের জিলিপি দাও।'

তা অন্যে যদি দেয় তো ছোকড়া বেশ খেতে পারে দেখা গেল। ছোকড়া খেতে থাকবে, অটবীকে খাওয়া দেখতে হবে অগত্যা সেও গোটা ষোল নিম্‌কি নিয়ে চিবুতে লাগল।

ঠিক এমনি সময় চুপড়ি মাথায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল পরী। অটবী ডাক দিতেই পরী দাঁড়িয়ে পড়ে তার দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে ফেলল। ঠিক এই সময় পরীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা ভারী ভাল লাগল অটবীর কাছে। এই দুপুরবেলা রাজ্যের এলোমেলো চিন্তা তার মনে ভীড় করে এসেছিল। কিন্তু পরীর সঙ্গেও যে দেখা হতে পারে, এমন কথা একবারও মনে আসেনি। অথচ, আশ্চর্য, সেই পরীর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। না চাইতেই যা পাওয়া যায় তা বড় মিষ্টি।

'পৈরী ভাই, এট্টুকুন ডেঁইড়ে যাও। আমি এক্ষুনি এসব।' বলে অটবী তার অবশিষ্ট নিম্‌কির প্লেটটা ছোক্‌ড়াটার দিকে এগিয়ে দিয়ে দোকানীকে দামটা হিসাব করে বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল।

'মাছের কারবার ছেড়ে দিলে?' পরী হাট্‌তে হাট্‌তে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঃ,' অটবী তাচ্ছিল্যের সুরে বলল। তারপরে নিজের দর বাড়ানোর জন্য যোগ করল, 'ঘরের কাছে একটা ভাল কাজ পেয়ে গেলাম। দিনে আট দশ টাকা করে হয়ে যাচ্ছে। খাটুনি কম। তাই ক্যানিং ফ্যানিং যাওয়া ছেড়ে দিলাম। কি বল গো, অন্যায় করিচি?'

পরী তৎক্ষণাৎ ঈর্ষান্বিত হয়ে বলল, 'অমন কাজ পেলে তো আমিও এক্ষুনি যাই। পোড়া মাছের কাজে এবার আর অস নেইকো।'

ফলে, যা স্বাভাবিক, পরীকে তৎক্ষণাৎ কাজ দেওয়ার দায়িত্ব নিল অটবী। এই মেয়েটা এক সময়ে অটবীর মাছ বিক্রি করে দিয়েছে। কাজেই একে জানানো বিশেষ প্রয়োজন যে অটবীও নিতান্ত যা-তা লোক নয়। তার যথেষ্ঠ প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে জায়গা বিশেষ।

অটবী যে কাজ ছেড়ে দেবে বলে ঠিক করেছিল, তখন উত্তেজনার মুখে সে কথাটা একেবারে মনে ছিল না। যখন মনে পড়ল, তখন আর ফেরার উপায় নেই। পরীকে কাজ দিতে হলে তারও কাজে লেগে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। খেলার প্রথম বাজীতে জমিদার জিতে গেল, মনে মনে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে অটবী ভাবল।

জাওলা মাছ ধরার কাজটা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। এসব মাছ কাদার মধ্যে ঢুকে যায় অনায়াসে, তাই জালের সাহায্যে ধরা চলে না। প্রথমতঃ জলে মাছের জোরও বেশী থাকে, গা পিছল বলে হাত থেকে ফস্কেও যায় সহজে। তা ছাড়া সব জাওলা মাছেরই কোন না কোন ধরণের কাঁটা আছে। ঠিক কায়দামত না ধরতে পারলে অনায়াসে হাতে কাঁটা লেগে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে। ঘোলা জলের নিচে চোখের দৃষ্টি যায় না; কাজেই কোথায় মাছ আছে সেটা অনুমান করে নিতে হয়। এই অনুমান করার ব্যাপারটাও অভিজ্ঞতা ছাড়া হয় না। এই সব কারণেই এসব অঞ্চলে জাওলা মাছ ধরা হয় গরমের দিনে যখন জল শুকিয়ে আসে।

অটবীর তাই আশঙ্কা ছিল যে মাছ ধরার কাজে পরী হয় তো সুবিধা করতে পারবে না। যদি না পারে তবে তাকে দিয়ে কী করানো যাবে অটবী তাও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল। পরীকে তাহলে সে রাধার সঙ্গে বাজারে পাঠাবে মাছ বিক্রির কাজে। এক মন দেড় মন করে মাছ হচ্ছে প্রতিদিন। এতটা মাছ খুচরো বিক্রি করার জন্য রাধার সঙ্গে আরও দুটো বৌ যায়। সেই দু'জনের একজনের বদলে পরীকে পাঠানো যাবে অনায়াসে। এইভাবে এক বেলা কাটবে। তারপর বিকেল বেলাটায় যা হোক কিছু কাজ দিলেই চলবে।

বাজারে যাওয়ায় পরীর এমন কিছু আপত্তি ছিল না। কিন্তু মাছের প্রাচর্য

দেখে তার সখ হল, সেও মাছ ধরবে। ধরবে তো ধরুক,—সে যদি নিজে ইচ্ছে করে লোক হাসায় তবে অটবী কি করতে পারে ?

কিন্তু পরীর প্রথম দু' একদিনের মাছ ধরা দেখে দলের সকলে তো বটেই এমন কি অটবী পর্যন্ত অবাক না হয়ে পারল না। যেমন তার অনুমান শক্তি, তেমনি তার হাতের অব্যর্থ কৌশল। দেখে মনে হয় এ-কাজে তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। অথচ পরী কাজে নেমেছে মাত্র বছর দু' এক হল। তাও তো আর সে সারা বছর ধরেই জাওলা মাছ ধরার কাজ করেনি। বছরের মাত্র একটা সময়েই এ-কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়। তাদের জীবন-যাত্রার ধারাটাই এমনি যে ঋতু ভেদে বিভিন্ন কাজে হাত দিতে হয় তাদের। তবু হাতের কাজে এমন একটা সহজাত নৈপুণ্য আছে পরীর, যে সামান্য অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সে অনায়াসে অভিজ্ঞদেরও ছাড়িয়ে গেল।

বাইরের একটি মেয়েকে কাজে নেওয়ার ব্যাপারে দলের অনেকেরই আপত্তি ছিল। বিশেষ করে পরীকে দেখেই একটি সুপক্ক মাকাল ফল ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয়নি। পরী তার কাজের গুণে সকলের বিরক্ত মুখে হাসি ফিরিয়ে আনল। যোগ্যতা ছাড়াও তার মিষ্টি হাসি আর অমায়িক কথার সম্পদ তো ছিলই। কাজেই দু'চার দিনের মধ্যেই পরী জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এমন কি মাছ ধরার ব্যাপারে কোন পরামর্শের দরকার হলে অনেকে অটবীর কাছে না গিয়ে পরীর কাছে যেতে সুরু করল।

পরীকে যে অটবী নিছক চোখের মোহে ভুলে পছন্দ করে আনেনি, সে যে দলে নেওয়ার মত একটি মেয়ে এ কথা বুঝতে পেরে দলের লোক অটবীকে ক্ষমা করল। এমন-কি রাধা পর্যন্ত অটবীর পছন্দের প্রশংসা করল। তবু অটবী খুব খুসী হতে পারল না পরীর উপর সে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল।

সেদিন এক কাণ্ড হল। সন্ধ্যা বেলা সবাই কাজকর্ম শেষ করে গায়ের কাদা-টাদা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছে। কেবল অটবী একটু পিছিয়ে পড়েছে। ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গিয়েছে তার। একটা বিড়ি ধরিয়ে বাঁধের উপর দিয়ে হেটে চলেছে, পিছন থেকে কে ডেকে উঠল, 'বাগদীর পো, এট্টু ডেঁইড়ে যাও না। এত তাড়া কিসের ?'

পিছনে তাকিয়ে অটবী দেখল, পরী।

'কি হল গো তোমার? এখনো অওয়ানা দাওনি যে বড়?'

'কী এনেছি দেখবে 'সো।' বলে পরী অটবীর হাত ধরে তাকে নিয়ে বাঁধের পাশের ঘাসের উপর বসল। তার এক হাতে একটা ঢাকনা-সুদ্ধ হাড়ি ছিল। ঢাকনা খুলে দেখালো ভিতরে জাওলা মাছ খলবল কোরছে। অন্ততঃ চার পাঁচ সের মাছ হবে।

অটবী জিজ্ঞেস করল, 'এ মাছ কোথায় পেলে?'

'সইরে রেখেছিলাম।'

'কাউকে না জানিয়ে?'

'হ্যা গো।'

'চুরি করেছ? তুমি তো তবে চোর?'

এ অপবাদ শুনে মুহূর্তে পরীর হাসিমুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

'চুরি তো তোমরাও কর। আমি চুরি করলেই বুঝি দোষ হয়?'

অটবী রেগে বলল, 'ভেড়ীওলাদের থে' যত খুসী চুরি কর না,—কে নিষেধ কোরছে? কিন্তু তাই বলে দলের নোকদের না জাইনে চুরি করা? সে বড় দোষ! আমরা কক্ষনো তেমন চুরি করি না।'

লোভে পড়ে পরী চুরি করেছিল। ভেবেছিল, অটবীকে দেখালে খুসী হবে। তাকে কিছু ভাগ দেবে বলেও মনে মনে তৈরী ছিল। কিন্তু অটবী যে অভিযোগ আনল তারপর আর তেমন প্রস্তাবও করা যায় না। দোষটা কোথায় হয়েছে বুঝতে পেরে লজ্জায় অপমানে পরীর চোখে জল এল। বলল, 'মাছগুলো তবে জলে ছেড়ে দে' এসি? কি বল্‌ছ গো?'

'কেন? এনেছ যখন, নে' যাও। ভবিষ্যতে আর কখনো এমন করোনি।' অটবীর স্বর গম্ভীর, ভৎর্সনা মাখানো।

পরী এবার তার হাত দু'খানা নিজের দু হাতের মধ্যে নিয়ে ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল, 'আগ করলে? আমি কিন্তু না বুঝে দোষ করেছি।'

অটবী দেখল সদাহাস্যময়ী মুখরা পরীর চোখে জল। তার জলে ভেজা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শের মধ্যে কিসের যেন আকুলতা। আর তার ফলে এতদিন

এত ঘনিষ্ঠতার ফলেও যা ঘটেনি, যা তার মনেও রেখাপাত করেনি, আজ তাই হল। পরীর প্রতি একটা তীব্র কামনা জাগ্রত হল অটবীর মনে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পরীকে সে জড়িয়ে ধরল আর তার চওড়া মুখের সর্বত্র হিংস্রভাবে চুমু দিতে লাগল।

তাদের মধ্যে ব্যাপারটা সাধারণতঃ এই ধরনেরই হয়। মেয়ে-পুরুষের মধ্যে মেলা মেশা অনেক বেশী অবাধ। কিন্তু প্রেম-ট্রেম জাতীয় দুর্ঘটনা খুব কদাচিৎ-ই ঘটে। ঘটলে জিনিষটা প্রায়ই সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। মারামারি এমন-কি, খুনোখুনি পর্য্যন্ত ঘটে অনায়াসে।

অটবী একটু ঢিল দিতেই পরী জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

'ছিঃ! এর'ম করতে নেই মাঝির পো। তোমার ঘরে একটা বৌ আছে, মোর ঘরে একটা ভাতার আছে।' পরী বলল, নিরুত্তেজ গলায়, কিন্তু অদ্ভুৎ দৃঢ়তা তার কণ্ঠস্বরে।

অটবীর তৎক্ষণাৎ তার নিজের বৌ-এর কথা মনে পড়ে গেল। তার বৌকে মারতে গেলেও সে এমনিভাবে আপত্তি জানায়। সে আপত্তি অগ্রাহ্য করার শক্তি অটবীর থাকে না। অটবীর মনে হল, রাধা আর পরীর চরিত্রে যেন অনেকখানি মিল আছে। রাধা একটু গম্ভীর, পরী একটু বাচাল, তা সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে।

সেই সন্ধ্যেবেলা এরপর তাদের মধ্যে যে-সব কথা-বার্তা হয়েছিল, অটবীর পরে আর তা মনে ছিল না। শুধু এইটুকু মনে ছিল যে, নির্জন সন্ধ্যায়, লোক-বসতির থেকে অনেক দূরে, কামনার পাত্রীকে হাতের মধ্যে পেয়েও সে তাকে ভোগ করতে পারেনি। তার সুপটু দেহে অনেক বেশী জোর ছিল, তবু পারেনি। অথচ যখন সে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিয়েছিল, তখনো তীব্র বোবা অতৃপ্ত কামনার বেগে তার শরীর মন আচ্ছন্ন ছিল।

কামনাটা অতৃপ্ত রইল বলে ব্যাপারটা নিয়ে অটবীকে অনেক বেশী মাথা ঘামাতে হল। রাত্রিবেলা পরীকে সে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখল। পরীর চরিত্রের কিছুই তার কাছে অজানা নেই। আয়নায় যেমন মানুষের

চেহারার সবটুকুই দেখা যায়, তেমনিভাবে সে পরীর অন্তরের চেহারার সবটুকু দেখতে পাচ্ছে।

প্রথমতঃ, পরী জাতি-শত্রু, সে জমিদার-মহাজন-ভেড়ীওয়ালাদের স্বার্থের জন্য নিজের জাতের লোকদের ক্ষতি করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পরী হাল্কা স্বভাবের মেয়ে, বড্ড হাসে আর কথা বলে, যাকে বলে ফাজিল। তৃতীয়তঃ, পরীর চারিত্রিক দোষ আছে; সে তার বিয়ে-করা স্বামীকে ত্যাগ করে তার দেওরের সঙ্গে থাকে। চতুর্থতঃ, গুণের উপর গুণ, চুরি বিদ্যাতেও সে কম যায় না। পঞ্চমতঃ, কিন্তু পঞ্চমতর আর দরকার কি?

পরীর আগাগোড়া ব্যবহার স্মরণ করলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার পিছনে পরীর একটা অভিসন্ধিই চোখে পড়ে। নষ্ট দুষ্ট মেয়েমানুষটা অটবীর তাগড়াই চেহারা দেখে আর লোভ সামলাতে পারেনি। সেইজন্য গত ক'মাস ধরে জোঁকের মত লেগেছিল অটবীর পিছনে। বাঁধের ধারে পরী যে অত বাধা দিয়েছিল সেটা নিছক ছল মাত্র, নিজের দাম বাড়ানোর অপকৌশল মাত্র। এতটা বয়স হল অটবীর, এইটুকুনও কি আর বুঝতে পারে না সে?

তা যে নষ্ট মেয়েমানুষ পরপুরুষের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই আনন্দ পায়, তাকে সে আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা প্রচুর পরিমানেই রাখে অটবী। যে নিজেকে নষ্ট করতে চায়, অটবী সামান্য একটু সাহায্য করে তাকে নষ্ট করবে। এতে দোষের কী আছে? ভাগবতকাকার মত অত ধর্মাধর্মের বাতিক তার নেই। ঘরে বৌ আছে—তাতে কী এমন অসুবিধাটা হচ্ছে? বৌকে তো সে তাড়িয়ে দিচ্ছে না; আর কোন মেয়ের সংগে সে পালিয়ে যাচ্ছে না। আর একটি মেয়েকে সে যা দেবে, তাতে তার বৌ এর কোন ক্ষতির আশংকা নেই। তার দেহে অফুরন্ত শক্তি আছে। দুটো কেন, দশটা মেয়েকে সে ষোল আনা তৃপ্তি দিতে পারে।

আর ঠিক এমন উত্তেজনার রাত্রেই রাধা তার সঙ্গে খিটিমিট বাধিয়ে বসল। তাড়ীর আসর ছেড়ে রাত অন্ততঃ বারোটার সময় ঘরে এসে ঢুকেছে। তাড়ীর নেশায় আর পরীর স্বপ্নে চোখ ঢুলু-ঢুলু। এমন সময় রাধা তার কাসুন্দী আরম্ভ করল।

'তোমার ভাগের মাছের আদ্ধেক নাকি কেষ্টবাবু কেটে রাখে ?'

অটবী বলল, 'সে তো শালা জমিদারের বজ্জাতি। দ্যাখ না, কেমন করে তাকে আক্কেল দি।'

'জমিদার কাটবে তাতে দোষ হল ? তার পাওনা গণ্ডা হক্কের টাকা সে কাটবেনি ?'

'দূর বোকা মাগী ! তার পাওনা টাকা কবে মিইটে দিইছি ! এখন কাটা হচ্ছে সুদ।'

'বাঃ টাকা ধার দিয়েছে, সুদ নিলেই বুঝি লোক খারাপ হয়ে গেল ? আর তুমি যে কারবার করে সব টাকা উইড়ে দিলে তার কি ?'

সেই তো ! মেয়ে মানুষ একমাত্র স্বামীর ছাড়া আর কারও দোষ কখনো দেখতে পায় ?

'কারবারে নোকসান গেল তার আমি কি করব ?'

'মাছের কারবারে কেউ নোকসান দেয় না, তোমার নোকসান হয়ে গেল ? অত তাড়ী-মদ খেলে নোকসান হবেনি তো কী হবে ?'

অটবী গরম হয়ে বলল, 'আত বারোটার সময় এখন ঘুমুবেনি, না, এমনি বকবকানি চলবে ?'

রাধা তৎক্ষণাৎ তার ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করল। অটবী শুয়ে পড়েছিল। তার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঠোঁটে গালে চুলে চুমু খেয়ে, ডলাই মলাই করে নাস্তানাবুদ করে তুলল। কিন্তু সেই সঙ্গে তার বাক্যবাণ বন্ধ হল না। সে তার নানা দুঃখের কাহিনী একটানা বলেই চলল। অটবীকে কিছু বললেই সে অমনি রেগে ওঠে, রাধার মনের দিকে একবার ফিরেও তাকায় না। কিন্তু রাধা তো বুড়ী হয়ে যায়নি, তার মনে কি সাধ আহ্লাদ জাগে না ? আর একখানা ঘর তার চাই,—সেখানা আবার টিনের ঘর না হলে চলবে না। বাড়ীর জায়গাটা সে ঘিরে নেবে। ভাল শাড়ী তার একখানাও নেই,—একখানা অন্ততঃ তো থাকা দরকার ভাল শাড়ী। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পয়সা জমানোর এত সখ রাধার, জানে না যে ওদের মত মানুষের হাতে পয়সা কখনো জমে না। অনেক দিন ধরে দু'আনা একআনা করে জমিয়ে

জমিয়ে রাধা ষাটটা টাকা এক জায়গা করেছিল। গত বছর অটবীর ভীষণ জ্বর হল,—দশ দিন হয়ে গেল জ্বর যায় না। শেষে প্রাণের ভয়ে ডাক্তার ডাকতে হল। তা এই গৈ-গ্রামে ডাক্তার একবার ডাকলেই ভিজিটে ওষুধে পঞ্চাশ টাকা সে আদায় করবেই। রাধার এত কষ্টে জমানো টাকা অসুখের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে গেল অনায়াসে।

তবু রাধা বুঝতে চায় না, পয়সার হিসাবের জন্য রাতদিন জ্বালাতন করে অটবীকে। এমনিতে বৌটা বেশ ভাল, খুব ভালবাসে তাকে। কিন্তু এত বকবক করে যে আজকাল তাড়ী খেতে গেলে মনে হয়, না খেলে বারো আনা পয়সা বাঁচত। তাতে খাওয়া বাদ যায় না, অনর্থক মনটা খারাপ হয়ে থাকে। যে-বৌ স্বামীর মুখের উপর কথা বলে, মনের শান্তি নষ্ট করে, তার সঙ্গে কি ঘর করা চলে ?

পরদিন পরীকে যেন আরও বেশী সুন্দর বলে মনে হল অটবীর কাছে। পরীর হাসি, পরীর কথা মনে হল যেন অপূর্ব। যখন, বেশী জলে যাওয়ার সময়, পরীকে শাড়ীটা উরু অবধি টেনে তুলতে হল, তখন অটবীর দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে পরী সলজ্জভাবে হাসল। সে-হাসির মধ্যে কি কোন গোপন ঈশারা নেই? পরীর পাখানা যেন একখানা নধর নিটোল কচি বংশদণ্ড; মাঝখানে একটা গেঁড়ো আছে, কিন্তু তা ছাড়া কোথাও একটু ভাঁজও পড়েনি।

সারাদিনের পরিশ্রমকে পরী তার হাসি দিয়ে ভুলিয়ে রাখল। একটানা উবু হয়ে কাজ করতে করতে কোমর যখন ধরে এল, তখন পরীর একটু হাসি দেখে মনে হল, ঐ হাসিটুকুর জন্য যুগ যুগ ধরে এমন পরিশ্রম করা যায়। এত সুন্দর করে হাসে না তো পরী কোনদিনও! পরীর আজ হল কি ?

সন্ধ্যেবেলা দলের লোকদের সঙ্গে অটবী গেল না। পরী যখন বিদায় নিল, সে সহজভাবে বিদায় দিল। কিন্তু পরী দৃষ্টির আড়ালে যেতেই সে পরীর যাওয়ার রাস্তাটা ধরল। তাড়াতাড়ি পথ চলে অল্প পরেই সে পরীর নাগাল পেয়ে গেল।

পিছন থেকে একটি পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে পরী দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন দিকে তাকালো। আবছা আলোতেও অটবীকে চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে রইল।

আজকে এরকম সময়ে অটবীর অভিসন্ধিটা সম্পর্কে তো ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই। পরী যদি অটবীকে না চায়, তবে এখন তার মুখে নিশ্চয়ই ক্রোধের আভাস দেখা যাবে। অটবী কাছে এসে পরীর মুখখানা ভাল করে দেখল। কৈ, রাগের কোন চিহ্ন তো সেখানে নেই। বরং পরীর মুখে বিজয়িনীর প্রসন্ন হাসি। অনেকদিনের কামনার পাত্র নিজে এসে ধরা দিলে কোন মেয়ে যে-ভাবে হাসতে পারে, সেই হাসি।

অটবী কাছে আসতেই পরী তার হাত ধরে ঘাসের উপর বসল। হাতখানা নিয়ে নিজের কোলের উপর নিয়ে নাচাতে নাচাতে পরীই প্রথম কথা বলল।

'আমাদের মিলন হবে আর জর্মে।'

অটবীর মুখটা প্রায় খুসী হয়ে উঠেছিল। পরীর কথা শুনে আবার কঠিন হয়ে এল। হিংস্র চোখ দুটো যেন জ্বলতে লাগল।

'আমি আর জর্ম মানি না।'

'মান না?' পরীর কণ্ঠে বিস্ময়।

'না। আমি আর জর্ম মানি না, ভগমান মানি না। কিছু মানি না। আমি তোমাকে চাই।'

'ছিঃ! অমন কথা বলতে নেই। ভগমান আগ করেন।'

'আমার যাতে ভাল লাগে তাতে ভগমান কেন আগ কোরবেন? কেন?'

'এত বড় একটা মরদ তুমি, তোমার কিছু কি বুদ্ধি নেইকো? যাতে অধম্ম হয় তা ভাল নাগতে নেই। পাপ হয়।'

অটবী পরীকে কাছে আকর্ষণ করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কেমন করে পাপ করতে হয় আমি তোমাকে শিইখে দি, এস।'

তাড়াহুড়ো করেও নয়, বেশী বল প্রয়োগ করেও নয়, ধীরে সুস্থে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল পরী। বিশেষ দূরে সরেও বসল না, গা ঘেঁসেই বসল।

'ছিঃ, অটবী, ছিঃ! তোমারনি ঘরে একটা ইস্তিরী আছে! আমারনি ঘরে একটা সোয়ামী আছে!'

যেন একটী দুরন্ত ছেলেকে মিষ্টি কথায় তোয়াজ করে শান্ত কোরছে পরী। এত কায়দা শিখল কোত্থেকে পরী, মাত্র বছর বিশেক বয়সের একটি মেয়ে!

আর তেমনি গোঁয়ার অবুঝের মত তর্ক করতে লাগল অটবী।

'বাজে কথা বলে আমাকে ভুলাবি পৈরী? অমনি কাঁচা ছেলে পেয়েছিস্ মোকে? তুই তো দেওরের সঙ্গে থাকিস,—সে আবার সোয়ামী হলো কী করে?'

'লয় কেন? সে মোকে ভাত কাপড় দিচ্ছে। পঞ্চায়েৎ মেনে লিয়েছে তাকে সোয়ামী বলে। তবে আর দোষটা থাকল কোথায় বল?'

এমনি ধরণের তর্ক চলল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। শেষে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে অটবীর অসহ্য লেগে ওঠায় বলল, 'যা, যা মাগী, সর যা। তোর মত মাগীর কে তোয়াক্কা করে রে? তোর মত মাগী গণ্ডায় গণ্ডায় পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে অটবীর চন্নামেত্তর জন্যি। যা এখন, পালা।'

পরী যেন ধৈর্যের অবতার। এত কথার পরেও যাওয়ার সময় বলল, 'আগ করো নি, নক্ষীটি। কাল আবার এস্‌ব।'

আবছা আলোয় অটবী দেখতে পেল না যে পরীর চোখে জল চিক্ চিক্ কোরছে।

এরপর যতদিন পর্যন্ত তাদের জাওলা মাছ ধরার কাজটা চলল, অটবী আর পরীর সান্ধ্য-বিহারটা রোজকার অভ্যেসের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল। দলের লোকদের অটবী জানালো, পরী নাকি একদিন পথে ভয় পেয়েছিল, তাই তাকে সে খানিকদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে যায়। ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে কোন অশোভন কৌতূহল সৃষ্টি করল না।

অটবী বুদ্ধিমান মানুষ। পর পর দু'দিন পরীর থেকে বাধা পেয়ে অটবী বুঝেছিল, এ মেয়ে খুব সহজ-লভ্য নয়। উচিত অনুচিত সম্বন্ধে এ-মেয়ের একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। এবং সে-ধারণার থেকে তাকে টলানো সহজ নয়। এ-কথাটা বোঝার পর থেকে অটবীর উচিৎ ছিল আলগোছে সরে যাওয়া। একটা মাগীর ন্যাজে সের সের তেল মালিশ করার মত অত সময় কোথায় অটবীর? তা ছাড়া অত তেল মাখামাখি সে ভাল পারেও না, কাঠ-খোট্টা গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ সে।

অথচ পরীর চিন্তাকে তো কৈ সে তাড়াতে পারছে না। রাতদিন সব সময়

তার সারা মন জুড়ে রয়েছে ঐ একটি তুচ্ছ মেয়ে। অন্যমনস্কভাবে হয়তো কিছু ভাবছে ; হঠাৎ সচেতন হয়ে লক্ষ্য করে দেখে সে ভাবছে পরীর কথা। কী আশ্চর্য ব্যাপার। এমন তো হয়নি কোনদিন অটবীর জীবনে ! সে তো বিয়ে করেছে—কৈ বৌর চিন্তা কোনদিন তাকে এমন করে পেয়ে বসেনি ! কী আছে এই মেয়েটার মধ্যে ; অসাধারণ এমন কী আছে ?

অটবী বুঝেছিল, পরীকে হঠাৎ-ই পাওয়া যাবে না। তার জন্য তাকে অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। ততদিন পর্যন্ত পরীর সঙ্গে কথা বলতে হবে, শুধু কথা। আশ্চর্য, কী ভালই যে লাগে পরীর সঙ্গে কথা বলতে ! তবে সে বিশ্বাস করে, একদিন না একদিন পরীর সঙ্গে তার মিলন হবে ; পরী নিশ্চয়ই ধরা দেবে তার কাছে। এইখানটাতেই তার সঙ্গে পরীর চিন্তাধারার তফাৎ। পরী জানে, এ জন্মে তাদের মধ্যে মিলন হতে পারে না।

সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেকের অবসর-যাপনের জন্য সারাদিন অটবী ঘণ্টা গুনতে থাকে। কাজে যে অমনোযোগ দেয় তা নয়। বরং কাজ যে আনন্দের সঙ্গে আরও ভাল করে গুছিয়ে করে তা শুধু কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলাটা আসবে এই প্রত্যাশায়। আর সেই সন্ধ্যাবেলা কতরকমের গল্পই যে চলে অটবী আর পরীর মধ্যে।

সেদিন অটবী বলছিল, 'আমি এত করে তোকে খাওয়াতে চেয়েছি, আর তুই কেবল পাইলে পাইলে বেইরেছিস। কেন তা তখন বুঝতে পারিনি। এখন যেন এট্টু এট্টু বুঝতেছি।'

'কি বুঝতেছ ?' পরী কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল।

'পাছে আমার পয়সায় খেয়ে একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়ে যাস্ এই ভয়ে তখন খেতে চাস্‌নি।'

'অত শত বুঝিনি। তবে তোমার হাতে খেতে কেমন বড্ড ভয় ভয় করত। আর কাউকে কখনো ভয় করিনি, শুধু তোমাকে বড্ড ভয় হত।'

'কেনগো, আমার মধ্যে কি আছে ?'

'জানিনি। কিন্তু মনে হয় আর সকলের থেকে তুই আলেদা।'

পরী অটবীকে কখনো 'তুই' বলে, কখনো 'তুমি' বলে।

পরীর এইসব কথা থেকে অটবী বুঝতে পারে পরী সেই সুরু থেকে তাকে বিশেষ চোখে দ্যাখে। এ কথা ভেবে একটু আত্মপ্রসাদ বোধ করে বৈকি অটবী। একজন মানুষের পিছনে পিছনে সে ঘুরছে শুধু নিজের গরজে, অপর পক্ষের কোন গরজ নেই, এ-কথা ভাবতে কি ভাল লাগে ?

অটবীর এমন বেয়াড়া স্বভাব, মাঝে মাঝে এমন সব প্রশ্ন করে যে, জবাব দেবে কি, প্রশ্ন শুনেই পরী লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু পরী অস্বস্তি বোধ কোরছে বলেই যে অটবী থেমে যাবে এমন ভালমানুষ সে নয়। লজ্জিত পরীর থেকে জবাব আদায় করে তবে সে ছাড়বে। পরীর জীবনের যা কিছু ঘটনা সবই জানার নাকি অধিকার আছে অটবীর, কোন কথা এড়িয়ে যাওয়ার বা না জানানোর মত পরীর যে থাকতে পারে, তা সে মানতে রাজী নয়।

স্বভাবতঃই এমন অনেক আলোচনা তাদের মধ্যে হয় যা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা চলে না। একটি খুব মোলায়েম ধরণের আলোচনার নমুনা দেওয়া যাক।

একদিন অটবী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা পৈরী, তোর পেথম সোয়ামী আর দ্বিতীয় সোয়ামী,—এই দু'জনের মধ্যে তোর কাকে বেশী ভাল লাগে ?'

প্রশ্ন শুনে পরী হাসতে লাগল।

'তাও তোর জানা দরকার নাকি ?'

'দরকার।'

'তবে বলি শোন্,' 'বলে পরী দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, 'ছোটজনকে।'

'কেমন পছন্দ গো তোর পৈরী রাণী ? বড়জন কত বুদ্ধিমান, সোন্দর, পয়সাওলা নোক ! আর ছোটটা তো মুক্ষু, গোঁয়ার ! তুই-ই তো বলতেছিলি, তোকে তো মার-ধরও করে ! লয় ?'

'মারে আবার না ? অক্ত বের করে দেয়।'

'তবু তোর তাকে পছন্দ ? তার দেহের ওজোন বেশী বলে বুঝি ? না, না,—ও বুঝেছি,—সে বয়সে জোয়ান বলে, লয় ?'

পরী মুখে কাপড় গুঁজে খিল্ খিল করে হাসতে থাকে।

অটবী হাসিতে যোগ দেয় না, তবে তার মুখ দেখে বোঝা যায় সে আমোদ পাচ্ছে।

'আচ্ছা পৈরী, একটা কথা জিজ্ঞেস করলে জবাব দিবি?'

'আগে বল, কি কথা।'

'কাকে তোর বেশী ভাল লাগে,—ছোটজনকে না, আমাকে?'

'তোমাকে।'

অটবী খুসী হয়ে হাত দিয়ে বেষ্টন করে পরীকে কোলের কাছে টেনে আনল।

'আমাকে যদি বেশী ভাল লাগে, তবে মোর কাছে ধরা দিচ্ছিস নি কেন?' পেইলে বেড়াচ্ছিস্ কেন?'

'তো কি করতে বলছিস্ মোকে? সম্সারে থাকতে গেলে সম্সারের নিয়ম মানতে হবে তো? আমরা মুনিষ্যজাত,—পশুপক্ষীর মত যার তার সঙ্গে লেগে যেতে পারবনি তো।'

'মুনিষ্যজাত হল তোর গিয়ে পিথিমীর মধ্যে সবচেয়ে নীরস জাত। তার কথা মোটে বলবিনি মোর কাছে।' অটবী বলল এমনভাবে যেন সে তত্ত্ব কথা শোনাচ্ছে।

'ছিঃ, ও-কথা বলতে নেইকো। ভগমান সক্কলের শেষে মুনিষ ছিষ্টি করেছেন। পশু-পক্ষীর চেয়ে মুনিষ সবচেয়ে ভাল।'

তুই থাম্ মাগী, মানুষের অত বাখ্যান আর শুনতে চাই নি। জীবন ভরে মানুষ দেখতে দেখতে ঘেন্না ধরে গেছে। মুনিষের চেয়ে পশু ভাল, পশুর চেয়ে পক্ষী আরও ভাল। কেমন সুন্দর আকাশে উড়ে বেড়ায়, ঝগড়া নেই, হিংসে নেই, কেউ কারও ক্ষেতি করে না, কেউ কাউকে ঠই্‌কে বড়নোক হতে চায় না।'

বলতে বলতে অটবী উত্তেজিত হয়ে উঠল। পরী অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এ মানুষটা জীবনে এমন কী দুঃখ পেয়েছে, যার জন্য সে সমস্ত মনুষ্য জাতটাকে ঘৃণা কোরছে? মানুষের খারাপ দিকটাই কি শুধু সে দেখেছে! ভাল কিছু কি দেখতে পায়নি? পরীর চেয়েও অটবী কি জীবনে

বেশী দাগা পেয়েছে? এত দুঃখ পেয়েও তবু কৈ পরী তো সমস্ত মানুষের উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেনি?

'সমস্ত জেতের উপর তোমার ক্রোধ, অটবী? বাপরে! কেন, সকলেই কি তোমার ক্ষেতি করেছে নাকি গো?' পরী প্রশ্ন করল।

অটবী বলল, 'এমন কাউকে আজ তক দেখলাম না পৈরী, যে জো পেয়েও ক্ষেতি না করে ছেড়ে দেয়। আমার অবিশ্যি কেউ খুব ক্ষেতি করতে পারেনি, আমি খুব শক্ত নোক বলে। তোকে ঘর থে' তাইড়ে দেইছিল, মোকে পারেনি। কিন্তুক চেষ্টার ত্রুটি করেনি। এই যে মোদের জমিদার দেখ্তেছিস্, এ খুব সামান্যি মুনিষ ছেল। মোদের বাপ-দাদারা জান দিয়ে জেল খেটে, দাঙ্গা-হাঙ্গাম করে একে জমিদার বাইনে দিয়েছে। আর আজ দেখ্, সে শালা দিব্বি তাইকেয় ঠেস্ দে' বসে মোচে তা দিচ্ছে আর গড়গড়া টান্তেছে, আর বল্তেছে, মোর পাযে মাতা ঘস, লয় তো মাথা কেটে লোব! আর মোদের হাল দেখ্তেছিস্,—দশ বিঘে জমি দেবে বলে কড়াল করেছিল শালা জমিদার, এক ছটাকও দেয়নি। খেট্তি খেট্তি মোদের জান যাচ্ছে। তাতেও আপিত্য ছিলনি। কিন্তুক তাতেও পেট ভরতেছে না। আর মোদের জাতি-ভাইএর চরিত্তিরের কথা শুন্বি? ঘেন্নায় মরে যাই বলতে। সেই জমিদারের পা চাট্তেছে সকলে, আর নিজেদের মধ্যে খেয়ো-খেয়ি কত্তেছে।'

এ-সব কথার প্রতিবাদ করা শক্ত। পরী প্রতিবাদ করতে চাইলেও যুক্তি খুঁজে পেল না। বলল, 'তা কি করবে বল? সম্সারের নিয়মই এমনি।'

অটবী উল্লসিত হয়ে বলল, 'পথে এস বাছাধন। আমিও তাই বল্তেছিলাম, মুনিষ জেতের নিয়মই এই। একদল আছে যারা ঠক, জোচ্চোর, সয়তান। আর একদল আছে যারা ভীরু, মুক্ষু, বোকা। এক দল ঠকায়, আর এক দল ঠকে, আর ভাবে, যত সুখ সব মিলবে আর জর্মে! শোন্ পৈরী, সুখ যদি পেতে চাস্ তো এই মুনিষের মেলা ছেড়ে বনে চলে যা।'

এ-সব আলোচনা পরীর মোটে ভাল লাগে না। ভারী মন খারাপ হয়ে যায়। পরীর ইচ্ছা হয়, অটবী তার কাছে শুধু সুখের গল্প করুক। অট্টালিকা, রাজবাড়ী, জাঁকজমক, অপ্সরী, কিন্নরী,—এই সব গল্প। কিন্তু অটবী তার

ধার দিয়েও যায় না। তার মনের যত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ সব সে পরীর কাছে উজাড় করে দিতে চায়। এতদিন ধরে এ-পৃথিবীতে তার যা মনে হয়েছে, যে-কথা মন-খুলে কারও কাছে সে বলতে পারেনি, আজ সেই সব রাশি রাশি দুঃখ আর রাগ আর ক্ষোভের কথা বলার মত একটি লোক সে যেন পেয়েছে। বলতে বলতে অটবীর কাছে পৃথিবীর রূপটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতদিন যেটা ছিল শুধু অস্পষ্ট অনুভূতির ব্যাপার, কথায় প্রকাশ করতে গিয়ে আজ সেইটে তার বুদ্ধির কাছে যেন ধরা দিয়েছে। পরীকে ভালবাসতে পেরে নিজেকে আজ যেন সে আরও সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করতে পারছে।

পরদিন কথায় কথায় আবার ঠিক সেই একই প্রসঙ্গ এসে পড়ল। দোষটা পরীরই, পরী পরে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তখন আর অটবীকে ফেরায় কে?

পরী বলেছিল, 'আমাদের মনসাপোতার মালিক খুব ভাল নোক।'

'বটে? তা কী উবগারটা করেছে শুনি।'

'তা আর কম করেছে কি? গত মাসে মিন্‌সে দু' দুদিন কামাই দিল, তাও এক পয়সা মাইনে কাটলনি। সেদিন একটা মাছ দিয়েছেল, পোনা মাছ,—তা অন্তত পো আড়াই তিন ওজোন হবে। কে দেয় বল? যে যা দিয়েছে তা অস্বীকের করতে পারবনি বাবু। আমি অত নেমকহারাম লয়।'

অটবী রঙ্গ করে বলল, 'নেমকহারাম কি জন্যে হতে যাবি? তুই সাধু নোক। আর জর্মের সগগ্‌টা যাতে ফস্কে না যায় সিদিগে তোর কত নক্ষ্য!'

'যাঃ—তোর সব তাতে ঠাট্টা!'

'ঠাট্টার কথা হলে ঠাট্টা করবনি? এই সেদিন না তুই বললি, তোদের ছ' বিঘে জমি এই মুনিব লিয়ে লিয়েছে!

'বাঃ, মিন্‌সে টাকা ধার নিয়েছিল যে।'

'তাই তো বলছি। তাই জন্য বারোশো টাকার বিষয় আড়াইশো টাকায় নিকেশ হয়ে গেল!'

'তা মুনিবের কি দোষ? দলীলে যে নেখা ছেল, দু' বছরের মধ্যে টাকা শোধ না হলে জমি ছেড়ে দিতে হবে।'

'পৈরী, বুদ্ধি না থাকলে কি ঠকানো যায়? তোদের মুনিবের বুদ্ধি ছিল,

ঠইকে লিয়েছে। তোরা বোকা, ঠকেও ভাবতেছিস্, কী ভাল নোক, গরু মেরে জুতো দান করেছে।'

পরী এবার রণে ভঙ্গ দিল।

'তোমার সঙ্গে কথায় এঁটে উঠবে সে নোক জর্মায়নি।'

অটবী আবার জেরা করতে লাগল, 'আচ্ছা, বল্‌তো পরী, ভেড়ীতে মাছ জর্মায় কে?'

'ক্যানো গো—ভগমান!'

অটবী বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ভগমান না কচু! তোরা যদি হাত পা কোলে করে বসে থাক্‌তিস, তবে মাছ জর্মাত?'

'তা কেন জর্মাবে? ভগমান হাত পা দিয়েছেন খেটে খাওয়ার জন্য।'

'হু! তা বেশ, আমরা গরীবরা খাটা-খাটুনা করে মাছ তেইরী করি, তা সে-মাছের অসটা ভোগ করেন তো মুনিব। কেন গো? ভগমান তাকেও তো হাত-পা দিয়েছেন। তিনি কেন হাত পা কোলে করে বসে থেকে সব খাবেন?'

'মুনিব যে টাকা খাটায়।'

'টাকায় কি মাছ জর্মে? তুই এই সামনের জলে দশ হাজার টাকা এনে ফেল্ দিনি? কটা মাছ হয় দেখি।'

পরী খিল খিল করে হেসে উঠল।

'অটবীর যে কী কথা!'

'মোর কথা শোন্ পৈরী। এই পিথিমীতে যা কিছু জর্মে, দালান-কোঠা, কল-কারখানা, ধান-মাছ,—সব কিছু হয় গরীব নোকের গতরের খাটুনিতে। তা'পর সবটা ভোগ করে চালাক নোকে, আর বোকার দল তলানীটুকু নে' কামড়া কাম্‌ড়ি করে।'

পরী একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তা কথাটা একবারে মিথ্যে বলিসনি অটবী। কিন্তু তুমি আমি তার কী পিতিকার করতে পারি বল? সম্‌সারে যা হয়ে এসতেছে, তাই মোদের মেনে চলতে হবে।'

অটবী আবার সুরু করল, 'দ্যাখ্ পৈরী, ধান ঢেকিতে ফেলে পাড় দিসে

তবে তো চাল হয়। চাল সেদ্ধ করলে তবে তো ভাত হয়। পিথিমীতে যা কিছু দেখতে পাচ্ছিস্, গতরের খাটুনি ছাড়া তার কোনটাই হতে পারতনি।'

'সে কথাটা অব্বিশ্যি সব্বাইকে মানতে হবে।'

'তবে বল্ পৈরী, সম্‌সারের এটা কেমন নিয়ম হল যে, যারা খাটা-খাট্‌নী করে জিনিস তেইরী করল, তাদের ঘরে হা-ভাত, আর যারা কোট-প্যাণ্ট্‌লুন হেঁকে সিগরেট ফুক্‌তেছে আর ছড়ি ঘুরোচ্ছে, তাদের ঘরে নক্ষ্মী গড়াগড়ি যাচ্ছেন?'

পরীর হঠাৎ একটা যুক্তি মনে পড়ে যাওয়ায় খুসি হয়ে বলল, 'কিন্তুক, এর মধ্যে একটা কথা আছে অটবী। যাদের কথা বলছ না—যারা ছড়ি ঘুরায়, তারা মাথা খাটায় বটে। মাথার তো তুমি একটা দাম দেবে, না কি বলছ গো?'

'ছাই মাথা খাটায়! যে হাতে-কলমে কাজ করে না, সে কাজের বুঝবে কিরে যে মাথা খাটাবে? তুই মোর সঙ্গে বাজী ধর্। তোর মুনিবকে একটা ভেড়ী দে, আর মোকে একটা ভেরী দে। দু' জনারই সমান পুঁজি থাকবে। তোর মুনিবের ভেড়ীতে যা মাছের ফলন হবে, মোর ভেড়ীতে যদি তার চারগুণ ফলন না হয় তো হাত কেটে ফেলব। ওদের মাথা আছে, ওরা অপিসে কাচারীতে বসে দলীল দস্তাবেজ নকল করুক না। নেকা পড়া শিখেছে, নেকাপড়ার কাজ করুক। জমি জমা ভেড়ী সব ছেড়ে দিক মোদের হাতে। কোলকেতার বাজার মাছ দে' ঢেকে ফেলে দোব তিন বচ্ছর পরে।'

পরী হেসে বলল, 'তা কেউ তোমাদের এক ছটাক জমিও ছেড়ে দেবেনিগো, নিশ্চিন্দি থাক।'

সমাজের প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যখন অটবী কথা বলতে থাকে, পরী তর্ক করে। যখন পরী আর জবাব খুঁজে পায় না, তখন অটবীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। কী ভালই যে লাগে সেই হাসিটা! বাহাদুরি নেবার জন্য এ ধরণের কথা অটবী সঙ্গী সাথীদের মধ্যেও দু' এক সময় বলে, তারাও তারিফ করে হাসে। কিন্তু অটবীর মনে হয় পরী তার কথা যেমন করে বুঝতে পারে, যেমন করে কথাগুলোকে দাম দেয়, এমন আর কেউ পারে না।

কিন্তু রাত্রিবেলা যখন ঘুম আসতে চায় না, তখন এই বাহাদুরি নেওয়ার জন্য বলা কথাগুলি নিয়েই অটবী মনে মনে জাবর কাটতে থাকে। মনে হয়, শুধু পরীকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্যই কথাগুলো নয়। কথাগুলো সত্যিও বটে। এবং এ-সত্যটা যে এতখানি সত্য, পরীর কাছে বলার আগে তা তার কোনদিন মনেই হয়নি।

ভাবতে ভাবতে আধা-ঘুমের তন্দ্রার মধ্যে অটবীর মনে হয় চালাক লোকেরা যেন একটা ইঁদুর ধরা ফাঁদ পেতেছে, আর যত বোকার দল সেই ফাঁদে গিয়ে ধরা দিয়েছে। বোকারা তবু মনের আনন্দে আছে, ফাঁদকে তারা ফাঁদ বলেই চিনতে পারছে না। অটবীও সেই ফাঁদে ধরা পড়েছে, কিন্তু একমাত্র সেই জানে যে এটা ফাঁদ, এর থেকে পরিত্রাণ নেই।

দুপুর রাতে চিন্তাগুলো অটবীর মনে দাপাদাপি সুরু করে দেয়। সে ঘেমে ওঠে। অসহ্য একটা রাগের অনুভূতির মধ্যে তার তন্দ্রা টুটে যায়। তখন মনে পড়ে, এই ফাঁদটার মধ্যে পরীও আছে, এবং পরী আছে বলেই এর মধ্যে বাস করা চলে। হবে, হবে, পরী একদিন নিশ্চয়ই তার হবে।

এমনি করে যতদিন যেতে লাগল, ততই পরীর চিন্তা অটবীর সমস্ত প্রাণমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। পরীকে ছাড়া আর একটা দিনও তার চলবে না। এ দম্-আটকানো পৃথিবীতে এতদিন যে সে কী করে বেঁচে ছিল, কী করে হেসেছে, খেয়েছে, কাজ করেছে, আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, পরী না থাকলে এ-পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায় না।

অটবী কল্পনা-বিলাসী নয়। কিন্তু এখন যেন কল্পনা-বিলাস তাকে পেয়ে বসছে। তার যেন মনে হয়, পরীর পিছনে সে যুগ যুগ ধরে ছুটে চলেছে, তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, তার গায়ের গন্ধের ঘ্রাণ পাচ্ছে নাকে, তবু তাকে ধরতে পারছে না। এই না পাওয়ার ফলে পরী তার কাছে এক দুর্লভ মহার্ঘ সামগ্রী হয়ে দেখা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে নানারকম সংশয় এসে মনকে ব্যথিত করে। পরীকে যে সে চাইছে, তাকে সে কোথায় নিয়ে তুলবে? এমন আশ্চর্য মেয়ের জায়গা কি ঐ ভাঙ্গা ঘর! তবু যদি ঘরটার লাগা-লাগি নিরাপত্তার আশ্বাস নিয়ে থাকত খানিকটা জায়গা-জমি!

তখন বত্রিশ বছর ধরে যে সব স্বপ্ন তার মনে চকিতের জন্য উদয় হয়ে তার চোখ রাঙানিতে তখন তখনই মিলিয়ে গেছে, সেই অসম্ভব স্বপ্নগুলো ভেসে ওঠে মনে। জমি-জিরেতের স্বপ্ন, ভাল বাড়ীর স্বপ্ন, আরাম-আয়াসের স্বপ্ন। সে-সব স্বপ্ন তার জীবনে সফল হল না কেন? তার তো সামর্থ্যের অভাব ছিল না!

তারপর আবার যখন পরীর সঙ্গে দেখা হয়, তখন এই সব রাশি রাশি ক্ষোভ আর দুঃখের কথা পরীর অজস্র অজস্র হাসির তলায় চাপা পড়ে যায়।

সেদিন পরী বলল, 'আচ্ছা, তুই তো সব মুনিষকে বোকা বলে ভাবিস্, অটবী? তা আমিও তো সেই বোকাদের দলে। তবে তুই মোকে কী করে ভালবাসিস্ বল্?

অটবী হাসল।

'তবে একটা শাস্তর বলি, শোন্।'

তৎক্ষণাৎ খুসীতে পরীর চোখ নেচে উঠল। বলল, 'কিন্তুক তোমার সব আজে-বাজে গল্প বললে শুন্‌বনি তা বলে দিচ্চি। আজপুত্তুরের গল্প বলা চাই আজকে।'

'আজপুত্তুরের লয়, আজকণ্যের গল্প বলতেছি একটা, শোন্।' আচ্ছা, এই মেঘগুলো কোত্থেকে আসে জানিস্, পরী।'

'না তো।'

'তবে মেঘ কী করে হয় সেই গপ্‌প বলি, শোন।'

তারপর গ্রাম্য মানুষের উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য কল্পনা দিয়ে অটবী একটা রূপকথার গল্প বলে শোনালো। নতুন বানানো গল্প নয়। ওদের মধ্যে প্রচলিত রূপকথার গল্পগুলোই একটু অদলবদল করে গল্পটা দাঁড় করালো। মেঘের সীমার থেকে অনেক দূরে যেখানে দৃষ্টি চলে না, ছিল এক রাজ্য। সে এক আশ্চর্য রাজ্য। সেখানে সোনার তৈরী সব বাড়ীঘর রূপোর তৈরী সব রাস্তা-ঘাট, আর লাল রাংতার তৈরী গাছের থেকে হীরে মুক্তোর ফল ঝুলতে থাকে। সে দেশের সব মানুষ সুখী, কারণ সেখানে ধনী গরীবের কোন ভেদ নেই। সে দেশের যে রাজকণ্যা, সে এক আশ্চর্য ভাল আর সুন্দরী মেয়ে। সন্ধ্যা-বেলার লাল মেঘের চেয়েও লাল তার ঠোঁট আর গাল। দেশের সব লোক রাজকণ্যাকে

ভালবাসে ; কারণ এত বড় সে, তবু সে আর সকলের মত খায়, দায়, পরে। একদিন এই মেঘরাজের দেশে উপাস্থিত হল এক জীর্ণ-শীর্ণ গোলাম। রাজকন্যার যত্নে আদরে গোলাম একটু সুস্থ হয়ে তার কাহিনী বলল। সে থাকে সমুদ্রের তলায় মৎস্যরাজের দেশে। মৎস্যরাজের অনেক গোলামের মধ্যে সে একজন। তাদের দুঃখের সীমা নেই। মৎস্যরাজের আদেশ রাতদিন তাদের মাছ ধরতে হয় ; ক্লান্ত হয়ে এক মিনিট বিশ্রাম করতে গেলে পিঠে সপাসপ্ চাবুক পড়ে। তারা যে-মাছ ধরে সেই মাছ রাজা নদী-নালা দিয়ে পাঠিয়ে দেন পৃথিবীতে, কিন্তু তাদের ভুলেও কোনদিন এক টুক্‌রোও দেননা। একদিন অত্যন্ত চাবুক খেয়ে এই গোলামটির মনে বড় দুঃখ হয়েছিল। সমুদ্রের জল কেটে উপরের দিকে উঠতে উঠতে সে একেবারে উপরে ভেসে ওঠে। তখন একটি পাখী দয়া করে তাকে মেঘ-রাজ্যে নিয়ে এসেছে।

দিন যায়। রাজকন্যার যত্নে গোলামের হাড়ে মাংস লাগল, এবং সে এক পরম সুন্দর পুরুষ হয়ে উঠল। তখন রাজকন্যার সঙ্গে তার ভালবাসা হল। তাদের সুখের আর অন্ত নেই।

কিন্তু এত সুখ কপালে সইল না। পক্ষীচড়ের মুখে গোলাম কোথায় আছে জানতে পেরে মৎস্যরাজ মেঘরাজের কাছে লিখলেন, গোলামকে ফিরিয়ে না দিলে তিনি যুদ্ধযাত্রা করবেন। মেঘরাজ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ; যুদ্ধকে বড্ড ভয় করেন। বাধ্য হয়ে গোলামকে তিনি পাখীর পিঠে চড়িয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর রাজকন্যার মনে আর দুঃখের সীমা রইল না। অত্যন্ত দুঃখের সময় সে যখন জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে তখন সেই নিশ্বাসটা কালো মেঘ হয়ে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলে আর পৃথিবীতে বৃষ্টি নামে। যখন রাজার অনেক চেষ্টা যত্নে রাজকন্যার মনটা একটু শান্ত হয়, তখন তার নিশ্বাস থেকে শাদা কালো মিশানো মেঘ বেরিয়ে আসে। আর যদি কচিৎ কখনো দেশের লোকের মন ভুলানো গান শুনে রাজকন্যা হেসে উঠে, তখন সেই হাসি হাঁসের মত শাদা শাদা মেঘ হয়ে ভেসে বেড়ায় আকাশে।

শুনতে শুনতে পরীর চোখ ছল ছল করে উঠল। বলল, 'আজকন্যার তো বড় দুঃখ, অটবী !'

'এই আজকন্যে কে জানিস্, পৈরী ?'

'তুই তো বললি—মেঘকন্যে।'

'এই মেঘ-কন্যে হলি তুই, মোদের পৈরী। মেঘ-কন্যে বলেই তো বোকাদের, গরীবদের দুক্খু তুই কিছু জানিস্নি। তোর দেশে তো বোকা নেই ; চালাকরা কি করে বোকাদের পায়ের তলায় চেপে রাখে তা তুই জানিসনি ! তুই তা জান্বি কি করে ? জানিস্নি বলে তুই তা বলে বোকাদের দলের নোস্।'

শুনে পরী খিল খিল করে হেসে উঠল।

অটবী আবার বলল 'তুই যে হাসলি,—দ্যাখ্, সে হাসি হাঁস হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।'

সত্যি তখন পূব-আকাশে শাদা শাদা লাল্চে লাল্চে মেঘের আড়ালে চাঁদ উঠি-উঠি কোরছে।

পরী এবার হেসে গড়িয়ে পড়তে চাইল।

'তুই মোকে মেঘ-কন্যে বলতেছিস্ ? মোর জেবনে কত দুক্খু লুকিয়ে আছে জানিস।'

তেমনি গম্ভীর গলায় অটবী উত্তর দিল, 'কোন দুক্খু তোকে পর্শ করতে পারবেনি পৈরী। তোর মনডা সম্সারের সমস্ত নোংড়ামির উপরে।'

রুক্ষ কঠিন অটবীর মনে কল্পনা ছিল সুপ্ত। ঘুমন্তপুরী থেকে পরী জাগিয়ে তুলেছে সে-কল্পনাকে। গ্রাম্য মনের সজীব জোরালো কল্পনা এখন আপন মনে এক নতুন পরীকে গড়ে তুল্ছে।

'আর সেই গোলাম কে জানিস্ ?'

'তুই বুঝি ?'

'ঠিক ধরেছিস্। আর আর গোলামেরা জানে তারা গোলাম হয়েছে ভাগ্যদোষে। কেবল এই গোলামটা জানে, এ শুধু মৎস্যরাজের কারসাজি। জানে, কিন্তু কোন পিতিকারের পথ পায় না।'

'অটবী, তুই দুক্খু করতেছিস্ ?'

পরীর সে সহানুভূতির কথায় কান না দিয়ে অটবী বলল, 'মোর সঙ্গে না

এসে তুই ভালই করেছিস্ পৈরী। তোকে আমি তুলতাম কোথায়? মোর ঘর যে ভাঙা।'

রূপকথা যে স্বপ্নের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল, এর মধ্যেই তা ভেঙে গেল। পরী বলল, 'আমিও তো ভাঙা ঘরেই থাকি, লয়?'

'আবার ফের ভাঙা ঘরেই যদি এস্‌তে হবে, তবে ভাঙা ঘর ছাড়বি কেন? না এসে তুই ভালই করেছিস্ পৈরী।'

পরী আকুল হয়ে বলল, 'মোকে তুই তাই ভাবলি, অটবী? তোর পয়সা নেই বলে কি আমি তোর সঙ্গে এস্‌তে পারিনি?'

'তা লয়, তা লয়।' অটবী তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বলল, 'তোর মন অত ছোট লয় পৈরী,—সে আমি জানি। কিন্তুক আমি তো পুরুষ মানুষ। আমি কী করে তোকে ভাঙা ঘরে নে' তুল্‌ব! পৈরী, মোর শক্তি আছে, ক্ষ্যামতা আছে। লেখাপড়া জানিনি বটে, কারখানার কাজ পারবনি বটে। কিন্তুক আমি যা জানি, তা আমি বড় বড় কারবারীদেরও শিখিযে দিতে পারি। তবু আমি হত-দরিদ্দর।'

নিজের দুঃখের জন্য নয়, অটবীর দুঃখের জন্য পরীর বুক ফেটে যেতে লাগল। কিন্তু সেই সঙ্গে বুক দুরু দুরু করতে লাগল ভয়ে। এই বলিষ্ঠ মানুষটির শক্তি তাকে মুগ্ধ করেছে। তার নতুন ধরণের কথায় সে কৌতুক বোধ করেছে। কিন্তু তার বিরাট দুঃখ আজকে তাকে অভিভূত করে ফেলছে।

অটবী আর তার সম্পর্কটা আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে সেইভাবে তা চিরকাল থাকতে পারে না। একদিন আসবে যেদিন হয় অটবীর দাবীকে মেনে নিতে হবে, নয়তো পালিয়ে যেতে হবে। পরী কি করবে? তার যে একটা ঘর আছে, সেই ঘরে আছে তার এক পোষ্য। একেবারে অসহায়। কাঠগোঁয়ার, কিন্তু ভীষণ অসহায়। পরী ছাড়া তাকে দেখবার এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

কিন্তু অটবীর মনে যে এত দুঃখ আছে তাতো পরীর কোনদিন মনে হয়নি। অটবী বিদ্রূপ করে সমস্ত পৃথিবীকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। সেই অটবীর

মনে এত দুঃখ কেন? গরীব বলে? দেশ-সুদ্ধ লোকই তো গরীব। গরীব হওয়ার জন্য দুঃখ করার কী আছে?

আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে। শাদা, পাখীর পালকের মত নরম মেঘ-গুলোকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, দিগন্তের গাছের সারকে দু'পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে, গর্বস্ফীত চাঁদ উঠে এসেছে উপরে। চাঁদের আলো পড়েছে বাঁধের উপর, ভেড়ীর জলে। হোগলা আর নলখাগড়ার বন সেই জলের উপর চুপি-চুপি ছায়া বিস্তার করেছে। অত্যন্ত চুপে চুপে, চাঁদ যেন টের না পায়।

দিন কয়েক পরে জাওলা মাছ ধরার কাজটা শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অটবী আর পরীর কাজের জায়গাও আলাদা হয়ে গেল। অটবী আর এক জায়গায় জাওলা মাছ ধরার কাজ নিল। পরীকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু জায়গাটা একে দূর, তাতে আবার অন্য মেয়েছেলে সঙ্গে যাবে না। তাই পরীর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হল না। সে আবার মাছ কেনা-বেচার কাজে যাবে কিনা ভাবছিল। এর মধ্যে একটা ভেড়ীতে হোগল বন কাটার কাজ পেয়ে গেল। দিন মজুরীর কাজ হলে সে যেত না—মেয়েদের মজুরী মাত্র পাঁচসিকে করে। ফুরোণে কাজটা হবে বলে সে যোগ দিয়েছে, ভরসা আছে দিনে অন্ততঃ দু' টাকা আড়াই টাকা করে তুলতে পারবে।

অটবী আর পরীর দেখা সাক্ষাৎ তাই বলে বন্ধ রইল না। সারা দিনের কাজের পর রোজ তাদের দেখা হয়। যেটা সাধারণ নিয়ম, অটবীই অনেক পথ হেটে আসে পরীর সঙ্গে দেখা করতে। তারপর পরীদের গাঁয়ের ধারে গোড়ে'র খালের একটা ঝোপ-ঝাড়ে আড়াল-করা জায়গায় তারা বসে। আধ ঘণ্টার বেশী বসার সময় তাদের প্রায়ই হয় না। পরী ভয় পায়। পরীর স্বামী যদিও ভেড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টার কর্মচারী, তবুও বাড়ীটা কাছে বলে যখন তখন এসে এক একবার ঢুঁ মেরে যায়। যদি রাত্রে সন্দেহজনক সময়ে এসে কোনদিন সে পরীকে না পায় তবে অনর্থ বাধাতে ইতস্তত করবে না।

কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও পরীদের গাঁয়ে কানা-ঘুঁষা সুরু হল। প্রতিদিনই পরী তার গাঁয়ের সঙ্গীদের ছেড়ে অন্য দিকে চলে যায়, এটা

স্বভাবত-ই তাদের কৌতূহলী করে তুলল। দু' একটি অতি উৎসাহী মেয়ে পিছন থেকে পরীকে অনুসরণ করে সহজেই জানতে পারল সে আর একটি ছেলের সঙ্গে গিয়ে জোটে। তারপর জিনিষটা নিয়ে কানা ঘুঁষা সুরু হতে দেরী হল না। কানে কানে ছড়াতে ছড়াতে কথাটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল শম্ভুর কানে।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা শম্ভুর বাড়ীতে কাজের জরুরী তাড়া পড়ে গেল। ঘোর হতে না হতেই সে ম্যানেজারের থেকে ছুটি নিয়ে এসে বাড়ীতে মোতায়েন রইল।

বেশ একটু রাত হলে শম্ভু জানলা দিয়ে দেখতে পেল দূর থেকে চাঁদের আলোয় হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে গানের কলি ভাজতে ভাজতে আসছে ঘর-জালানী মেয়েটা। পা মাটীতে পড়ে কি না পড়ে এমনি অবস্থা।

দরজা খোলা, ভিতরে পিদিম জলছে। ঘরে লোক আছে বুঝতে পেরে পরী দরজার গোড়া থেকে জিজ্ঞেস করল, 'ঘরে কেরে ?'

দরজা পেরোতেই শম্ভু এসে তার আলগা-করে-জড়ানো খোপা একটানে খুলে ফেলে চুল টেনে ধরল।

'সাত-ভাতারী মাগী, এত রেতে কোথায় ছিলি বল্।'

সেদিন পরীর ভাগ্যে কিছু উত্তম মধ্যম জুটত নির্ঘাৎ। কিন্তু সময়-মত একটা কথা বলতে পেরে আশ্চর্যজনকভাবে রেহাই পেয়ে গেল।

পরী কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তা আমি কী করব ? আমার দোষ কি ? পরের কুকুর এসে পিছন থে' ঘেউ ঘেউ করবে, মরদ যদি তাইড়ে দিতে না পারে তো মাগে করবে কি ?'

শম্ভুর পৌরুষে ঘা লাগল। চুল ছেড়ে দিয়ে চাপা রোষের সঙ্গে বলল, 'কুকুর ?' কে কুকুর বল্ শিগ্‌গির হারামজাদী।'

'বল্‌ব আবার কি ? সামনা সামনি ধইরে দিতে পারি, যদি সাহস থাকে।'

'সাহস ? তার চৌদ্দ পুরুষকে তুলো ধুনো করে ছাড়ব।'

তারপর অটবী কী করে তাকে ফোঁসলাতে চেষ্টা করেছে, কী করে সে যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা কোরেছে, পরী সবিস্তারে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তার একটা মন গড়া চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিল।

পরদিন যথাসময়ে এবং যথাস্থানে অটবী আর পরী গিয়ে খালের ধারে বসল। ঝোপের মধ্যে যারা লুকিয়ে ছিল তাদের হঠাৎ অসতর্ক-ভাবে আক্রমণ করারই মতলব ছিল, কিন্তু হয়ে উঠল না। পিছন থেকে খস্‌খস্ আওয়াজ শুনে অটবী দাঁড়িয়ে উঠল। তা দেখে পরীও দাঁড়িয়ে গেল। অটবী দেখল, পরীর মুখে ভয়ের লেষও নেই, বরং চাপা হাসি যেন সে আর গোপন করতে পারছে না। তবে এই গোপন চক্রান্তের মধ্যে পরীরও হাত আছে ?

অটবী যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করল। কীল ঘুষি ফিরিয়ে দিল কিছু কিছু। কিন্তু চারজনের সঙ্গে সে একা পারবে কেন ? তা ছাড়া ওদের হাতে ছিল লাঠি। .

অটবীর মাথা থেকে রক্ত পড়ে যখন তার গায়ের জামা ভিজে উঠল, তখন পরী কাঁদতে কাঁদতে মাটীতে আছাড় খেয়ে পড়ল। শম্ভুর পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আর মেরনি গো, পায়ে পড়ি। মরে যাবে যে নোকটা।'

অটবীর প্রায়-মূর্ছিত দেহটা মাটীতে ফেলে রেখে লোকগুলো সরে এল। শম্ভু হাতের চেটোয় থু থু ছিটাতে ছিটাতে বলল, 'কুকুরকে কেমন করে শাস্তি দিতে হয় দ্যাখ্ মাগী।'

তারা চলে যাওয়ার সময় পরীকেও সঙ্গে নেওয়ার জন্য শম্ভু গিয়ে তার হাত ধরল।

হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে পরী বলল, 'হাত ছেড়ে দে বলছি। কসাই কোথাকার ! এমন করে মেরেছিস মুনিষটাকে, মরে গেল কিনা দেখতে হবেনি ?'

শুনে আর একজন সঙ্গী বলল, 'কথাটা মন্দ বলেনি শম্ভুদা। ও থাক্। মরে গিয়েছে কিনা খবরটা তো দিতে পারবে। তা' বুঝে তো লাশটা সইরে ফেলতে হবে। লাশ সুদ্ধ ধরা পড়লে তো ফ্যাসাদে পড়ে যেতে হবে।'

অগত্যা পরীকে রেখেই শম্ভুরা চলে গেল। পরী অঞ্জলি ভরে ভরে খালের থেকে জল এনে যত্ন করে অটবীর ক্ষতস্থানগুলো ধুয়ে দিল। সম্বিত ফিরে আসতেই অটবী উঠে বসল। পরী তাকে ধরে উঠতে সাহায্য করল।

'কষ্ট হচ্ছে অটবী ?' পরী জিজ্ঞেস করল।

অটবী হাত দিয়ে ঠেলে পরীকে সরিয়ে দিয়ে নিজে নিজেই উঠে দাঁড়াল।

পরী কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, 'আগ করেছ অটবী? কিন্তুক আমার কোন দোষ নেইকো।'

অটবী এবারও কোন জবাব না দিয়ে হাটতে সুরু করে দিল।

পরী আবার বলল, 'থানায় ডেইরী লিখিয়ে যেও কিন্তুক। দোষীরা শক্ত সাজা পেয়ে যাবে।'

অটবী তেমনি হাটতে হাটতে, তেমনি পরীর দিকে একবারও না তাকিয়ে শুধু বলল, 'মেয়েলোকের বিরুদ্ধে থানা-পুলিস করতে যাবনি। নিশ্চিন্তি থাক।'

পরীকে কে যেন চড় মেরে চুপ করিয়ে দিল। টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে অটবী বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে অবোধ বালিকা পরী অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল। আকাশে তখন চাঁদ উঠছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলো খালের ধারের ধবধবে সাদা বেলে মাটীর উপর নিপুণ ভাবে ঠিক পরীর চেহারার অনুরূপ একটি ছায়ামূর্তি আঁকার চেষ্টা কোরছে।

দশ

সুভদ্রা-হরণের পর মাস তিনেক কেটে গিয়েছে। ঘটনাটা এখন বলরামের কাছে অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। সুভদ্রা চলে যাওয়ার পর প্রথম প্রথম তার যা অবস্থা হয়েছিল,—ঠিক একটা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত। মনের অবস্থা এত খারাপ ছিল, অথচ মন খুলে কারও কিছু বলারও জো ছিল না। এমন বিশ্রী অবস্থাতেও মানুষ পড়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে সুভদ্রাকে, অথচ বাইরে এমন ভাব করতে হয়েছে যে লোকে যেন ভাবে সুভদ্রা চলে যাওয়াতে সে নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। গাঁয়ের লোক কানাই-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায় বড়বাবু সুভদ্রাকে কোথায় রেখেছে। অথচ জিজ্ঞাসা করবার উপায় নেই, সুভদ্রা সম্বন্ধে তার সামান্য কৌতূহলও যে আছে, লোককে তা-ও জানতে দেওয়া চলে না। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

শাস্ত্রে আছে, মহামায়ার মায়ার প্রভাবে এই জগৎ-সংসার টিঁকে আছে, না হলে সব ভেঙে-চুড়ে ছত্রখান হয়ে যেত। তা কথাটা যে ঠিক বলরাম নিজেকে দেখে তা বুঝতে পারে। না হলে, যে মেয়েমানুষটার উপর তার এতটুকু ভালবাসা ছিল না, নেহাৎ পয়সার মায়ায় যে মেয়েমানুষটার সঙ্গে সে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারছিল না, তার জন্য তার মন এত পুড়বে কেন? এতদিন যে হয়ে গেল, এখনো সুভদ্রার কথা মনে হলে বুকটা খালি খালি লাগে, মনে হয় যেন জীবনের সব-কিছুই বিস্বাদ। এ আর কিছুই না, সেই মহামায়ার মায়া।

ভাগবত কাকা বলেছে, সুভদ্রা চলে যাওয়ায় তার পক্ষে নাকি খুব ভাল হয়েছে। সুভদ্রা নাকি খুব কুলক্ষণ-যুক্ত মেয়ে, যার সঙ্গে থাকবে তারই ক্ষতি হবে। বড় বাবু যে নিয়ে গেছে, তার কী হয় তা তারা দেখতেই পাবে। তার ফাঁড়াগুলো নাকি এখন থেকে আস্তে আস্তে কেটে যাবে। এ-বছরটা অবিশ্যি বলরামের দুর্বৎসর। কিন্তু সামনের বছরে বলরামের নিশ্চয় উন্নতি হবে।

বলরাম ঠিক করেছে, তার পুকুরটাকে সে এবার জল-টল সেঁচে ফেলে ভাল

করে ঝালিয়ে-টালিয়ে রাখবে। ভগমান দিলে এই একটা পুকুর থেকেই সামনের বছর সে চাইকি পাঁচ দশ হাজার পেয়ে যেতে পারে। ভাগবত কাকার মত জ্ঞানী লোক কথাটা বলেছে, উড়িয়ে দেওয়া যায় না তো !

তবু সুভদ্রার কথা মনে পড়লে এ-সব আশার কথাতেও মনে কোন সান্ত্বনা মেলে না। মনে হয় যেন সুভদ্রা চলে যাওয়ার সময় জীবনের যা-কিছু রস, যা-কিছু আনন্দ সব সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে। শুকনো, মাছের বাঁকের মত ভারী জীবনটা বয়ে বেড়াতে বলরামের ক্লান্তির আর শেষ নেই। বলরাম কর্তব্য-পরায়ণ মানুষ, অটবীদের মত শ্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দিয়ে বেড়ায় না। শুধু নিজের সুখ সে খুঁজে বেড়ায় না কোনদিনই। তবু সেই কর্তব্য পালন করাটা আজ যেন একটা অসহ্য বোঝা হয়ে উঠেছে। তিনটি মেয়ে তার জীবনে এসেছিল, তিনজনই তাদের প্রতিনিধি রেখে গিয়েছে বলরামের সংসারে। তিনজনের মধ্যে একমাত্র বিন্দু আজও আছে তার কাছে, কারণ অমন একটা শুক্‌নো দড়ি কারও কোন দরকারে লাগবে না। বিন্দু তো নামেই মেয়েমানুষ, বলে না দিলে তাকে কেউ মেয়েমানুষ বলে চিনতেই পারবে না। তাই এ ঘাটের মড়াটা মুখের দাড়ির মত আজও তার গায়ে লেপ্টে রয়েছে। শত কামালেও যেমন দাড়ির হাত থেকে নিস্তার নেই, এ-মেয়েমানুষটার হাত থেকেও তেমনি তার নিস্তার নেই। সুভদ্রার অভাবে মনটা যখন তার দারুণ খারাপ, তখন এ-মাগীটা ভাব্‌ছে এতদিনে তার জীবনের আপদ গেল। বলরাম তো সে রকমের মানুষ নয়। শত খারাপ লাগলেও বিন্দুকে যেমন সে ফেলে দেবে না, তেমনি সুভদ্রার ছেলেটিকেও সে নিজের ছেলের মতই মানুষ করবে। এ-ছেলেটা একটু বোকা-বোকা গোছের, বড় ছেলের মত নিজের অংশ বুঝে সুঝে খেতে পারে না। এত মন-খারাপ নিয়েও বলরামকে কড়া নজর রাখতে হয় এ-ছেলেটা যাতে বঞ্চিত না হয়।

বলরামের বাড়ীটা হয়েছে যেন একদল হুলো বেড়ালের বাসস্থান। কার্তিক এক পক্ষ, লক্ষ্মী আর তার বোন আর এক পক্ষ, আর সুভদ্রার ছেলে খাঁদা হল তৃতীয় পক্ষ। এ-তিন পক্ষের মধ্যে সম্পর্কটা এমন যে কারও সঙ্গে একবার দেখা হয়ে গেলেই হল। অমনি হুলো বেড়ালের মত রোম ফুলিয়ে

তারা মারামারি হুটোপাটা লাগিয়ে বসে। আপনা আপনি মিট্‌মাট না হলে বলরামকে যেতে হয় মধ্যস্থতা করতে। মধ্যস্থতা করা মানে একে দুটো চড়, ওকে দুটো কান-মলা দেওয়া। তা মারটা স্বভাবতঃই লক্ষ্মীর ভাগেই একটু বেশী জোটে ; কারণ সেয়ানা মাগী বিন্দু আছে যার পিছনে, তাকে একটু বেশী দাবিয়ে রাখা দরকার।

কর্তব্যের অনুরোধে এত সব কাজ বলরাম করে চলেছে। কেউ তার কাজের মধ্যে কোন ত্রুটি ধরতে পারবে না। কেউ অনুমানও করতে পারবে না ঝুনো নারকেলের ছিব্‌ড়ের মত মন নিয়ে এ-সব কাজ করতে তার কতখানি বিরক্তি বোধ হয়।

তার মন এত খারাপ হওয়ার অবিশ্যি আরও একটা কারণ আছে। বড়বাবু যে সুভদ্রার সন্ধান পেয়েছে এবং তাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে, এর পিছনে বলরামের একটু ত্রুটি ছিল। বলরামই তো প্রথম নিয়ে গিয়েছিল বড়বাবুকে, বড়বাবুর স্বভাব-চরিত্তির কেমন সে-সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও। এ নিয়ে ভাগবত কাকার সঙ্গেও তার কথা হয়েছে। ভাগবত কাকা অবিশ্যি বলেছে তার কাজে কোন দোষ হয়নি। স্বয়ং রামচন্দ্র সীতাকে পরীক্ষা করে তবে ঘরে নিয়েছিলেন। বলরামও তেমনি পরীক্ষা করতে গিয়েছিল তার প্রতি সুভদ্রার ভালবাসা কতখানি প্রকৃত। তাতে দোষের কী আছে? পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, সুভদ্রার মধ্যে নিষ্ঠা বলে কোন জিনিষ নেই। তার স্বভাব যে কতখানি খারাপ নিজে পালিয়ে গিয়ে সে তার প্রমাণ দিয়েছে। কু-লোক যদি কু-পথে যায় তবে বলরাম তার জন্য অপরাধী হতে যাবে কেন?

তবু মন সব সময় যুক্তি মানে না। বড়বাবুকে সে যে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল এ আপশোষ তার কোনদিনই যাবে না। বড়বাবু না হয়ে যদি আর কেউ সুভদ্রাকে হরণ করত, তবে সে তার ত্রুটির প্রতিবিধান না করে ছাড়ত না। সে-লোক কত শক্তি ধরে তার একবার সে পরীক্ষা নিয়ে দেখত। কিন্তু বড়বাবু স্বয়ং জমিদারের ছেলে হয়েই যত গোল বাধিয়েছে। বড়বাবু অবিশ্যি চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, লম্পট,—একটা মানুষ সমস্ত গুণের আধার। কিন্তু লোকটার প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা না থাকলেও বলরাম কোনদিন তাই বলে ভুলে

যাবে না যে জমিদারের সম্মানটা তার পাওনা। ধর্ম-কর্ম একেবারে তো বিসর্জন দেয়নি বলরাম।

মনটা খারাপ বলে বলরাম সম্প্রতি ভেড়ীর কাজেও খুব ঢিল দিয়েছে। ম্যানেজার মাঝে মাঝে তড়পানি দিতে ছাড়ে না; তা সে-ও ছেড়ে কথা কইবার লোক নয়। সোজা মুখের উপর বলে দেয়, তাকে দিয়ে কাজ চলবে না বলে যদি মনে করে, তবে তাকে জবাব দিয়ে দিলেই তো পারে। সোজা কথা! ভারী না তিন পয়সার চাকরী, এ চাকরী একটা গেলে দশটা জুটিয়ে নিতে পারবে বলরাম।

ম্যানেজার শুনে জবাব দিয়েছিল, 'কিন্তু তুই যেখানেই কাজ নিবি, সেখানেই তোকে খাটতে হবে তো? না কি তারা বসিয়ে বসিয়ে টাকা দেবে?'

এর উত্তর কি তা বলরামের জানা। বলেছিল, 'তোমার এখেনে আমি বসে থাকি নাকি মানজারবাবু। আমার কাজ আমি ঠিক করে যাচ্ছি। মিছিমিছি ব্যাজড় ব্যাজড় না করে শুধু নক্ষ্য রেখে যাও সব ঠিক চলতেছে কিনা?'

যে-লোক চোখের সামনে বসে থেকে বলে, 'কোথায় আমি বসে আছি?' —তার সঙ্গে আর তর্ক করার চেষ্টা করেনি ম্যানেজার। কিন্তু সে বলরামের উপর হাড়ে হাড়ে চটে আছে তা বলরাম জানে। চটল তো বয়ে গেল!

জাওলা মাছ ধরার সময় বলরাম দিন কতক খুব খেটেছিল। ভোর ছ'টার থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সে রোদে পুড়ে পুড়ে মেয়েদের কাজে সাহায্য করেছে। সে অবিশ্যি কর্মচারী, মাছের ভাগ পাবে না। তা বলে গাঁয়ের মেয়েরা তার নিজের এলাকায় কাজ করে করে হয়রাণ হয়ে যাবে, আর সে বসে বসে তা দেখবে, তা তো হয় না। অটবীরা বড় ভেড়ীতে কাজ পেয়েছে, তারা মেয়ে-পুরুষে মিলে কাজে লেগেছে। তার এ ছোট ভেড়ীতে সকলে মিলে কাজে লাগলে কারও পোষাবে না বলে শুধু মেয়েরাই কাজ কোরছে। কিন্তু মেয়েদের কাজে লাগালে শক্ত কাজগুলো করার জন্য একজন ব্যাটা ছেলে সঙ্গে থাকা দরকার। কাজেই বলরামকে কাজে লাগতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে।

বলরাম এত খাটছে দেখেও ম্যানেজার খুসী নয়। সে বলে বেড়াচ্ছে, লাভের গন্ধ পেয়েছে বলে বলরাম এবার জলে হাত দিয়েছে। বৌ বিন্দু তো যায় মাছটা বিক্রি করতে, ভেড়ীওলার ভাগের মাছও তাকে বিক্রি করতে দেওয়া হয়। বেশ লাভের ব্যাপার বলেই নাকি বলরামের এত উৎসাহ। তাছাড়া নিজে যে মাছটা ধরে তার ভাগ সে পায় না বটে, তবে তার কিছুটা কি আর সে আগে ভাগে সরিয়ে রাখে না ? নিশ্চয় রাখে ; বলরামকে অত সৎ বলে বিশ্বাস করে না ম্যানেজার।

এ-সব কথা বলরামের কানে আসে। জবাব দেয় না, কারণ তার সামনে তো ম্যানেজার কিছু বলছে না। যে কাজ সে করা উচিত বলে মনে কোরছে সে-কাজ তবু সে করে যায়। কারও কথার তোয়াক্কা সে রাখে না।

জাওলা মাছ ধরার সময় সমস্ত পোনা মাছ ছোট ঘেরটার মধ্যে চালান করে দেওয়া হয়েছিল। ছোট ঘেরটায় তাই এখন অনেক মাছ, অথচ জল কম। এত কম জলে সামান্য একটা হাত জাল দিয়েও অনায়াসে দশ সের আধ মন মাছ ধরে নেওয়া যায়। বলরামকে তাই আজকাল এক খাববার রাত্রে বেরুতে হয় বাঁধে পাহারা দিতে। এই একটা দিকে সে যথাসাধ্য নজর রাখে। ভেড়ীওলার মাইনে সে বসে বসে খায় বটে, কিন্তু সে আছে বলেই এ-ভেড়ীতে চুরির আশঙ্কা কম। ভেড়ীওলাও সেই ভরসাতেই তাকে কাজে বহাল রেখেছে। গাঁয়ের লোকেরা এ-গাঁয়ে বড় জাল কখনো ফেলবে না এই ভরসায় বেশী জলের সময় সে নিশ্চিন্ত থাকে। বেশী জলের সময় হাত জাল তেমন কাজে আসে না। কিন্তু এখন একটা হাত জাল দিয়েও যথেষ্ঠ ক্ষতি করা যায় বলে বলরাম একেবারে নিশ্চিন্ত মনে ঘুম দিতে পারে না।

সেদিন রাত্রে এক ঘুম দিয়ে বলরাম বেরুলো বাঁধটা একবার ঘুরতে। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে দেশলাইটা জালতে গিয়েও কি ভেবে আবার ঘুরিয়ে সবগুলো পকেটে রেখে দিল। মাথাটা অত্যন্ত পরিষ্কার আর সজাগ রয়েছে দেখে তার মনে পড়ল পূরো এক সপ্তাহের মধ্যে সে একবারও তাড়ী খায়নি। শালা ম্যানেজার টাকা দিচ্ছে না মোটে অনেক টাকা আগাম নেওয়া আছে বলে। জাওলা মাছ ধরার সময় কিছু টাকা হাতে এসেছিল বটে, কিন্তু

সে-টাকা সঙ্গে সঙ্গেই খরচ হয়ে গেছে। মনটা এত খারাপ, অথচ তাড়ী খাওয়া যাচ্ছে না। অত্যন্ত বিরক্তিতে মুখটা বিকৃত করে বলরাম বাঁধের উপর দিয়ে অগ্রসর হল।

অন্ধকার রাত, বসন্তকালে সাপের ভয় যথেষ্ট, তবু তারার আলোয় পথ চলার অভ্যেস তাদের আছে। পকেটে টর্চ আছে। কিন্তু বলরাম টর্চটাও জ্বালাল না। শিয়ালের মতই ক্ষিপ্রবেগে, অথচ নিঃশব্দে সে উঁচু-নিচু বাঁধের বাঁকা-চোরা রাস্তা ধরে চলল। বাঁধের শেষ সীমার খোকা অশথ গাছটার কাছে এসে সে চট্‌করে গাছের গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে গুটি সুঁটি মেরে দাঁড়িয়ে রইল। মিনিট পাঁচেক একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সে বেরিয়ে এল এবং ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে এসে বজ্রমুষ্টিতে পিছন থেকে অটবীর হাতখানা ধরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার অন্য হাতে টর্চ জ্বলে উঠল। ছপ্পর থেকে বাঁধে নেমেই বলরাম বুঝেছিল এদিকে কিছু একটা তৎপরতা চলছে। সেইজন্যই আলো-টালো না জ্বেলে এত সাবধানে সে এসেছে। কিন্তু একেবারে অটবীই যে চোর বলে ধরা পড়বে এতটা সে আশা করেনি।

অটবীর হাতে অন্ততঃ সের পাঁচেক ওজোনের একটা মাছ, দশ-বারো টাকার মাল হবে। তার কাঁধের উপর হাত জাল খানা বিছানো রয়েছে। এখনো টপ টপ করে জল পড়ছে জাল বেয়ে।

অটবী বলল, 'হাত ছাড়্, বলছি।'

'বটে? কার ভেড়ীতে চুরি করতে এইছিস্ খেয়াল নেই বুঝি?'

'বাজে কথা শোনার মত সময় নেই আমার, বলরাম। হাত ছাড়্ শিগগির।'

একটা হ্যাচকা টান দিয়ে অটবী হাতখানা প্রায় ছাড়িয়ে নিয়েছিল। বলরাম তাড়াতাড়ি টর্চটা ফেলে দিয়ে দু হাত দিয়ে অটবীর হাতখানা জাপ্টে ধরল। বেশী নয়, মাত্র একটাই মাছ ধরেছে অটবী. আর কেউ হলে বলরাম অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত। গাঁয়ের লোকের উপর এটুকুন খাতির বলরাম করে থাকে। কিন্তু এ যে অটবী, তার জন্ম-শত্রু।

'বাজে কথা কি কী তা মানজারের কাছে বলিস। চল্ এখন আমার সঙ্গে।'

অটবীও ধমক দিয়ে বলল, 'দ্যাখ্ বলরাম, আমি কিন্তু আর সহ্য করব নি বলে দিচ্ছি।'

চোর হাতে-নাতে ধরা পড়েছে ; অথচ তার দাপট দেখ ! কালই জমিদারের কাছে জানিয়ে দিলে পায়ে ধরার পথ পাবে না।

বলরাম একটা শক্ত কথা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় অন্ধকারকে চমকিয়ে দিয়ে একটা তীব্র আলো ঠিক তার মুখের উপর এসে পড়ল। ম্যানেজারের নতুন-কেনা পাঁচ সেলের টর্চের আলো, বলরাম আলো দেখেই বুঝল। ম্যানেজারের এত উন্নতি হয়েছে ? এই অন্ধকার রাত্রে, সাপের ভয়, ভুতের ভয়কে তুচ্ছ করে, আলা ঘরের আরাম-শয্যা ছেড়ে বেরিয়েছে বলরামের কাজের খবরদারি করতে ?

অটবী সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল। বলরামকে বলল, 'চলে আয়।'

বলরামও অগত্যা পালালো,.চোরকে কেন ধরে রাখেনি তার অপ্রীতিকর কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায় এড়ানোর জন্য। অটবী তার যত বড় শত্রুই হোক, তবু একজন গাঁয়ের লোককে সে ম্যানেজার বা জমিদারের হাতে ধরিয়ে দিতে পারবে না। একটু আগেই যে সে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যই অটবীর হাত ধরে টানাটানি কোরছিল, তা তার মনেও পড়ল না।

বলরাম ভাবল, গাঁয়ের ভিতর যখন ঢুকেই পড়েছে, তখন বাড়ীর হালটা একবার না হয় দেখেই যাবে। নিত্যানন্দ আর নিতাই এর বাড়ী পার হয়ে গিয়ে অটবীর বাড়ী পড়ল। অটবী ঘরের দিকে যাওয়ার জন্য মোড় ঘুরল, বলরাম সোজা এগিয়ে যেতে গিয়েও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। অটবীর ঘরের দরজা খোলা, ভিতরে আলো জ্বল্‌ছে, ঘর থেকে মাঝে মাঝে একটা চাপা আর্তনাদ ভেসে আসছে।

বলরাম কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর ঘরে কে কাঁদ্‌তেছে রে অটবা ? রাধা ? কী হয়েছে গো রাধার ?'

অটবীও জবাব দেওয়ার জন্য দাঁড়াল।

'এসে দেখে যা না কী হয়েছে ? চুরি করতে কেন গিয়েছিলাম একবার নিজের চোখেই দ্যাখ্।' বলে অটবী একটু থামল, তারপর আবার যোগ

করল, 'তুই চাকরী করিস এ-ভেড়ীতে। এখেনে চুরিটুরি করলে তোর ওপর দোষ এস্‌তে পারে বলে আমরা সহজে কখনো ইদিগে হাত দিনা জানিস তো।'

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলরাম দেখল, একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর রাধা শুয়ে, তার প্রায় গোটা শাড়ীখানাই রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছে, মেঝের উপর দিয়ে পর্যন্ত রক্ত গড়িয়ে চলেছে। পুরোন ব্যাপার বলে বলরাম সহজেই বুঝতে পারল। এর আগেও আরও দু'বার রাধার এমনি গর্ভপাত হয়েছে। তবে এবার রাধা যে অন্তঃস্বত্বা ছিল তা বলরাম জানত না। এ-সব দুর্ঘটনা তো আপনা-আপনি হয় না,—এ হল ভগমানের বিধান। পূর্ব-জন্মের কোন কঠিন অপরাধ না থাকলে এমনটা কখনো ঘটে না।

অটবী বলল, 'সন্ঝে বেলাই ব্যথা ব্যথা বলতেছিল। আত দশটার থে অক্তপাত সুরু হয়েছে। কাঁঠালকে পাইঠেছি ধাই ডেকতে। ইসব জিনিষ তো সোজা লয়। পান হানি ইস্তক হয়ে যেতে পারে। হাতে একটা পয়সা ছেল না। সকাল হলেই তো ধাই-এর টাকা দিতে হবে, ওষুধ পত্তরও কিন্‌তে হতে পারে। মাছটাতে তবু কটা টাকা মিলবে মনে লিচ্ছে।'

তাদের সাড়া পেয়ে রাধার গোঙানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার একবার ঘাড় উল্টিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বৌ-টার মুখ-চোখ কেমন বসে গিয়েছে! বেচারা!

অটবীর প্রতি কিন্তু তেমন অনুকম্পা বোধ করল না বলরাম। ঈশ্‌! কত দরদ বৌ-এর প্রতি, এই রাতে ধাই ডাকতে পাঠানো হয়েছে! গরীবের ঘরে এমন কত হচ্ছে! রক্তের ডেলাটা বেরিয়ে গেলেই তো রোগ সেরে গেল! তার জন্য আবার ধাই, আবার ওষুধ! বিন্দুরও তো দু' দুবার এমন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বলরাম ধাই ডাকেনি, তবু তো বিন্দু বেঁচে আছে। আপনা-আপনি ঠিকও হয়ে গিয়েছে, আবার তিনদিনের দিন উঠে ভাতও রেঁধে দিয়েছে। ধাই-এর যা খাঁই; আজকাল পুরো মাসে ছেলেপুলে হওয়ার সময়েই কত লোক ধাই ডাকতে পারে না!

তবু যদি অটবীর সব গুণের পরিচয় না জানা থাকত! আর একজনের বৌ-চুরি করতে গিয়ে মার খেয়ে এসেছে তো এই সেদিন। এখনো তো

মাথার ঘা চুলে ঢাকা পড়েনি। সারা দেশে তো ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে! এমন মানুষের আবার বৌ-এর উপর দরদ! হাসিও পায়, রাগও হয়!

ধাই কিন্তু রাধার রোগটাকে খুব সাধারণ বলে উড়িয়ে দিতে পারল না। শেষ রাত্রি পর্যন্ত দেখে সে জানালো, অবস্থা বেশ খারাপ, রুগীর দায়িত্ব নিজের হাতে রাখতে সে ভরসা পাচ্ছে না। অটবীরা বরং একজন ডাক্তার ডাকুক। শেষে যদি একটা কিছু হয়ে যায় তবে আপশোষ রাখার জায়গা থাকবে না। যাদবপুরের একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নামও সে বলে দিল। খুব নাকি ভাল লোক; গরীবের উপর যথেষ্ট টান।

ভাগ্য ভাল কোত্থেকে এই সময় হঠাৎ নিধু এসে উপস্থিত হল। ভালই হল। অটবী একেবারে ঐ পথেই নিধুকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়ে দিল। এ-সব কাজ নিধুই ভাল পারবে, ভদ্দরলোকদের সঙ্গে তার মেলা-মেশার অভ্যেস আছে। অটবীর আবার ও-সব কাকুতি মিনতি অনুরোধ-উপরোধগুলো মোটে আসে না। ভদ্দরলোকদের অহঙ্কারপূর্ণ চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলেই তার গায়ের রক্ত মাথায় ওঠে।

নিধুকে পাঠিয়ে দিয়ে অটবী বেরুলো টাকার চেষ্টায়। হাতে একটা পয়সা নেই; অথচ ধাই আর ডাক্তার আর ওষুধ মিলে যে কত খরচ হবে তা ধারণা করতেও ভয় কোরছে। অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাট টাকা জোগাড় করে রাখতেই হবে। চুরি-করা মাছটা একটা মেয়েছেলেকে দিয়ে দিয়েছে দশ টাকায়। তা সে টাকাও সে বেচে কিনে এসে দুপুরে মিটাবে। ধাইটি চেনা, তাকে বলে-কয়ে রাখা যাবে। কিন্তু ডাক্তার? ডাক্তার আর জোঁকের মধ্যে তো বিশেষ তফাৎ নেই।

জমিদারের দেনা এখনো সব শোধ হয়নি। তার উপর আবার নতুন ধার করতে হবে। এত টাকা কতদিনে শোধ হবে কে জানে। তবু তাকে রাধাকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য করতে হবে, যদিও হয়তো তার অবস্থার আর কোন লোক এত বড় টাকার ঝুঁকি নিতে সাহস করত না। ভাগ্যের উপর জীবন-মরণের দায়িত্ব চাপিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু অটবী তা পারে না। রাধাকে যে সে এমন-কিছু একটা ভালবাসে তা হয়তো নয়। অবাধ্য স্বভাবের

এই বৌটিকে নিয়ে নিজেকে সে সুখী মনে করে না। রাধা বলে কেন, কাকেই বা সে ভালবাসে? শূন্য মন মানুষের অগণিত মিছিলের দিকে অতৃপ্ত চোখে তাকিয়ে আছে,—মনের মত মানুষ মিলছে কোথায়? পরীকে দেখে অবিশ্যি মনটা খুবই চঞ্চল হয়েছিল। কিন্তু সে তো মনের সাময়িক বিকার মাত্র,—বিকারের দরুণ যথোচিত শাস্তি পেয়ে মন এখন শান্ত হয়েছে।

তবু রাধার একমাত্র আপনার জন তো সে। বিপদে-আপদে, সুসময়ে-দুঃসময়ে রাধা তো একান্তভাবে তার মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে, তার থেকে সবরকমের সাহায্য পাবে এই তো তার একমাত্র ভরসা। এই দায়িত্ব সে কী করে অস্বীকার করবে? মানুষ যত নিচে নামতে পারে, তত নিচে এই সমাজ তাকে নামতে বাধ্য করেছে; কিন্তু যেখানে নামলে মানুষ আর মানুষ নামের যোগ্য থাকে না, সেখানে সে কী করে নামবে?

সুধন্যর কাছে ত্রিশ টাকার বেশী পাওয়া গেল না। বালিশের তলা থেকে থলিটা নিয়ে এসে ঝাড়া দিয়ে দেখিয়ে দিল, আর মাত্র পাঁচটা টাকা রয়েছে অবশিষ্ট। সর্বনাশ হল দেখা যাচ্ছে। কাছাকাছির মধ্যে একমাত্র সুধন্য ছাড়া আর কার কাছে টাকা পাওয়া যেতে পারে? অগত্যা অটবী গেল যজ্ঞেশ্বর কাকার কাছে পরামর্শ চাইতে। যজ্ঞেশ্বরকাকা বেরুলো গাঁয়ের মধ্যে সকলের থেকে দু'টাকা একটাকা করে চাঁদা তুলতে। বিপদের সময় চাঁদা তুলে পরস্পরকে সাহায্য করার রেওয়াজ আছে এ-গ্রামে।

তা দু'টাকা একটাকা করে চাঁদা দিল গাঁয়ের প্রায় সবাই। এমন-কি নিতাই বলরাম পর্যন্ত। চাঁদার কথা শুনে নিতাই অবিশ্যি গিয়েছিল বলরামের কাছে পরামর্শের জন্য।

নিতাই বলেছিল, 'বলাদা, অটবী হল গে মোদের শত্রু-পক্ষ। তার বৌ-য়ের ব্যায়রামে মোরা চাঁদা দিতে যাব কেন বল দিনি?'

বলরাম বলেছিল, 'অমন কথাও বলতে যেয়োনি নেতাই। মনে কর, দুটো টাকা পথ দে' এস্‌তে এস্‌তে নদ্দমায় পড়ে গেছে। আমরা যদি চাঁদা না দি, আর মাগীটার যদি এদিক সেদিক কিছু হয়, তো লোকে মোদের দুষ্‌বে

যে দ্যাখ, শত্তুরতা করে এমন বেপদের সময়ও এরা চুপটি করে বসে রইল। সামান্যি টাকার জন্যি কেন দোষ ঘাড়ে লিব, বল ?'

এদিকে ডাক্তার আনতে গিয়ে নিধুর মত সেয়ানা ছেলে পর্যন্ত নাজেহাল হয়ে গেল। যাদবপুরের সেই স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞটির চেম্বারে ভীড় বিশেষ ছিল না। তবু নিধুর পোষাক-আশাক দেখে দু'একজন পুরোণো রোগিনীর সঙ্গে খোস-গল্পেই আধঘণ্টা খানেক কাটিয়ে দিলেন তিনি। শেষে নিধু দু'-তিনবার কাতরভাবে অনুরোধ করার পর জানতে চাইলেন, 'রোগী কোথায় আছে ?'

নিধু রোগীর অবস্থা বলে ডাক্তারের আগ্রহ স্বষ্টিতে ব্যস্ত আর ডাক্তার জায়গাটার ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে বেশী মনোযোগী। বহু কষ্টে ডাক্তার যখন জায়গাটা কোথায়, কীভাবে যেতে হয়, ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারলেন, তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আড়াই-শো টাকা ফী লাগবে।'

শুনে নিধুর চোখ কপাল ডিঙিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠতে চাইল। তার চেহারা দেখেই ডাক্তার পরম নিশ্চিন্ত হয়ে তার পুরোনো রুগীদের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত হলেন। নিধু প্রায় দিশেহারা হয়ে গেল,—ডাক্তার যে তাকে নিতেই হবে। অগত্যা সে তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল। চোখে জল টেনে এনে ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'ডাক্তারবাবু, গরীবের মা-বাপ আপনি। আপনাকে একবারটি যেতেই হবে দয়া-ধম্ম করে।'

ডাক্তার বোধকরি একটু সদয় হলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কত দিতে পারবে শুনি।'

'আজ্ঞে মোরা গরীবনোক, পঞ্চাশের বেশী দিতে পারবনি।'

শুনে ডাক্তার তাঁর চাকরকে হঠাৎ কী দরকারে ডাকতে সুরু করলেন, এবং তার সাড়া পেতে দেরী হওয়ায় অদৃশ্য লোকটির বিরুদ্ধে যা তা গালাগালি দিতে লাগলেন।

নিধুর ভাগ্য ভাল, এমন সময় একটি ছোক্‌ড়া ডাক্তার চেম্বারে ঢুকল। যাদবপুরে এঁর ভিজিট দু'টাকা, তা দিয়েও কেউ বিশেষ ডাকে না বলে ইনি

মাঝে মাঝে ফী ছেড়ে দিয়ে 'বিবেচক ডাক্তার' বলে নাম কেনার চেষ্টা কোরছেন।

প্রবীণ ডাক্তারটি এঁকে স্নেহ করেন বলে কেশটা নিতে বললেন। জায়গার বিবরণ শুনে তো তিনি এমন লাফ দিলেন যে মাথা প্রায় ছাদে ঠেকার জোগাড়। টাকার অঙ্ক শুনে তিনি আর একবার লাফ দেওয়ার উদ্যোগ করতেই নিধু তাঁর পা চেপে ধরল।

শেষ পর্যন্ত এই ডাক্তারটি যেতে রাজী হলেন। স্ত্রীরোগের তিনি কিছুই জানেন না, তবে প্রবীণের থেকে কিছু কিছু উপদেশ শুনে নিয়ে রওয়ানা হলেন। যেতে যেতে ডাক্তারটি নিধুকে উপদেশ দিলেন, এত দূরের পথে মাত্র পঞ্চাশ টাকা সম্বল নিয়ে ডাক্তারের কাছে না এসে তার নাপিত ডেকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। নাপিত ক্ষুর দিয়ে পেট কেটে অনায়াসে বাচ্চা বের করে দিতে পারত।

ডাক্তারকে নিয়ে নিধু যখন ঘরে পৌঁছল তখন প্রয়োজন মিটে গিয়েছে। রাধা নির্বিঘ্নে প্রসব করেছে। সামান্য রক্তপাত যদিও এখনো চলছে, তবে ডাক্তার দেখেই বুঝলেন, মজুরের ঘরের শক্ত সমর্থ বৌ এখন সহজেই সামলিয়ে উঠবে। দু'এক ডোজ আর্গট মিক্শ্চার দিলেও চলে, না দিলেও ক্ষতি নেই। তিনি গম্ভীরভাবে তাড়াতাড়ি ব্যাগ নামিয়ে রোগীকে একটা ইন্‌জেক্‌সান দিলেন এবং কী একটা ত্রুটির জন্য ধাইকে কড়া স্বরে একটা ধমক দিলেন। পরে অটবীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব সময় মত এসে পড়েছিলাম যা হোক। দেরী হলে কী যে হত বলা যায় না। তবে ইন্‌জেক্‌সানটা দিয়ে দিলাম, এবার নিশ্চিন্তি।'

ফী পঞ্চাশ, এবং পাঁচশিকের ইন্‌জেক্‌সানের জন্য পনেরো, এই পঁয়ষট্টী টাকা নিয়ে ডাক্তার বিদায় নিলেন।

নিধুর কাছে ডাক্তার আনার বিবরণ শুনে অটবী রেগে বলল, 'তুই ওদের পা ধরলি ?'

'তো কী করব ? ওদের কান যে পায়ের নিচে ; মাথার কাছে শত চেঁচালেও শুনতে পাবেনি।' নিধু অম্লান বদনে জবাব দিল।

ডাক্তারের আসা অবধি দেখে বলরাম আলার দিকে রওয়ানা হল। সংসার সম্বন্ধে নিজের সুগভীর জ্ঞান এবং অটবীর ঠিক ততখানি সুগভীর অজ্ঞতার কথাটাই যাওয়ার সময় মনে মনে ভাবছিল বলরাম। ডাক্তার এবং ধাই এর জন্য অটবী এতগুলো টাকা খরচ করতে যাচ্ছে, অথচ যা হওয়ার তা তো আপনা-আপনি বিনা বাধায় হয়ে গেল! এ-সব ব্যাপার যে আপনা-আপনিই হয়ে থাকে, ভগমানের কাজ যে ভগমানই করেন, এই শাদা কথাটা পর্যন্ত বোকা অটবীটা জানে না। অথচ কাল রাত্রে সে যেটা ভেবেছিল সেইটেই তো ফলে গেল!

আলা ঘরে এসে দেখল, ম্যানেজার সকাল থেকে অনুপাস্থত, আর ভেড়ীর কর্মচারী তিন মূর্তি বসে বসে হুঁকোতে ক্রমাগত তামাক সাজছে আর টানছে। পাশে স্তূপাকার করা তামাকের ছাই দেখে বুঝতে পারল, এই কাজটাই তারা কোরছে সকাল থেকে এত বেলা অবধি।

বলরাম তৎক্ষণাৎ ধম্‌কা-ধম্‌কি সুরু করে দিল, 'তোরা কি যমের অরুচি না কাঁঠালের অজীন্ন? কোন্‌টা? বসে বসে সরকারের পয়সার তামাক মারছিস্‌, আর ইদিগে যে বড়শি দে' আর পলো দে' ছেলে-ছোক্‌ড়ার দল মাছ ধরে ধরে ভেড়ী সাফ করে ফেলল? নুন খেয়ে মালিকের সব্বোনাশ কোরবি, আর মালিক গে' কাঁদতে কাঁদতে বৌ-এর কাছে লালিশ জানাবে তোদের নামে! তাই মতলব করেছিস নাকি রে তোরা, যত সব মহাদেবের বাহন?'

ধমক শুনে সকলে হেসে উঠল। কিন্তু বলরামকে তারা সবাই মান্য করে অভিজ্ঞ মাতব্বর গোছের লোক বলে। দু'চারটে সরস মন্তব্য করে সবাই যে যার মত বেরিয়ে গেল। একা একা বলরাম বসে বসে তামাক টানায় মন দিল।

এমন সময় স্বয়ং নায়েব সুমন্তবাবু তিন জন দারোয়ান সঙ্গে নিয়ে আলায় এসে উপস্থিত হলেন। বলরাম ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে শরীর আদ্ধেক বাঁকিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'নায়েব মশাই আপনি?'

থম্‌থমে চেহারা নায়েব মশাই-এর। কোনরকম ইঙ্গিতেও সম্ভাষণ ফিরিয়ে না দিয়ে বললেন, 'তোমরা যদি আসতে বাধ্য কর, তবে আর না এসে উপায় কি? কর্তাবাবু তোমাকে ডেকেছেন, এক্ষুনি যেতে হবে।'

'সেজন্যি আপনার আসার দরকার কি ছেল নায়েবমশা? একটা প্যাদা পাইঠে দিলেই তো হত।'

'হলে কি আর আমি আসতাম? কর্তাবাবু ভীষণ রেগেছেন,—তোমাদের এ সব চুরি-চামারি আর তিনি সহ্য করবেন না। এরকম হরদম চুরি হতে থাকলে ভেড়ী-টেড়ীগুলো কি আর কেউ জমা নিতে আসবে? তোমাদের তিন পয়সার প্রজাদের জন্য তাঁর হাজার হাজার টাকার বিষয় মাটী হবে এ আর তিনি বরদাস্ত করবেন না। তোমার উপর একটু ভালো ধারণা ছিল, তুমিও যখন এই কর্মে নেবেছ, তখন কর্তাবাবু এবার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।'

অপরিসীম বিস্ময়ে বলরাম শুধু কোনরকমে বলতে পারল, 'আমি?'

'হাতে-নাতে ধরা পড়ে আবার ন্যাকা সাজছিস্, ব্যাটা হার্মাদ কোথাকার? যার নুন খাস্, তারই সব্বোনাশ করিস্,—ব্যাটা চোর তোর তো নরকেও স্থান হবে না! চল্‌না, আজ তোর হাড়-মাস একজায়গায় হবে।'

'কিন্তু আমি তো চোর ধরতে গেছ্‌লাম। চোরকে ধাওয়া করে নে' গেছলাম।' এতক্ষণে নিজেকে কতটা সামলে নিয়ে বলরাম বলল।

সুমন্তবাবু আরও রেগে গেলেন।

'ফের মিছে কথা? পাজী বজ্জাত কোথাকার। ম্যানেজার স্বচক্ষে দেখেছে তোকে মাছ হাতে নিয়ে আসতে।'

'বাবু বিশ্বাস করুন, আমি কক্ষনো বেইমানী করি না।'

'বটে? তবে কে চুরি কোরছিল তা বল্।'

'তাকে চিনতে পারিনি। চেনা নোক লয়।'

'হারামজাদা, আমাকে কচি খোকা পেয়েছিস্, লয়? দু' চার গাঁয়ের মধ্যে কোন্ মানুষটাকে তুই না চিনিস্ রে? এই কানা ভেড়ীতে চুরি করতে তো আর ক্যানিং বা ভাঙড় থেকে লোক আসেনি!'

বলরামকে সঙ্গে নিয়ে আবার নাযেব মশাই বাঁধের পথ ধরে ফিরলেন। কিন্তু তিনি জমিদার-বাড়ী পর্যন্ত গেলেন না। বাঁধের পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই তিনি তাঁর উপর আরোপিত কর্তব্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করলেন।

তাঁর ইঙ্গিতে দু'জন দারোয়ান বলরামের দু'হাত শক্ত করে ধরে রইল, এবং তৃতীয় জন তার বেঁটে লাঠিখানা নিয়ে বলরামের কাঁধের নিচ থেকে সুরু করে একেবারে পিঠ বরাবর হাঁটু পর্যন্ত সমানে পিটিয়ে গেল। বলরামের শক্ত পিঠের উপরেও আঘাতের চিহ্নগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। যেখানে যেখানে চামড়া ফেটে গিয়েছিল, সেখান দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে লাগল।

কর্তাবাবু গত দু'এক বছরের মধ্যে এ-ধরণের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন বলে বলরাম মনে করতে পারল না। বিশেষ করে, অন্যান্য প্রজাদের তুলনায় তাদের সঙ্গে জমিদারের সম্পর্কটা একটু আলাদা এবং বিশেষ ধরণের বলে এ-ধরণের শাস্তির সঙ্গে তারা প্রায় অপরিচিত। বলরাম যত না ব্যথা অনুভব করল, তারচেয়ে অনেক বেশী বিস্মিত হল। 'কেন মারছেন? কী করেছি?' এর চেয়ে বেশী যেমন সে আর কিছু বলতেও পারল না, তেমনি তার মুখ দিয়ে কোন কাতরোক্তিও বের হল না।

'যাতে আর কোনদিনও তোদের আর কেউ চুরির কথা কল্পনাও না করে তার জন্য এই ব্যবস্থা।' বলে নায়েব মশাই হেলে দুলে সদলবলে প্রস্থান করলেন।

এত বড় একটা কাজের সাক্ষী রইল শুধু দুপুরের প্রচণ্ড রোদ আর চারপাশের হোগলা আর নলের বন। কিন্তু এই ঘটনাটি একটি মানুষের মনে যে তাণ্ডবের সৃষ্টি করল, তাপদগ্ধ নিথর মধ্যাহ্ন প্রকৃতি তার কোন খবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

সেই বাঁধের গায়ে, মানুষের পায়ে পায়ে পিষ্ট আধ-শুকনো ঘাসের চাপড়ার উপর কতক্ষণ যে বলরাম বসে রইল তার হিসাব তার নিজের মনে ছিল না। প্রথম খানিকটা সময় তো মুহ্যমান অবস্থাতেই কাটল, একটা দুর্বোধ্য মানসিক গ্লানি আর শারীরিক যন্ত্রণার অনুভূতি ছাড়া কিছু ভাববার ক্ষমতাই ছিল না বলরামের।

কিন্তু আস্তে আস্তে তার মাথায় একটার পর একটা চিন্তা এলোমেলো ভাবে এসে জুটতে লাগল আর তার সমস্ত মনটা উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

বলরাম চুরি করে না; সমস্ত কিছু বিষয়ে সে তার সামান্য বুদ্ধি অনুযায়ী

যথাসাধ্য ভাল-মন্দ বিচার করে চলতে সে অভ্যস্ত। অথচ বেতুই গাঁয়ে এতগুলো প্রকৃত চোর থাকতে, চোর বলে শাস্তি গ্রহণের জন্য সর্ব-প্রথম সেই কেন নির্বাচিত হল? ভালভাবে চলার চেষ্টার দরুণ আজ পর্যন্ত কোন সুফল তার কপালে জোটেনি, না জুটুক। কিন্তু সেই চেষ্টাটা এমন কী গুরুতর অপরাধ যে-জন্য তাকে আজ শাস্তি গ্রহণ করতে হল? ভগমানের এ কেমন বিচার?

এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এ ব্যাপারের পিছনে ম্যানেজারের কিছু হাত আছে। ম্যানেজার তাকে দেখতে পারে না, মালিকের সুদৃষ্টি তার উপর না থাকলে এতদিন তার চাকরী টিকত না, এ সবই জানা কথা। কিন্তু দেখতে না পারলে কি চোখেরও দোষ জন্মায়? অটবী পিছনে ছিল বলে তাকে যদি না দেখতে পেয়ে থাকে, তবে তার খালি হাতে একটা মাছ ছিল, এমনও তো দেখা যাওয়ার কথা নয়।

জমিদার যে কাচারিতে ডেকে না নিয়ে, বিচার-আচার না করে, পথের মধ্যে তাকে মার দেওয়ার ব্যবস্থা দিয়েছে, এটা বরং বুঝতে পারা যায়। তাদের জমিদারের এটাই স্বভাব,—যা-ই তার করার মতলব হয়, তাই সে আগে বুঝতে না দিয়ে, জানতে না দিয়ে, গোপনে-গোপনে, সাক্ষী-সাবুদ না রেখে, করতে ভালবাসে।

কিন্তু জমিদারের হঠাৎ এ রকম মতলব হওয়ারই বা কারণ কি? সত্যিই কি তিনি চুরি দমন করতে চান, এতদিন ধরে প্রকারান্তরে চুরি বৃত্তিটা সমর্থন করার পর?' চুরি না করতে পারলে এ-গাঁয়ের লোকেরা আদ্ধেক দিন না খেয়ে থাকবে, এ-কথা জানা থাকা সত্ত্বেও? আর চুরি দমন করার জন্য, যারা প্রকৃতই চুরি করে তাদের শাস্তি না দিয়ে, বলরামকে শাস্তি দেওয়াটাও কম অদ্ভুৎ ব্যাপার নয়।

মোটের উপর যেদিক দিয়েই বলরাম অগ্রসর হতে চেষ্টা করল, সেদিক-দিয়েই সে তার এই স্বপ্নেরও অতীত দুর্দশার জন্য কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজে পেল না। কেবল সারিবদ্ধভাবে একরাশ প্রশ্ন এসে সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিদ্রূপ করে বলতে লাগল, কেমন, আর ভাল হতে চষ্টা করবি?

এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ল, মাস কয়েক আগে একদিন সে লক্ষ্মীবারে ঘরের

লক্ষ্মীকে পিটিয়েছিল। তার পরেই ভাগবত কাকা এসে বলেওছিল যে কাজটা ভাল হল না। সেই পাপের শাস্তিই কি তাকে আজ এইভাবে পেতে হল? মন্দ করলে তার শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় · ভাল করলে তার পুরস্কারটা সহজে পাওয়া যায় না।

রাধা একটু সুস্থ হওয়ার পর অটবী নিজেদের খাওয়ার জন্য, চাট্টি চাল আর তার মধ্যে ন্যাক্‌ড়ায় জড়িয়ে খানিকটা ডাল উনুনে চাপিয়ে দিল। চালটা সিদ্ধ হয়ে গেল নামিয়ে নেওয়ার ভার কাঁঠালের উপর দিয়ে অটবী একটু বেরিয়ে পড়ল রাত-জাগা এবং দুশ্চিন্তায় অবসন্ন মনকে একটু সুস্থ করার জন্য। বাঁধ ধরে এলো-মেলোভাবে হাটতে হাটতে, এমনি কপাল, সে-ই প্রথম বলরামকে সেইভাবে বসে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করল।

বলরামকে এমনি হীন, দুর্বল, অত্যাচারিত অবস্থায় অটবী না দেখে আর কেউও তো দেখতে পারত! এত লোক থাকতে, এই ভেড়ীর তিনটি কর্মচারী থাকতে, চির-শত্রু অটবীর সামনে পড়ে যাওয়াটা একটা অধিকন্তু দুর্দৈব ছাড়া আর কি! একেতো সে নিজের যন্ত্রণায় অস্থির তার উপর অটবী সুযোগ পেয়ে নিশ্চয়ই তাকে বিদ্রূপ করতে সুরু করবে। তবে কিছু বলুক না অটবী, বলরামও ছেড়ে কথা কইবে না।

অটবী বলরামকে ঐ অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ কী ব্যাপার বলাদা?'

চুপ করে থাকা যায় না; বলরামকে বলতে হল, 'আর কি —নায়েব মশা তিন তিনটে দরোয়ান সঙ্গে নে' এসে মার-ধর করে গেল।

'সে কি? অপ্‌রাধটা কী হল গো তোমার? আহা এমন করে মুনিষটাকে মেরে গেল দুশ্‌মনের দল? ওরা মুনিষ লয়, জানোয়ার। জানোয়ারেরও অধম। বাঘের ছাল-পরা শেয়াল! চল চল, আগে ঘরে চল, তা'পরে শুনব সব বেত্তান্ত।'

অটবীর গলায় বিদ্রূপের চিহ্ন মাত্রও না দেখে বলরাম আশ্বস্ত হল। কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। হাঁটু আর কোমরের হাড়ে চোট লেগেছে, বুঝতে পারল। দেখে অটবী তাকে তার কাঁধের উপর

ভর রেখে চলার জন্য অনুরোধ করল। এমন অবস্থা, অটবীর সাহায্য না নিয়েই বা বলরাম করে কি? মুখের উপর তো আর বলা যায় না, তুই আমার শত্রু, তোর সাহায্য আমি নেব না?

অটবীর কাঁধে দেহের অর্ধেক ভার ছেড়ে দিয়ে কোন রকমে খোড়াতে খোড়াতে যখন বলরাম তার ঘরে এসে ঢুকল, তখন সারা গ্রামের লোক কৌতূহলে উৎকণ্ঠায় এসে ভেঙে পড়ল তার ঘরে। আর সেই ভীড় ঠেলে আলু থালু বেশে ছুটে এসে বিন্দু শায়িত বলরামের পিঠের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে যেতেই অটবী হা হা করে উঠল,

'কী কোরছ গো বোঠান? উদিগে লয়, উদিগে লয়!'

শুনে বিন্দু তাড়াতাড়ি নিজেকে কোনরকমে সামলিয়ে নিয়ে বলরামের পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে ডুক্‌রে কাঁদতে লাগল। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে ভাঙা ভাঙা ভাবে বলতে লাগল, 'মোর কী হবে গো? ব্যথার থানে ব্যথা দিতে যাচ্ছিলাম গো? মোর মরণও হয় না গো?'

যেন বলরামের দুর্দশার চেয়েও, সে যে একটা ভুল করতে যাচ্ছিল, সেইটেই তার কাছে বেশী আপশোষের কারণ!

জীবনটাই বিন্দুর এমন হয়ে গিয়েছে যে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মায়া-মমতা, বোঝার ক্ষমতাও যেন তার আর নেই। কী হলে যে তার সুখ হয়, আর কী হলে যে হয় না, তা সে জানে না; কোনদিন জানার চেষ্টাও করেনি, সুযোগও পায়নি। শুধু সে জানে, কখন সংসারের নিয়ম অনুযায়ী তার সুখ বা দুঃখ বোধ করা উচিত। দুঃখের মাত্রা অনুযায়ী কোথায় কতটুকু কাঁদা উচিত, কতটুকু কাঁদলে পাঁচজনের কাছে জিনিষটা ঠিক মানানসই লাগবে। তার মা-ঠাকুমা-দিদিমার আমল থেকে ঠিক বিধি-সঙ্গত যে আচরণগুলি সবাইকে করতে দেখেছে, সে-ও নিপুণভাবে কাঁটায় কাঁটায় তাই করতে চেষ্টা করে। আজকে বাড়ীর মরদ আহত হয়ে ঘরে ফিরে এল বলে সত্যি সত্যি কতখানি দুঃখ সে পেয়েছে তা ভেবে দেখারও চেষ্টা করেনি বিন্দু। কী ভাবে কতখানি দুঃখ তাকে প্রকাশ করতে হবে, তা ই নিয়ে সে ব্যস্ত। অটবী কিনা তার মত পাকা লোকের কাজের মধ্যে খুঁৎ ধরে ফেলল! আপশোষ হওয়ার কথা নয় কি?

বেঁচে থাকা মানে সংসারের বাঁধা-ধরা কতকগুলো বিধান মেনে চলা, এবং বাঁধা-ধরা কতকগুলো অবস্থার জন্য নিজেকে তৈরী রাখা। বাঁধা-ধরা বিধান, যেমন বাড়ীতে কচিৎ কখনো ভালো রান্না হলে তার হাসা উচিৎ, তাই সে হাসে; যদিও জানে, আর সবাইকে দিয়ে সেই ভাল জিনিষের খুব সামান্যই তার জন্য অবশিষ্ট থাকবে। বাঁধা-ধরা অবস্থা, যেমন, স্বামীর হাতে মার খাওয়া, সৎ-ছেলের গঞ্জনা সহ্য করা, কাজের অভাব ঘটলে বা স্বামীর তাড়ী-তৃষ্ণা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে, অনাহার বা অর্ধাহার। বিন্দুর জীবনের সবকিছুই এমন পরিচিত, মামুলী আর চিরাচরিত ব্যাপার যে তা নিয়ে বিস্ময় বা দুঃখ-বেদনা বোধ করার কোন প্রশ্ন ওঠে বলেই বিন্দু বোধ করে না।

একমাত্র যদি অনাহারের পালাটা ক্রমাগত চলতে থাকে, তবে বোধকরি সত্যি সত্যিই একটু কষ্ট বোধ হয়। শরীর দুর্বল হয়ে যায় বলে আবার কাজ করে ভবিষ্যতের আহার জোগানোর ক্ষমতাটাই লোপ পেতে বসে, এইজন্য।

আজকে বলরামের এই দুর্দশার সময়েও, বলরাম কতখানি যন্ত্রণা এবং অপমান সহ্য করেছে সে ভাবনার চেয়েও বলরাম বেশী দিন অশক্ত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকলে তার সামান্য রেলের কয়লার আয়ে সংসার কী করে চলবে সেই ভাবনাটাই বেশী হয়েছে বিন্দুর।

সংসারে আবার একটা নতুন মুখ বেড়েছে। সুভদ্রার ছেলেটাকে ঘরে নিয়ে আসার দিনই সে স্বামীর কাছে আপত্তি জানিয়েছিল, এবং বলরামের থেকে ধমকানি এবং শাসানিও পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিল। কিন্তু সেদিন কষ্ট বাড়বে বলেই যে সে আপত্তি জানিয়েছিল, তা নয়। এরকম ক্ষেত্রে আপত্তি জানানোটাই দস্তুর বলে জানিয়েছিল। একটু কষ্ট বেশী আর একটু কষ্ট কমের মধ্যে যে সূক্ষ্ম তফাৎ আছে, বিন্দু তার ধার ধারে না। কিন্তু আজকে যদি অনাহারের পালা সুরু হয়, তবে হয়তো এই ছেলেটাকেই মস্ত বিড়ম্বনা বলে মনে হবে তার কাছে।

মোটের উপর, বিন্দুর মনোভাবে আর একজন দার্শনিকের মনোভাবে অনেকখানি মিল আছে। যদিও এই গালভরা শব্দটার সে কোন খবর রাখে না।

গ্রামের লোকদের কৌতূহল এবং আতঙ্ক যথাসাধ্য নিবৃত্ত করে, হাওয়ার অভাবে গরমের মধ্যে বলরামের কষ্ট হচ্ছে এই ওজুহাতে অটবী তাদের সরিয়ে দিল। দরকার মত অবুঝ মানুষদের ধমক-ধামক দিতেও ইতস্ততঃ করল না। একজনকে আইডিন আনার জন্য গড়িয়ায় পাঠালো। কাটা ঘায়ে যে আইডিন লাগাতে হয় তা সে জানে।

ভীড়ের মধ্যে পিছন থেকে কার্তিক একবার উঁকি দিয়ে দেখে ভীড়ের সঙ্গেই সরে পড়ার মতলবে ছিল। কাছাকাছি থাকলেই কোন না কোন ঝামেলায় আট্‌কে পড়ার আশঙ্কা আছে। বাপের অবস্থা দেখে তার উপর সে খুব যে একটা সহানুভূতি বোধ কোরছে তা নয়। বাপকে তো সে চেনে। তাড়ীখোড়, লম্পট, কাঠগোঁয়াড় এই মানুষটা যে নিজের দোষেই নিজের উপর দুর্ভোগ টেনে এনেছে সে বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই।

অটবী তাকে দেখতে পেয়ে ডাক দিল, 'এই হারামজাদা ব্যাটা, পেইলে বাচ্ছিস যে? ইদিগে আয়, বাতাস কর্ বাপকে।'

যেটা এড়াবে ভেবেছিল সেইটেই ঘাড়ে চাপল। কার্তিক বিরস মুখে বাপের মাথার কাছে বসে অনিচ্ছুক হাতে হাত পাখাখানা নাড়তে লাগল।

বিন্দুর দিকে তাকিয়ে অটবী বলল, 'বৌঠান, কিছু ন্যাক্‌ড়া জোগাড় কর। আর দ্যাখো তো আশ-পাশের বাড়ীতে কিছু চূণ পাওয়া যায় কিনা। পেলে নে' এস্‌বে অনেকখানি।'

চূণ দিয়ে অটবী ক্ষত মুখগুলির রক্ত বন্ধ করে ন্যাক্‌ড়া দিয়ে যথাসাধ্য জড়িয়ে দিল। হাটু এবং কোমরে গরম সর্ষের তেল মালিশ করে দিল। অটবীর আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে বলরাম মুগ্ধ হয়ে গেল। অটবী যে তার জন্মশত্রু আর প্রতিদ্বন্দ্বী, এই মুহূর্তে তা সে ভাবতেও পারল না। তাকে যত খারাপ বলে এতকাল ধরে সে ভেবে এসেছে, সে ধারণা হয়তো ঠিক না-ও হতে পারে। মানুষের কত ধারণাই তো ভূল থাকে!

আর বলরাম বিশ্রামে এবং যত্নে একটু সুস্থ হয়ে উঠলে, অটবা আস্তে আস্তে তার থেকে সমস্ত ঘটনা এক এক করে জেনে নিল। বলরাম কিছু গোপন করল না, দরকারই বোধ করল না। সমস্ত শুনে অটবী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা

বলাদা, নায়েব যখন চোরের নাম জানতে চাইল, তুমি মোর নাম বললেনি কেন? তবে হয়তো তোমার কপালে এমন মারধর জুটতনি।'

'কিন্তুক তাই কি কখনো পারা যায়? নিজের জেতের লোককে, নিজের গাঁয়ের লোককে অন্যের কাছে ধইরে দিতে আছে? এমন শিক্ষা তো কোনদিন পাইনিকো।'

অটবী অবাক হয়ে বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলরামকে চিরদিন সে ভীরু, অলস, স্বার্থপর এবং অসামাজিক বলে অবজ্ঞা করে এসেছে। অথচ আজ যাকে সে শত্রু বলে জ্ঞান করে, তাকে, মতলব করে নয়, সত্যি ঘটনা বলে নিছক নিজেকে বাঁচানোর জন্যও অন্যের হাতে তুলে দেয় নি। তার মধ্যে এই মহত্ত্ব এল কোত্থেকে?

অটবী বলরামের হাত ধরে বলল, 'বলাদা, তোমার অন্তরটা এত ভাল!—আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু।'

চরম দুঃখের দিনে একজন শত্রুকে বন্ধু বলে লাভ করলে কে না খুসী হয়? বলরাম অটবীর হাতখানায় একটু চাপ দিয়ে তার কথায় নিজের স্বীকৃতি জানালো। কিন্তু তার মধ্যে এত ভাল অন্তঃকরণের অটবী কী দেখতে পেল? নায়েবমশাই-এর কাছে যখন সে অটবীর নাম গোপন করে গিয়েছে, তখনো মনে হয়নি, এখনো বলরামের মনে হল না, এ কাজের মধ্যে এমন-কিছু মহত্ত্ব আছে। স্বজাতীয়কে অন্যের কাছে ধরিয়ে দেওয়াটা খুব জঘন্য কাজ, কিন্তু ধরিয়ে না দেওয়াটা একটা সাধারণ স্বাভাবিক কাজ। তার মধ্যে এতখানি বিশেষত্ব অটবী আবিষ্কার করল কী করে?

উভয়েই নিজের নিজের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল, কাজেই তাদের মধ্যে অল্প-স্বল্প দুটো চারটে মাত্র কথা হচ্ছিল, এবং তা-ও অনেক সময়ের ব্যবধানে।

এমনি একবারের বিরতির পর অটবী বলল, 'বলাদা, জমিদারের বড় বাড় বেড়েছে। তাকে একটু শাস্তি দেওয়া দরকার। তার এবারকার কাজের পিতিশোধ নিতে হবে।'

'পিতিশোধ? কিন্তুক কী করে? জমিদারের কত শক্তি!'

'ছাই শক্তি! চোর বাটপাড়ের আবার শক্তি কি? আমি ভেবে দেখেছি,

জমিদার যত না খারাপ, তার চেয়ে অনেক বেশী খারাপ এই শালার নায়েবটা। নিচ্চয় নায়েবের পরামশেই আজ জমিদার তোমাকে মারার হুকুম দিয়েছে। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, তারপর আমরা এই নায়েবটাকে খুন করব।'

শুনে বলরাম যত জোরে পারল হেসে উঠল।

'খুন? তুই কি পাগল হলি নাকিরে অটবী!'

অটবী বুঝতে পারল, সে একটু বেশী বলে ফেলেছে। কিন্তু লজ্জিত না হয়ে বলল,

'আচ্ছা আচ্ছা—খুন না হোক, জখম-টখম তো করা চলতে পারে।'

বলরাম তবু কথাটাকে আমল দিল না।

অটবী চলে যাওয়ার পর, বেলা যতই বিকেলের দিকে গড়িয়ে যেতে লাগল, ততই বলরামের গায়ের যন্ত্রণাও বেড়ে চলল। তখন অটবীর কথাগুলো বলরামের কাছে তেমন যুক্তিহীন মনে হল না। নানা রকম কালো কালো ভাবনার রাশি জট্ পাকিয়ে আসতে লাগল বলরামের মনে। নায়েব বলে গেল বটে, চুরি বন্ধের জন্য তাকে মার দেওয়া হল। কিন্তু চুরি বন্ধ করার জন্য চোরদের না মেরে তাকে মারার অর্থ কি? দিন কতক আগে অটবীর বাড়ীটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; তারই বা অর্থ কি? না—না, জমিদারের অন্য কোন গূঢ় মতলব আছে। নিশ্চয়ই জমিদার তাদের এ গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করতে চায়। এ জায়গাটার দাম এখন পঞ্চাশ হাজারের কম নয়। সোজা কথা! এ যা জমিদার, পয়সার জন্য এ সব করতে পারে।

রুগ্ন মাথায় বলরাম ভাবল না যে তাদের উচ্ছেদ করতে হলে জমিদারের অন্য সহজ পথ আছে।

সন্ধ্যাবেলা অটবী ফিরে এলে বলরাম বলল, 'তুই ঠিকই বলেছিলি অটবী। পিতিশোধ নেওয়া দরকার।'

অটবী সায় দিয়ে বলল, 'পিতিশোধ যদি না নি', তবে ওদের সাহস আরও বেড়ে যাবে। আরও বেশী অত্যেচার করবে।

তারপর অনেক রাত পর্যন্ত দুই-বন্ধুর মধ্যে চাপা গলায় আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। যখন সারা পাড়া নিঝুম হয়ে গেল, তখনো বলরামের ঘরে লম্ফের টিমটিমে আলোটা বাতাস না থাকা সত্ত্বেও কাঁপতে লাগল।

এগার

বেতুই ওয়াড়া ভেড়ীর ম্যানেজার সেদিন বিকেলেই ফিরে এসেছিলেন তিন তিনটে বেঁটে খাটো গাট্টাগোট্টা চেহারার কুকড়ি-ধারী নেপালী দারোয়ানকে নিয়ে। ভেড়ীর এলাকায় পা দেওয়ার পর তাঁর সঙ্গে দু' তিন জন গাঁয়ের লোকের দেখা হল। অন্যান্য দিনের মত আজ তারা এক গাল কৃতার্থের হাসি হেসে যুক্তকরে নমস্কার জানালো না। একটি লোকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে তিনি যখন মুখের চেহারা দেখে মনের ভাবটা বুঝতে চেষ্টা কোরছিলেন, তখন সে-লোকটাও তেমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই তাকে ফিরিয়ে দিল। গা-টা কেমন ছম্ ছম্ করে ওঠায় ম্যানেজার ভাবলেন, দলের আগে আগে থাকাটা একজন ম্যানেজারের পক্ষে ভাল দেখায় না; তাঁর পক্ষে শোভন মাঝখানে থাকা। তিনি দু'জন নেপালীকে সামনে দিয়ে তাদের পিছনে পিছনে হাটতে লাগলেন।

পরদিনও গাঁয়ের লোকেরা সযত্নে তাকে এড়িয়ে চলল। বলরাম খুব মার খেয়েছে তা তিনি শুনে এসেছিলেন, কিন্তু তার অবস্থা কেমন তা কাউকে জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পেলেন না।

কিন্তু দেখা গেল, নেপালীদের সম্পর্কে গাঁয়ের লোকদের দারুণ কৌতূহল এবং উৎসাহ। নেপালীদের এরা ভালভাবে গ্রহণ করবে না বলেই আশংকা ছিল, কিন্তু এরা তাদের সঙ্গে এমন ভাল ব্যবহার এবং হাসি-ঠাট্টা আরম্ভ করে দিল যে তারা যেন তাদের স্বজাতীয়। ভাষার অসুবিধা সত্ত্বেও ভাঙা ভাঙা হিন্দীতেই দিব্বি আলাপ চলতে লাগল, এমন কি কোন্ জিনিষকে নেপালী ভাষায় কী বলে তা জানার জন্যও এদের অসীম আগ্রহ দেখা গেল। ম্যানেজার ভাবলেন, ছোট জাত তো এরা, এদের তো চরিত্র বলে কোন জিনিষ নেই, তাই আড্ডা আর হৈ হুল্লোর জমানোর লোক পেলে, সে লোক ম্লেচ্ছ হোক, নোংরা হোক, বিদেশী হোক, তাতে তাদের কিছু অসুবিধা হয় না। সাধে কি আর তিনি এত গম্ভীরভাবে থাকেন এ-সব অঞ্চলে? তিনি যদি এদের সঙ্গে হাসতেন বা লঘুভাবে কথা বলতেন তবে তক্ষুনি এরা তাঁকে পেয়ে বসত। ভেড়ীর

ছোকড়া মালিক এদের সঙ্গে অবাধে মিশতে চেষ্টা করে নিজের সম্মান খুইয়েছেন। কিন্তু তাঁকে এখনো সবাই সমীহ করে চলে।

সন্ধ্যের পর নেপালী তিনজন নিজেরাই বাঁধ পাহারা দেওয়ার জন্য আলা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। বাঙালী কর্মচারী তিনজন নিজেদের কাজ কমেছে দেখে আর ঘর থেকে নড়তেও চায় না। একজন ভাতটা উনুনে চাপিয়ে দিয়ে এল; তারপর তিনজনে ম্যানেজারের থেকে খানিক দূরে তামাক নিয়ে বসে গল্প-গুজব সুরু করে দিল। গাঁয়ের গুটি কয়েক অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা, কেউ বা ন্যাংটো, কেউ বা সদ্য প্যাণ্ট পরেছে, কেউ বা প্যাণ্ট পরলেও যে-উদ্দেশ্যে প্যাণ্ট পরা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না, এসে পড়ায় আরও সুবিধা হল। ঠাট্টা মস্করায় আসর দিব্বি জমে গেল।

এদিকে নেপালী তিনজন বাঁধের বিভিন্ন দিক দিয়ে ঘুরে ফিরে শেষপর্যন্ত এসে জুটল কালীবাবুর ভেড়ীর আলাঘরে। বাবু সেদিন ভেড়ীতে ছিলেন না। এই সুযোগে গাঁয়ের লোকেরা তাদের নতুন বিদেশী বন্ধুদের এখানেই আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা করেছিল। নিধু ছিল, এবং আরও তিন চারজন তার সমবয়সী বন্ধু ছিল। নেপালীরা আসতেই লুকানো স্থানের থেকে তাড়ীর হাঁড়ি বের করা হল, গরম গরম তেলে-ভাজা আর পাপড় এল, আর এল এক জোড়া তেল চিটচিটে তাস। কালীবাবুর ভেড়ীর লোকেরাও এসে আসরে যোগ দিল। কয়েক পাত্র তাড়ী পেটে পড়তেই নেপালীদের চোখের সামনে থেকে বেতুই গাঁয়ের সামান্য ভেড়ী তো দূরের কথা, সমস্ত পৃথিবীটাই লুপ্ত হয়ে গেল। শুধু তাদের চোখের সামনে জেগে রইল রুইতন আর ইস্কাপন আর গোলাম আর টেক্কা। নিধু একটা আধা-অশ্লীল বাংলা টপ্পা গান নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে বিদেশী বন্ধুদের গেয়ে শোনালো। তাতে উৎসাহিত হয়ে একজন নেপালীও তারস্বরে তার স্বদেশীয় ভাষায় রচিত গান শুনিয়ে দিল। এই গানের রেশটা অল্প দূরের আলাঘরে বসে বসে ম্যানেজারও শুনতে পেলেন। খুসী হয়ে ভাবলেন, গান গাইতে গাইতে যখন নেপালীরা বাঁধ ঘুরছে, তখন পাহারার কাজটা তারা ভালই পারবে, কারণ কাজে তাদের আর শ্রান্তি বোধ হবে না।

এদিকে নিধুর বাক্-চাতুর্যে মুগ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে একজন নেপালী যখন

তার একটি বে-আইনী প্রেমের অভিজ্ঞতার গল্প রসিয়ে রসিয়ে বলছিল, তখন কোমরে এক ফালি মাত্র ন্যাক্‌ড়া জড়ানো গুটিকয়েক লোক অটবীর নেতৃত্বে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারের মতই কালো চেহারা নিয়ে বেতুইওয়াড়া ভেড়ীর জলে নেমে পড়েছে। নোংরা আর ঘোলা, সাপ আ'র জোঁক-ভর্তি সেই জলে সাপের মতই নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেই লোকগুলো জালের সাহায্যে নির্বিঘ্নে তাদের পেশাগত কাজ- গুছিয়ে নিচ্ছিল। তারা কাজ করে গেল একেবারে নির্বিঘ্নে।

পরদিন কালীবাবুর ভেড়ীর বাবু এসে গেলেন। কিন্তু তাতে নেপালী বন্ধুদের আপ্যায়ন করার কোন অসুবিধা হল না, বরং আরও সুবিধা হয়ে গেল। পাশের কাঁওড়াদের গ্রামের প্রান্তে একটি নষ্ট চরিত্রের নেপালী মেয়ে একটি আলাদা ঘর থাকে ; সেখানে আড্ডা জমানোর কথা বলতেই দু'জন নোপালী 'নোংরা কাজ' 'খারাপ কাজ' ইত্যাদি বলেও সহজেই রাজা হ'য়ে গেল। অবিশ্যি নেহাৎ বন্ধুত্বের অনুরোধেই, বন্ধুর কথার সম্মান রাখতেই, না হলে এ-সব কাজ তারা কখনো করে না। তৃতীয় নেপালীটি কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত চরিত্রবান হয়ে উঠল, এবং তার কর্তব্য-বুদ্ধিও তেমনি প্রবল দেখা গেল। নিধু যাওয়ার সময় তার টর্চ্চটা নিয়ে খেলতে খেলতে অলক্ষ্যে সুইচ্‌টা বিগ্‌ড়ে দিয়ে গেল। এ ও জানিয়ে দিয়ে গেল যে এ-সব বাংলা মুল্লুকে সাপের ভয় এবং ভূতের ভয় দুইই আছে। তাছাড়াও এমন সব মানুষ ভূত আছে যারা রাত্রে বল্লম নিয়ে ঘোরে ; নেপালীরা তাদের কাজে বাধা দেয় বলেই রাগ বশতঃ নেপালী দেখলেই বল্লম দিয়ে তারা পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয়।

এ-সব কথার ফল ফলতে দেরী হল না। এই দূর বিদেশের নির্জন এক প্রান্তরে, জরু এবং ঘর থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, নেপালীটা সুইচ্‌ টিপে যখন টর্চ্চের আলো জ্বালতে পারল না, তখন তার বুকে কাঁপুনি ধরল। সমবেত ইচ্ছা পিছনে থাকলে তবেই মানুষ সাহসী হয়, একা মানুষ সাধারণতঃ ভীরু। সঙ্গীহীন নেপালীটিও ভাবল, পৃথিবীতে সে মাত্র একটা পেট নিয়েই এসেছে। ফুটো হলে তার সেই একমাত্র পেটই ফুটো হবে ; ওদিকে ম্যানেজার কিন্তু আলাঘরে আরামে বসে চা আর সিগারেট খেতে খেতে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে

গল্প কোরছেন এবং তাই করতে থাকবেন। ভেবে-চিন্তে নেপালীটা ছপ্পরে গিয়ে উঠে গুঁটি-শুঁটি মেরে শুয়ে পড়ল। আর এদিকে, অন্ধকারেও যাদের দৃষ্টি চলে, এমন একদল লোক এতক্ষণ ধরে তাকে চোখে চোখে রেখেছিল। সে ছপ্পরে গিয়ে ঢোকায় নিশ্চিন্ত হয়ে এবারে জলে নামল।

তৃতীয় দিন সঙ্গী দু'জনের কাছে খাপছুরত মেয়েটির বিবরণ শুনে তার চরিত্র নষ্ট হওয়ার ভীতি উবে গেল। গঙ্গার পাড়ে পাপ করলেও তা অন্তরকে স্পর্শ করে না। না হয় পরদিন গঙ্গায় একটা ডুব দিয়েই আসা যাবে। কাজেই তৃতীয়দিন সে-ও নিধুদের সহগামী হল।

এমনি করে পুরো সাতদিন ধরে নেপালীরা বাঙালী জাতির আশ্চর্য বন্ধুকৃত্যে মুগ্ধ হয়ে কাটিয়ে দিল। দেশ থেকে অনেক দূরেও যে এমন ভূস্বর্গ থাকতে পারে, এবং শুধু মুখের কথায় নয়, টাকা খরচ করে বন্ধুত্ব করে এমন বন্ধু থাকতে পারে, জীবনে প্রথম এমন অভিজ্ঞতা লাভ করে তারা ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। ওদিকে নেপালীদের আশ্চর্য কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ ম্যানেজার এবং বাঙ্গালী কর্মচারী তিনজন আলাঘরে বসে বসে যজ্ঞেশ্বর, ধনঞ্জয় বা অমনি কারও সঙ্গে নিশ্চিন্তে আলাপ করে সন্ধ্যা কাটাতে লাগলেন। গাঁয়ের লোক দু'জন একজন কথা বলতে আসছে দেখে ম্যানেজার খুসীই হলেন। গাঁয়ের লোকদের রাগটা তবে থিতিয়ে আসছে! ছোটলোকের রাগ আর কতক্ষণ থাকে? কর্মচারীগুলো অবিশ্যি বুঝেছিল, নেপালীদের এরা রোজ তাড়ী খাওয়াচ্ছে। কিন্তু তাদের ফাঁকি দেওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়;—কিছু তাড়ী তারাও আদায় করে নিয়েছিল।

তারপর, সাতদিন পরে, যখন ভেড়ীতে মাছ বলতে শুধু রইল শ্যাওলা আর ঝাঁজি আর পচা হোগলার ডাঁটা, তখন নেপালীরা দুঃখিত হয়ে দেখল যে তাদের সুখ-নিশার ভোর এসেছে। এত প্রাণের বন্ধুরা আর তাদের আমলই দিতে চাইল না; নানা কাজের ধান্ধায় তাদের কথা বলার সময়েরও নাকি অভাব। অতএব মাটীতে ফিরে এসে তারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে রাত জেগে হাঁক ডাক করে টর্চের আলো ফেলে ফেলে ভেড়ী পাহারা দেওয়ায় মন দিল।

ক'দিন ধরে মাছ ধরা চলছিল, রোজ পাঁচ-সাত মণ করে মাছ উঠত

অটবীদের। এত মাছ চুরি করার ঝুঁকি কম নয়। জমিদার এবং ভেড়ীওলাদের লোকজন চারদিকে ঘোরা-ফেরা করে; তাদের মত মার্কামারা লোক যদি এত মাছ নিয়ে বাজারে যায় তবে স্বভাবতঃই কৌতূহল উদ্রেক করবে। কাজেই ভেবে-চিন্তে অটবী মাছ বিক্রি করার একটা পন্থা বের করেছিল। কেষ্টবাবুর ভেড়ী তাদের ভেড়ীর প্রায় লাগালাগি। কেষ্টবাবুর সঙ্গে সে গিয়ে চুক্তি করেছিল যে সমস্ত জ্যান্ত মাছ তারা ওজোন করে তাঁর ভেড়ীতে ছেড়ে দেবে। দাম ধার্য হল আশী টাকা করে মণ। তখন মড়া মাছই বাজারে একশ' টাকায় বিক্রি হচ্ছে; ভেড়ীতে চালা হিসাবে ফেলা যায় এমন জ্যান্ত মাছের দাম অন্ততঃ একশো কুড়ি, তার ওপর পরিবহন খরচও পড়ে অন্ততঃ টাকা পঁচিশ। কাজেই প্রায় আদ্ধেক দামে মাছ পাওয়ার আশায় কেষ্টবাবু খুসী হয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু মাছ যখন ফেলা হতে সুরু হল, কেষ্টবাবু মণ পিছু ত্রিশ টাকা করে হিসাব মিটিয়ে দিতে লাগলেন। অনেক বলা-কওয়ার পর তিনি আরও দশ টাকা করে বাড়িয়ে দিলেন। অটবী তবু ছাড়ল না, পরদিন গিয়ে বলল, 'আর টাকার কি হবে কেষ্টবাবু?'

কেষ্টবাবু বললেন, 'আর টাকা দিতে পারব না বাবু। চোরাই-মালের আবার কত দাম দেয় লোকে!'

'চোরাই-মাল কাকে বল্‌তেছেন?' অটবী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, 'ওরা বিবাগী মাছ। বিবাগী হয়ে অপরের ভেড়ী ছেড়ে আপনার ভেড়ীতে এইচে। আবার দরকার পড়লে বিবাগী হয়ে আপনার ভেড়ী ছেড়ে আর কোথাও চলে যেতে পারে। ত্যাখন কিন্তুক মোদের দোষ দেবেননিকো।'

কথাটা বুঝলেন কেষ্টবাবু। তক্ষুনি মণ পিছু আরও দশ টাকা করে বাড়িয়ে দিলেন, এবং আরও দশ টাকা করে পরে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এইভাবে অনেক শস্তায় মাছটা ছাড়তে হলেও তবু তারা পরিবার পিছু এই ক'দিনের কারবারে প্রায় এক দেড়শো করে টাকা পেয়ে গেল। অনেক ক'বছরের মধ্যে এত টাকা একসঙ্গে তারা কখনো পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে বেতুই গাঁয়ের বাসিন্দাদের জীবন-যাত্রা একেবারে পাল্টিয়ে গেল। গ্রাম-সুদ্ধ

লোক বাইরের কাজে যাওয়া বন্ধ করে দিল। পরের কাজ করতে গেলে যে সম্মানহানি হয় এ-বিষয়ে সবাই সচেতন হয়ে উঠল ; আর সম্মানহানিকর কাজে যাবে এমন বাজে লোক তারা কেউ হতে রাজী হল না।

জীবন যাত্রার নমুনা হিসাবে অটবী একটা দিন কিভাবে কাটিয়েছিল তার সন্ধান নেওয়া চলতে পারে।

বেলা প্রায় দশটা। এতক্ষনে অটবী কাজের মধ্যে বিছানায় বসে এক পর্ব তামাক শেষ করে বারান্দায় এসে বাঁশের খুটিতে ঠেস দিয়ে বসতে পেরেছে। হাঁক দিয়ে বলল, 'এই রাধা, এক ছিলুম তামাক সেজে দে দিনি।'

রাধার শরীরটা এখনো দুর্বল। অন্য সময় হলে এই দুর্বল শরীর নিয়েও তাকে কাজে বেরুতে হত। কিন্তু এখন গ্রামের পুরুষেরাই কাজে যাচ্ছে না, কাজেই মেয়েদের কাজে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে বাড়ীতে আর কোন মেয়েছেলে নেই বলে চাট্টি ভাত-মাছেরঝোল রাধাকে নামাতেই হবে। এতক্ষন গড়িমসি করে করে রাধা সবে রান্নার চেষ্টায় গিয়েছে। ইতিমধ্যেই সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে দু'তিনবার মন্তব্য করেছে, 'মেয়েছেলের কপালে আগুণ! তিনশো পয়ষট্টী দিনই তাকে হেঁসেল ঠেলতে হবে। মরণের দিন অবধি কামাই দেওয়ার জোটি নেই। একটা দিন আলিস্যি করবে তা হবেনি। যেন ভুতের চাকর! ইদিগে দ্যাখো তো মরদগুলো কেমন পড়ে পড়ে গড়াচ্ছে! যেন ধম্মের ষাঁড়!'

অটবীর হুকুম শুনে রাধা অমনি বলল, 'লাও, এখন ঠ্যালা সাম্‌লাও! আমি বলে সকাল থে' একটা মিনিট বসতে পারলাম না. আবার বাবুর লেগে তামাক সেজতে হবে। বলি, আ নিধে, দাও না গো বাবু মামাকে কল্কেটা সেজে। গুরুজনের সেবা করলে পুণ্যি হয়।'

নিধু অটবীর থেকেও বেশী এগিয়েছিল। সে উঠান অবধি গিয়ে একটা বাচ্চা আমগাছের ছায়ায় একটা ভাঙা মোড়া পেতে বসেছিল। মামীমার আদেশ অমান্য করতে পারল না। 'দিচ্ছি', বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাঁঠালকে দেখতে পেয়ে ডেকে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস হারামজাদা? কল্কেটা সেজে দে' যা।'

কাঁঠাল বিরস মুখে তামাক সেজে দিতে বসল।

দুপুর বেলা নিদ্রা। তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে অটবীর চা খেতে ইচ্ছে হল। বাড়ীতে চা'এর পাট কোনদিনই নেই। শহরে-টহরে গেলে কখনো-সখনো তারা রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে চা খায় আভিজাত্য হিসাবে। কিন্তু অটবীর হঠাৎ আজকে খেয়াল হল, ভদ্দরলোকদের মত সেও ঘরে বসে চা খাবে। বাবুরা আমিরী করতে পারে, তারা বুঝি পারে না!

নিধুর উপর হুকুম হল চা কিনে আনতে। নিছক সখ মেটানোর জন্য তিনপো মাইল হেটে দোকানে যেতে হবে? নিধু অপ্রসন্ন হয়ে কাঁঠালের খোঁজ করল। কাঁঠালকে পাওয়া গেল না বটে, তবে রাস্তায় একটি ন্যাংটো ছেলেকে দেখে বলল, 'এই হরে', দুটো পয়সা দোব 'খুনি। যা তো, দু'আনার চা, এক আনার দুধ আর এক আনার চিনি নে' এস্‌বি। ছুটে যাবি, আর ছুটে এস্‌বি।'

এরা ঘরে বসে চা খাবে শুনে হরি অবাক হয়ে নিধুর মুখের দিকে তাকালো; তারপর পয়সা নিয়ে ছুটল দোকানের দিকে।

সন্ধ্যেবেলা অবিশ্যি কাজ আছে। সবাই গা' ঝাড়া দিয়ে উঠল। তারপর কাজ-টাজ শেষ হলে রাত দশটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত চলল তাড়ী মাংস আর কীর্ত্তনের আসর। আলায় শুয়ে শুয়ে ম্যানেজার কীর্তনের শব্দে বিরক্ত হয়ে ভাবলেন, ইংরেজরা এ-দেশে এত কাজ করে গেল, আর মানুষের মুখের উপর একটা ট্যাক্সো বসাতে পারল না? চোরেরাও যদি রাধাকৃষ্ণের নাম নেয় তবে রাধাকৃষ্ণের নামের অসম্মানের আর কী বাকি থাকল?

এসব ঘটনার দিন কতক পরে, নতুন বছর সুরু হয়ে গেলে, একদিন ভেড়ীর মালিক সন্দীপ বাবু এলেন ভেড়ীতে। জমিদার বাকি খাজনার জন্য জোর তাগিদ দেওয়ায় কিছু মাছ ধরে বিক্রি করে টাকা তোলার দরকার হয়ে পড়েছে। দিন কতক তিনি কোলকাতা ছিলেন না। ফিরে এসে বলরামের ঘটনা শুনে তাঁর মনে খুব ভাল লাগেনি। মনে মনে তাঁর ইচ্ছা আছে বলরামকে বলে-কয়ে আবার কাজে বহাল করবেন।

গাঁয়ের থেকে তিন-চার জনকে ডাকিয়ে এনে ভেড়ীর কর্মচারীদের সঙ্গে জলে

নামিয়ে দিলেন। দু'তিন ঘণ্টা আপ্রাণ পরিশ্রম করার পর মাত্র তিনটি মাছ উঠল। অথচ তিনি জানেন, এখনকার কম জলে একবার দু'বার জাল দিলেই দু'তিন মণ মাছ ওঠার কথা।

সন্দীপবাবু প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এত মাছ দেখে গিয়েছি,—মাছ সব কী হল ম্যানেজার?'

ম্যানেজারও যেন বোকা বনে গিয়েছেন। যা তার কল্পনারও অতীত, এমন ঘটনা দেখে কী যে জবাব দেবেন, খুঁজে পেলেন না।

সন্দীপবাবুর মুখ এত করুণ, ম্যানেজার ভয়ে-দুঃখে-লজ্জায় প্রায় পাথর হয়ে গিয়েছে, কর্মচারীরা এর-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কোরছে; শুধু গাঁয়ের লোকদের মুখে চাপা খুসী যেন আর গোপন থাকছে না।

একজন বলল, 'মাছ-সব গরম নেগে সন্দিগর্মী হয়ে মরে গিয়েছে!'

আর একজন বলল, 'আছে, মাছ আছে। মাটীর নিচে পেইলে আছে। নজ্জা পেয়েছে বাবুকে দেখে।'

তৃতীয়জন বলল, 'মানাজারবাবু, গোপনে গোপনে বেচে দাওনি তো মাছ?'

সন্দীপবাবু বুঝলেন, তার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে, এবং একটা গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে। দশ হাজারেরও বেশী টাকার মূলধন শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে। কীভাবে কী ঘটেছে এই লোকগুলো হয়তো জানে; কিন্তু তা টেনে বার করা সহজ নয় আর বের করেই বা লাভ কি?

সেখান থেকে সন্দীপবাবু গেলেন বলরামের ঘরে। বলরাম সসম্ভ্রমে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালো।

বলরাম এখনো ভাল করে সারেনি। যেটুকু সেরেছে, তাতে ওদের মত লোক কাজে বের হতে পারে। কিন্তু হাতে কিছু পয়সা আছে বলে এখনো ঘরে বসে বিশ্রাম কোরছে।

সন্দীপবাবুকে দেখে বলরাম অবজ্ঞায় ঠোঁট বাঁকালো। ভদ্দরনোক ভেড়ীওলা, অথচ আধ-ময়লা কাপড় পরে এসেছেন! বলরামকে ডেকে না পাঠিয়ে নিজে বাড়ী বয়ে এসেছেন দেখা করতে! আর মুখের কী চেহারা হয়েছে!—যেন এক্ষুনি কেঁদে ফেলবেন!

'বলরাম, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে !'

তা বলরামকে বলে লাভ কি ? বলরাম কি তার প্রতিকার করতে পারবে ?

সন্দীপবাবু কত কী আশা করেছিলেন, বলরামের উপর তাঁর কত আস্থা ছিল, ম্যানেজারের ভুলে বলরামও জমিদারের মার খেয়ে কাজ ছেড়ে দিল, আর তাঁরও এত সাধের কারবারটা শেষ হয়ে গেল। তিনি আশা করেছিলেন, বলরামকে বলে কয়ে কাজে লাগাবেন, কারণ সে চুরি করেছিল বলে তিনি বিশ্বাস করেন না (বিশ্বাস করেন, কিন্তু তা নিয়ে জমিদারের কাছে নালিশ করাটা ভুল হয়েছিল)। কিন্তু এখন আর কোথায় কাজে লাগাবেন তাকে ?

শুনতে শুনতে বলরামের অসহ্য ঠেকল, অধৈর্য হয়ে বলল,

'এত হা-হুতোশ কোত্তেছেন কেন বাবু ? কারবার করতে গেলে নাভ আছে, নোকসানও আছে। একবার দশ হাজার গিয়েছে, আবার দশ হাজার ঢালুন। তাও যদি যায়, তো আবার ঢালবেন। জলের কারবার, জলে টাকা ফেলতে থাকুন। একদিন না একদিন জল আবার ফিইরে দেবে।'

'কিন্তু অত টাকা যে আমার নেই বলরাম।'

টাকা নেই, তবে বলরাম কি করতে পারে ? যে-ভদ্রলোকের টাকা নেই, তেমন ভদ্রলোকের প্রতি বলরামের শ্রদ্ধা জাগে না। এমন ফুটো পয়সার ভদ্রলোকের প্রতি এক ফোঁটাও সহানুভূতি নেই বলরামের।

সন্দীপবাবু যখন ফিরে যাচ্ছিল, রাধা আর অটবী ঘরে বসে দেখছিল।

রাধা বলল, 'বেচারার কারবারটা গেল ! আহা ! বড় ভাল নোক ছিল কিন্তুক যাই বল। এতটুকু দেমাক কি অংখার নেই।'

অটবী ধমক দিয়ে বলল, 'মর মাগী ! তুই আবার নাকি কান্না আরম্ভ করিস্‌নি এখন ! নোকটা তোর বাপের বাড়ীর কুটুম ? একটা ভদ্দরনোক ফেল হয়েছে তো কী হয়েছে ? অমন হাজার হাজার ভদ্দরনোক আছে পিথিবীতে।'

সন্দীপবাবু জমিদারের কাছেও গিয়েছিলেন। সমস্ত মাছ গাঁয়ের লোকে চুরি করে নিয়েছে তা তিনি বিশ্বাস করলেন না ! বললেন, 'মশাই, কারবার জানেন না, তবু কারবার করতে এয়েছেন ! মাছ কী করে জন্মাতে হয় জানেন

না বলে সব মাছ মরে গিয়েছে। এখন চুরির গল্প ফাঁদছেন যাতে খাজনাটা ফাঁকি দেওয়া যায়? জানেন, আমার জমিদারিতে একটা মাছ চুরি করলে তিন মাস বিছানায় পড়ে থাকতে হয়? দেখে আসুনগে বলরামকে! আর খাজনাটা দিয়ে যান ভালমানুষের মত!'

এরপর বাড়ী যাওয়া। কিন্তু বাড়ীতেও সন্দীপবাবুর জন্য এক ফোঁটা চোখের জল কেউ ফেলবে না। তাঁর নির্বুদ্ধিতা এবং অকর্মণ্যতাকে তীক্ষ্ণতম ভাষায় ধিক্কৃত করার জন্য যথেষ্ট শাণিত জিহ্বা বাড়ীর লোকদের আছে।

দিন কয়েক পরে একটা ভয়াবহ কাণ্ড ঘটল। গভীর রাত্রে নিতাই গিয়ে অটবী বলরাম প্রভৃতি তিন চার জন মাতব্বর গোছের প্রতিবেশীকে ডেকে নিয়ে এল গাঁয়ের মোড়ল সুধন্যের ঘরে। সুধন্য অবসন্নের মত খালি তক্তপোষের উপর শুয়ে আছে; ডান হাতের বাহু থেকে অঝোরে রক্ত গড়াচ্ছে, ন্যাক্‌ড়া জড়ানো আছে বটে কিন্তু সেটা রক্তে ভিজে চুবু চুবু হয়ে গেছে।

তাদের দেখে সুধন্য অপরাধীর মত বিষণ্ণ অপ্রতিভ ভাবে একটু হাসল। তাদের কৌতুহল নিবারণের জন্য সংক্ষেপে যে বিবরণ দিল তা এইরূপ: সে বিঘে কুড়ির একটা ছোট্ট ভেড়ী জমা নিয়েছে মাছের চাষ করবে বলে। কিন্তু হাতে যা সামান্য টাকা ছিল তা নিঃশেষ করে দিয়েও কাজ কিছুই হয়নি। এখুনি অন্তত তিন চারশো টাকা না হলে বাঁধ মেরামত, জল নিকাশ জঙ্গল পরিষ্কার প্রভৃতি কাজগুলো বৃষ্টির দিন আসার আগেই শেষ করা যায় না। তাই গিয়েছিলো নিতাই আর মনসাকে নিয়ে কুণ্ডুদের ভেড়ীতে চাট্টি মাছ ধরতে। গাঁয়ের লোকদের না জানিয়ে শুধু নিতাই আর মনসাকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই অপরাধেই বোধ করি তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছে। ভেড়ীর ম্যানেজার তাদের দেখতে পাননি। কিন্তু আন্দাজে যে গুলীটা ছুঁড়েছেন তা এসে লেগেছে সুধন্যের ডান হাতে।

অটবীর হাত দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সুধন্য ব্যাকুল হয়ে বলল, 'অন্যায় করেছি বলে কি তোরাও মাপ কোরবিনি! এখন এ হাত নে, আমি কী করব? গুলী না বের করতে পারলে তো মরে যাব।'

সুধন্য যদি সুস্থ দেহে মোটামুটি চুরি করে আনত আর সে কথা প্রকাশ হয়ে পড়ত, তবে তাকে মাপ করার কথা কেউ ভাবতও না। গাঁয়ের মোড়লের এমন স্বার্থপরতাকে কে সহ্য করবে? কিন্তু মোড়ল জখম হয়ে এসেছে তাও সবচেয়ে সাংঘাতিক অস্ত্রে, গুলীতে, কাজেই তার অপরাধের বিচারটা নিতান্তই নগন্য ব্যাপার হয়ে পড়ল।

সুধন্যকে এখন কী করে বাঁচানো যায় সেই চিন্তাটাই প্রধান হয়ে উঠল। প্রত্যেকেরই বিষন্ন আতঙ্কিত মনে শুধু একটা কথাই উঁকি মারছিল, তাদের যে কারও জীবনে, যে কোন সময়ে এমনি দুর্ভোগ জুটতে পারে এবং এমনি করে ঘরের মধ্যে বিনা চিকিৎসায় ভিতরের গুলীর বিষাক্ত প্রভাবে পচে পচে গলে গলে বীভৎস মৃত্যুর সম্ভাবনার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হতে পারে।

কারণ সমস্যাটা সত্যিই জটিল। আহতকে ঘরের বাইরে নেওয়া চলবে না। লোক জানাজানি করা চলবে না। শহরে হাসপাতাল বলে এক-রকমের জায়গায় এ সব রোগীর ভার যে নেয় তাও তারা জানে। কিন্তু রুগীকে সেখানেও দেওয়া চলবে না। আঘাতের চিহ্ন নিয়ে লোকটা যদি ধরা পড়ে তবে তার চুরি প্রমাণের জন্য আর কোন প্রমাণ লাগবে না। তখন জুটবে থানা-পুলিশ, হাজত, আদালত, এবং সর্ব-শেষে জেল। এ ব্যাপারগুলিকে তারা এত বেশী ভয় করে যে তার চেয়ে বরং চুপ-চাপ ঘরের মধ্যে মরে পড়ে থাকাও ভাল।

বলরামের জন্য আইডিন আনানো হল, তাই দিয়ে কোনরকমে সুধন্যের রক্ত বন্ধ করা হল। তারপর দীর্ঘ আতঙ্কিত শলা পরামর্শের পর সকাল বেলা বলরাম আর নিধুকে পাঠানো হল শহরে কোন ডাক্তার পাওয়া যায় কিনা সেইটে খুব সতর্কভাবে খোঁজ করে দেখতে। গাঁয়ের মধ্যে তারাই একটু ধীর স্থির বিবেচক স্বভাবের বলে তাদের পাঠানো হল।

ঘটনার একটু বিবরণ শুনেই দু তিন জন ডাক্তার সোজাসুজি কিছু করতে অস্বীকার করে বসলেন। শেষে একজন ডাক্তার রাজী হলেন, কিন্তু পুরো পাঁচশো টাকা ফী দাবী করে বসলেন। অনেক কাকুতি মিনতি করার পর তিনশোতে পর্যন্ত নামতে রাজী হলেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন টাকাটা

আগাম না দিলে এ সব ক্রিমিন্যাল কেশের ব্যাপারে তিনি বা কোন ডাক্তার নাক গলাতে রাজী হবেন না।

এত টাকা গাঁয়ের থেকে ওঠা সম্ভব কিনা বুঝে দেখার জন্য নিধু আর বলরাম গাঁয়ে ফিরে এল। ফিরে এসে দেখল গ্রাম লাল পাগড়ীতে ভর্তি। শুনল প্রত্যেকটি ঘর তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী করে পুলিশ সুধন্যকে খুঁজে বের করেছে। এর আগে তারা নাকি কাওড়াদের পাড়া সার্চ শেষ করে এসেছে। কুণ্ডু মশাই স্বয়ং আছেন পুলিশের দলের সঙ্গে। খুবই বুঝি পয়সার গরম হয়েছে কুণ্ডুমশাইয়ের? ভেবে দেখেননি বুঝি যে পৌষমাস জীবনে মাত্র একবারই আসে না?

পুলিশের ধারে কাছে বয়স্ক লোক একজনও নেই। সবাই যার যার ঘরে ঘরে বসে ভয়ে উত্তেজনায় আর নিষ্ফল রাগে সারা হচ্ছে। প্রত্যেকেই মনে মনে নানা জল্পনা কল্পনা কোরছে। পুলিস সম্পর্কে নয়; কি ভাবে কত তাড়াতাড়ি কুণ্ডুমশাইয়ের পক্ষ গজিয়েছে সেই সম্পর্কে। খানিক পরে এ্যাম্বুল্যান্স এলে ষ্টেচারে করে সুধন্যকে পুলিশ নিয়ে গেল। সুধন্যর আঘাত যদিও হাতে তবু অতিরিক্ত রক্ত-স্খলনে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে পুলিশ তাকে হাটিয়ে নিতে সাহস করল না।

নিজের হাতে ভেড়ী করবে জীবনের এই সাধটা পূরণ করবে ভেবেছিল সুধন্য। তার ভেড়ীতে এখন ব্যাঙ্ আর ভোঁদর নিশ্চিন্ত আরামে বসে বসে বর্ষার জন্য দিন গুনতে থাকবে নিরুপদ্রবে।

এই আকস্মিক আঘাতে গ্রামের লোক যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। কী যে করা উচিত বুঝতে না পেরে নিরুদ্যোগ হয়ে যার যার ঘরে চুপচাপ বসে রইল। যাদের অন্য কোথাও যাবার মতলব ছিল বা কথা ছিল, তাদের সে সব বানচাল হয়ে গেল। দৈনন্দিন সমস্যাগুলো আজকে তাদের কাছে তুচ্ছ সামান্য জিনিষ বলে মনে হল। আজকের সমস্যাটা মিটে গেলে কালকের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোটা যদিও তাদের ধাতে সয় না, তবু এমন একটা ঘটনা চোখের সামনে দেখলে ভবিষ্যতের কথা মনে না পড়ে পারে কি?

অনেক দূর ভবিষ্যতেও যে-দিনগুলি এমনি নিরাশাব্যঞ্জক আর শ্রীহীন থাকবে সেই দিনগুলির ব্যর্থ করুণ কাহিনী আজ মনে পড়ছে। যে ভাগ্য আজকে সুধন্যকে পুলিশ হাজতের দিকে টেনে নিয়ে গেল, সে ভাগ্য তো তাদের যে কারও জীবনে যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে। কোনদিনই কি ভাগ্যের এই টানাটানির হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই? কোনকালেই নেই?

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যে বেলাতেই জমিদার আবার তাদের সামনে আর এক মূর্তিতে উপস্থিত হলেন। জমিদার হঠাৎ ডেকে পাঠালেন গাঁয়ের লোকদের। অটবী, নিতাই, নিধু প্রভৃতি সাত আট জন তৎক্ষনাৎ রওয়ানা হয়ে গেল। বলরামেরও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু দুর্বল শরীর নিয়ে সকালে একবার সহরে গিয়েছে বলে এ বেলা যেতে গাঁয়ের সবাই নিষেধ করল।

তারা যেতেই জমিদার বলে উঠলেন, সারাদিন বাড়ীতে বসে ফিস্-ফাস্ কোরছিস্; কেন, আমাকে একবার খবরটা দিতে হয়েছিল কি?'

'আজ্ঞে কর্তাবাবু, ভয়ের চোটে মোদের মাথার কি আর ঠিক আছে?' নিতাই জবাব দিল।

'এ সব থানা-পুলিশের ব্যাপারে চেষ্টা করলে আমি একটা কিনারা করতে পারি তা কি তোরা জানিস্ না? কি বলছিস্ রে হাঁদারামের দল?'

সবাই চুপ করে থেকে ত্রুটি স্বীকার করে নিল। বলল না যে তারা ঠিক আস্থা স্থাপন করতে পারেনি।

জমিদারই যা করার করলেন, তাদের শুধু তিনশো টাকা দিতে হল। মাছ চুরির টাকার শেষ-মেষ যা সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিল ঝেড়ে পুঁছে টাকাটা জোগাড় হল। সুধন্যই আবার টাকাটা তাদের আস্তে আস্তে শোধ করে দেবে, জমিদার নিজে দায়ী থাকবেন।

পরদিন থানার দারোগা কুণ্ডুমশাইকে ডাকিয়ে এনে বললেন, 'মশাই আপনার কেশটা তুলে নিন, বুঝলেন। বিশেষ হাঙ্গামা নেই। কেশশুধু

আমাদের কাছে লিখুন যে ভুলবসতঃ আপনি ডায়েরী করিয়েছেন যে সুধন্য চুরি করতে গিয়ে গুলীবিদ্ধ হয়েছে। পরে আপনি প্রকৃত তথ্য জানতে পেরেছেন যে কয়েকজন শিকারী পাখী শিকার করতে গিয়ে গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

কুণ্ডুমশাই অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী বলছেন দারোগা বাবু? আপনাকে পাঁচ শো টাকা দিয়ে সদ্য সদ্য সার্চ করিয়ে চোর ধরলাম,—সে কী ব্যাটাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য?'

'যা বল্‌ছি শুনুন। সুধন্যের পিছনে কে আছে জানেন? স্বয়ং কাঞ্চন রায়। আপনি মানে মানে সরে না দাঁড়ালে, কাঞ্চনবাবু আপনার বিরুদ্ধে তাই বলে নালিশ করবে যে সুধন্য আপনার জায়গায় যায় নি, আপনি আক্রোশ বশতঃ খুন করার জন্য তাকে গুলী করেছিলেন। কেমন বোঝেন?—কাঞ্চন রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পান?'

কাঞ্চন রায়কে কুণ্ডুমশাই চেনেন। চোরকে শায়েস্তা করায় তাঁর উৎসাহ ছিল। কিন্তু তিনি কারবারী লোক; কাঞ্চন রায়ের মত দুর্দ্ধর্ষ মামলাবাজের বিরুদ্ধে অনিশ্চিত ফলাফলের জন্য মামলা করার মত শ্রম এবং অর্থ তাঁর নেই। দারোগার কথা মতই তিনি কাজ করলেন।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ঝড়ের বেগে বেতুই গাঁয়ের উপর দিয়ে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। যখন একটু নিশ্বাস ফেলার অবকাশ মিলল, তখন একদিন অটবী বলরামের কাছে বিস্মৃত-প্রায় কথাটা তুলল, 'বলাদা, ম্যানুজার অন্যায় করেছিল, তার উপযুক্ত পিতিশোধ আমরা নিইছি। এবার বাকি আছে মোদের লায়েব। তার কী ব্যবস্থা কত্তেছ গো বলাদা?'

বলরামের রাগ ইতিমধ্যে অনেক ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। বলল, 'মিছিমিছি মাথা গরম করিস্‌নি অটবী। ঐটেই তোর বড্ড দোষ। দেখলি তো, জমিদারকে মোরা যাত খারাপ ভাবি, আসলে সে তত খারাপ লয়। সুধন্যকে বাঁইচে দিল তো বটে! আসলে ঐ নায়েবটাই অসৎ পরামশ্য দিয়ে জমিদারকে মাঝে মাঝে বিগ্‌ড়িয়ে দেয়।'

অটবী সোৎসাহে বলল, 'আমিও তো তাই বলতেছি বলাদা। জমিদার

ভাল মন্দে মিশানো মুনিষ। কিন্তুক এই নায়েব একটা দুশমন। একে কঠিন শাস্তি দিতে হবে বলাদা।'

'ভগমানের কাজ ভগমান কোরবেন,—আমরা কেন মিছামিছি বদ্‌নাম কুড়োতে যাই? জানিস্ তো, ক্ষ্যামার বাড়া ধম্মো নেইকো।'

অটবী বুঝল, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বলরাম লাইন-মত কথা বলতে সুরু করেছে; এখন সে হাজার হাজার নীতি-ধর্মের যুক্তি দিতে পারবে, যে-যুক্তিগুলির প্রতিবাদ করা শক্ত, কিন্তু মেনে নেওয়াও যায় না।

বলরামকে সে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিল। বলরামের সঙ্গে ঝগড়া না করে থাকা চলতে পারে। কিন্তু বন্ধু বলরাম হতে পারবে না, কোনদিনও না।

বারো

বেতুইওয়াড়া ভেড়ীর মাছ চুরির পাট শেষ হয়ে গেলে অটবী একদিন নিধুকে বলল, 'কিরে নিধে, তুই যে আর কাজে ফিরে যাবার নামটি কত্তেছিসনি !' কাজ ছেড়ে দে' এইচিস একবারে ?'

একদিনের জন্য নিধু গাঁয়ে বেড়াতে এসেছিল। কিন্তু এসেই নানা উত্তেজনা পূর্ণ ঘটনায় বিশেষ করে মাছ-চুরির নেশায় পড়ে কাজে তাড়াতাড়ি ফেরার কথা তার প্রায় মনেই ছিল না।

এদিকে বৈশাখ মাস পড়তেই গোপার একটি ছেলে হয়েছে বলেও নিধু খবর পেয়েছে। সেখানে যাওয়ারও খুব তাগিদ ছিল মনে। তাদের হিসাবে ন'মাসের মাথাতেই ছেলেটা হয়েছে। খবরটাতে নিধুর মন মোটেই আশ্বস্ত বোধ করতে পারছে না। জানা দরকার, প্রকৃতই ন'মাসে ছেলে হল ; না নিত্যানন্দদা যেমন বলেছিলেন, সেই হিসেবে স্বাভাবিক দশ মাসেই হল। তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো প্রকৃত রহস্যের কিনারা করা যায়।

তবু নিধু প্রথমে চাকুরীর জায়গায় যাওয়াটাই সঙ্গত মনে করল।

'বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে, মামা, দেরী হয়ে গেছে। আমি আজকেই বানতলা যাব।'

অটবী হেসে বলল, 'আজকেই যাবি ? বৌ-এর ছেলে হয়েছে, পেথম ছেলে,—না দেখেই যাবি ?'

'তাই যাই,—বড্ড যে দেরী হয়ে গেছে।'

'বেশ ! বেশ ! মোদের নিধুর বড় চাকরী অন্ত পান !'

কথাটার মধ্যে একটু শ্লেষ ছিল। ওদের গাঁয়ের লোকদের মনোভাবটাই এই ধরণের। চাকরীর প্রতি খুব মায়া বা দরদ দেখানো তাদের কাছে একটা মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ। তারা দিন মজুরীতে বা ফুরণে খুচরো কাজ করে। পনেরো দিন কাজ জোটে তো আর পনেরো দিন পেট আগলিয়ে ঘরে বসে থাকে, নয়তো চুরি করে। তবু কেউ নিশ্চিন্ত বাঁধা-মাইনের চাকরি বজায়

রাখার জন্য ব্যাগ্রতা দেখালে তারা অনায়াসে ভাববে, লোকটা একেবারে পরের চাকর বনে গেছে। যেমন সাহেবদের অফিসে কাজ করতে গেলে ভদ্রলোক কেরাণীরা পরের চাকর বনে যায়।

নিধুর কিন্তু বিশ্বাস, এখনো বিশ্বাস, সে ভাল মালিকের সঙ্গ ধরে থাকলে কালে কালে অনেক উন্নতি হওয়ার আশা থাকবে। বানতলার যে ভেড়ীতে সে কাজ করে, তার ম্যানেজার তো একই মালিকের কাছে দশবছর ধরে আছে; সাধারণ মুহুরি হয়ে ঢুকেছিল, এখন ম্যানেজার হয়েছে। ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করতে হলে এই সব দেখতে হয়। তাড়ী খেয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকলে চলে না।

সেইদিনই নিধু বানতলার উদ্দেশ্য রওয়ানা হল। যেতেই ম্যানেজার দেরী-টেরী হওয়ার কারণ-টারণ শুনে তাকে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে বলল। অগত্যা ভোর চারটের সময় ভারীদের সঙ্গে নিধুকে শিয়ালদার আড়তে আসতে হল।

গাদা-গাদা বাক্স আর চাকান-বোঝাই চালানি মাছ। তার ফাঁকে ফাঁকে এক ফালি রাস্তা বাঁধানো হলেও মানুষের পায়ের কাদায় কাদায় চ্যাটচ্যাটে হয়ে গিয়েছে।

পাইকারদের ঠেলাঠেলি ভীড়। তার মধ্যে কয়ালরা মাছের গাদার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিলামের সর্বোচ্চ দর চীৎকার করে ঘোষণা করছে। মালিক অনেক পিছনে একটা প্যাকিং বাক্সের উপর বসে। বহু কষ্টে ভীড় ঠেলে তাঁর কাছে পৌঁছে নিধু নিজের পরিচয় দিল।

'তুমি কয়েকদিন খবর না দিয়ে কামাই করেছ, না?'

'আজ্ঞে, মামীমার দারুণ ব্যায়রাম হয়েছেল। বাঁচে কি মরে ঠিক ছেল না. তাই—'

'বুঝেছি, তোমাকে জবাব দিলাম। তোমাকে আর আমার দরকার নেই।'

নিধু আশঙ্কা করেছিল, কামাই-এর জন্য তাকে কিছু বকুনি সহ্য করতে হবে; কিন্তু একেবারে কাজে জবাব হয়ে যাবে এতটা ভাবতেও পারেনি।

শুকনো মুখে বলল, 'বাবু, গরীবের ভাত মারবেন? আপনাদের দয়াতেই

তো মোরা গরীব নোকেরা বেঁচে থাকি।—এবারটি মাপ করে দিন, বাবু! আর কক্কনো এমন করবনি।'

মালিক অন্যদিকে মন দিয়েছিলেন। সেইদিকে চোখ রেখেই বললেন, 'হবে না। কাজের সময় ঝামেলা করো না। চলে যাও, অন্য চেষ্টা দেখ।'

নিধু তবু অপেক্ষা করতে লাগল, কাজের ভীড় কমলে বাবুকে ভাল করে ধরবে এই অভিপ্রায়ে।

এমন সময় তাদের ভেড়ীর একটি লোক ছুটতে ছুটতে এসে মালিকের কাছে গিয়ে বলল, 'বাবু, ম্যানেজারবাবু বলে দিলেন, নিধুকে ভুল করে তিনি কামাই-এর সময়ের মাইনেটা দিয়ে দিয়েছেন। টাকাটা ফিরিয়ে নিতে হবে।'

কাল রাত্রেই নিধু কুড়ি দিনের বাকি মাইনেটা চেয়ে নিয়েছিল বটে।

মালিক তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক'দিন কামাই করেছ?'

'এগাড় দিন।'

'তবে এগারো টাকা ফিরতি দিয়ে দাও।'

নিধু বলল, 'বাবু, আমি তো কাজ করতে চাইছি। কাজ করলে সামনের মাসের মাইনের থেকে তো কেটে নিতে পারবেন।'

মালিক তৎক্ষণাৎ তার লোকজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই, একে ধর তো। ব্যাটার টাকা মেরে দেওয়ার মতলব।'

সঙ্গে সঙ্গে নিধু কিছু বলার আগেই তিন-চার জনে হাতের কাজ ফেলে এসে তাকে এমন করে চেপে ধরল যাতে সে আর হাত-পা না নাড়তে পারে। জামার পকেটে হাত দিয়ে টাকা না পেয়ে তার কাপড় ধরে টান দিয়ে তাকে প্রায় ন্যাংটো করে ফেলে কাছার খুঁটের থেকে টাকাটা উদ্ধার করে তারা মালিকের হাতে দিল। মালিক বিজয়-গর্বে হেসে কুড়ি টাকার থেকে এগার টাকা রেখে বাকিটা নিধুকে ফিরিয়ে দিলেন।

তার মামা যদি এমন অবস্থায় পড়ত তবে হয় তো একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত। নিধুর ধৈর্য অনেক বেশী। এত অপমানের পরেও সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, চাকরিটা বজায় রাখার জন্য একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখলে, অর্থাৎ মালিকের পা জড়িয়ে ধরলে, কিছু লাভ হবে কিনা। তার

মামার এমন ব্যাপারে যতখানি অপমান-বোধ হত, তার কি তার চেয়ে কম বোধ হয়েছে? তা নয়, কিন্তু তার মামার চেয়ে সে এইটুকু বেশী জানে যে বেতুই গাঁয়ের লক্ষ্মীছাড়া বাসিন্দাদের চেয়ে যদি আরও কিছু বেশী জীবনে আশা করতে হয়, তবে গায়ের চামড়াকে একটু পুরু করতে হবে। ভদ্রলোকদের স্বভাব এবং চরিত্র সম্বন্ধে তার অনেক মোহ ইতিমধ্যে ভেঙে গিয়েছে; কিন্তু সেই সঙ্গে সে আগের চেয়েও ভাল করে বুঝেছে যে জীবনে উন্নতি করতে হলে একমাত্র ভদ্র এবং ধনী লোকদের হাত ধরেই তাকে উঠতে হবে। পয়সা রোজগারের যত রকম কলকাঠি আছে সব এদের হাতে।

ভাবতে ভাবতে কখন যে অন্যমনস্কভাবে নিধু মাছের বাজার ছেড়ে নফর বাবুর বাজারের বাইরে বেরোবার গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়ালও ছিল না। যখন খেয়াল হল, ভাবল, আবার ফিরে যাবে; শেষ চেষ্টাটা না করার আফশোষটা কেন আর মনে থাকতে দেয়? কিন্তু পরক্ষণেই অত্যন্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে ভাবল, না, সে ফিরে যাবে না, কিন্তু আর একটা কাজ জোগাড় না করে সে আর কিছুতেই বেতুই গাঁয়ের দিকে পা বাড়াবে না।

গোপাকে দেখতে যেতে হয়তো দেরী হয়ে যাবে; কিন্তু উপায় কি?

গোপার প্রথম জাত-পুত্র প্রকৃতই তারও ঔরস-জাত কিনা নির্ধারণ করার সময় হয়তো পার হয়ে যাবে। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের চেয়ে অনেক অনেক বেশী প্রয়োজনীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা-লাভ। এখন থেকে যদি সে আপ্রাণ চেষ্টা না করে, যদি সে অন্য সব আকর্ষণের থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে অর্থ-রোজগারের জন্য উদ্যোগী না হয়, তবে সে-ও একদিন সেই বেতুই গাঁয়ের লক্ষ্মীছাড়াদের একজন হবে।

নিধুর ভাগ্য ভাল; পাঁচ-সাত দিন ধরে ধাপা-বাঁনতলা অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটা ভেড়ী ঘুরে ঘুরে কোন স্থায়ী কাজ না পেয়ে সে যখন প্রায় নিরাশ হয়ে গিয়েছিল, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে একটা কাজ জুটে গেল।

কাজটা যে জোগাড় করে দিল তাকে পাঁচটা টাকা দিতে হল। টাকা দেওয়ার সময় ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল কত মাইনে দেবে গো?'

'পুরোপুরি আধশো। কিন্তু ও সব জায়গায় মাইনে না পেলেও চলে।'

'সে কি ? কী ভাবে ?

'ও-সব জায়গায় কর্মচারীদের আলেদা নৌকো থাকে। যেমন ওজ সকালে মালিকের মাছ এসবে, তেমনি কর্মচারীদের মাছও এসবে। নদীর এন্তার মাছ ; গণা-গণতি তো নেই। যে য্যাত কুড়িয়ে নিতে পারে।'

মালিকের লঞ্চে করে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে কিন্তু নিধু বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়ল। ক্যানিং থেকে অনেক দূরে সুন্দরবনের এ অঞ্চলটায় এখনো লোক-জনের বসতি হয়নি। ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ একটি দ্বীপ। এই জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে বাঁধ বেঁধে ভেড়ীর কাজ চালু করতে এখনো দু' বছর সময় লাগবে। তবু পঞ্চাশটা টাকার কথা স্মরণ করে নিধু নিজের মনকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করল। নিজের জন্য পাঁচ টাকা রাখবে, বৌ-কে পঁচিশ টাকা পাঠাবে ; আর পুরোপুরি কুড়ি টাকা করে প্রতি মাসে জমতে থাকবে তার। নেহাৎ মন্দ কি ?

সারাদিন তারা পঁচিশ ত্রিশ জন লোক পাড়ে থেকে জঙ্গল কাটে, ঘর বাঁধার কাজ করে, আবার সন্ধ্যা হতেই লঞ্চে এসে আশ্রয় নেয়। রাত্রিবেলা জঙ্গলের উন্মত্ত বাঘের হুংকার বুকে কাঁপুনি জাগায়। এমনি করে দিন সাতেক চলার পরে ঘর শেষ হতেই মালিক হুকুম দিলেন, সেই ঘরে রাত কাটাতে হবে। বন্দুক ২বিশ্যি আপাতত নেই, কিন্তু সড়কি টড়কি থাকবে ; আর তা ছাড়া প্রকাণ্ড আগুনের কুণ্ডু জেলে নিলে বাঘ সিংহের সাধ্য কি কাছে ঘেঁসে ?

মানুষের অনধিকার প্রবেশে বাঘের দল যে কতখানি ক্ষিপ্ত হয়েছে, প্রথম দিনই তার প্রমাণ দিল। তারা সকলে বাইরে আগুনের কুণ্ডু তৈরী করায় ব্যস্ত ছিল, এমনসময় পিছনের বেড়া ভেঙে বাঘ ভিতরে ঢুকে একটি লোকের উপর থাবা বসাল। লোকটা ঘরে একা ছিল ; তার উন্মত্ত চীৎকারে বাইরের সকলে চীৎকার করে শড়কী নিয়ে দৌড়িয়ে আসায় বাঘটা পালিয়ে গেল। কিন্তু সেদিন আর কারও ঘরে এসে আরামে শোয়া হল না। প্রচণ্ড গরমের দিনে বিরাট লোহা-গলানো অগ্নিকুণ্ডের সামনে কারো ঘুম এল না। সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশের বাঘে-মানুষের যুদ্ধের গল্প করে করে তারা কোনরকনে ভয়ের আর উদ্বেগের রাতটা কাটিয়ে দিল।

পরদিন লঞ্চ রওয়ানা হয়ে যাবে ; আর লঞ্চ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগও ছিন্ন হয়ে যাবে। এদিকে বসতি হয়নি বলে নৌকা-চৌকার বিশেষ যাতায়াত নেই।

মালিক একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক। পাকা ব্যবসায়ী। বাঘের কথা শুনে সেই রাত্রিবেলা তিনি কর্মচারীদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে গেলেন। জানালেন, তারা যদি ভয় না পেয়ে কাজে লেগে থাকে তবে এখানে তাদের সারা জীবনের মত একটা হিল্লে হয়ে যাবে। দশ হাজার বিঘার সবটাই এখানে নিচু জায়গা নয়। হাজার তিনেক বিঘা নিচু জায়গায় ভেড়ী হবে। বাকি জায়গাটায় গ্রাম এবং চাষ পত্তন করবেন বলে তিনি ঠিক করেছেন। ওরা যদি টিঁকে থাকে তবে তিনি ওদের ঘর তোলার এবং চাষের জায়গা দেবেন সামান্য খাজনায়। আর ওরা এ অঞ্চলের লোক, ওরা কি তবু বাঘকে ভয় করবে ?

নিধু বলল, 'বাঘ আমি ভয় করিনা। মোর বাপ ঠাকুর্দারা এই সুঁদরবনে বাঘ সিংহের সঙ্গে লড়াই করে গাঁ বসিয়েছেল, ধান-ক্ষেত করেছেল। বাঘ জব্দ করার কায়দা আমি জানি।'

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'তাই নাকি ! বাঃ ! তোর মত সাহসী ছেলেই আমার দরকার ! লেগে থাক্, তোর আমি কী করে দি দেখিস্।'

'আপনাদের দয়াই তো গরীব নোকের ভরসা।'

'তা আমার উপর ভরসা করে থাক। ঠকাব না। আমার বন্দুকটা তোর হাতেই দিয়ে যাব।'

নিধু চোখ মুখ চক্‌চকে করে বলল, 'বন্দুক আমি খুব ছুঁড়তে পারি।'

নিধু আগেই লক্ষ্য করেছিল, বন্দুকটা পাখী শিকারের, বাঘ শিকারের নয়।

ভদ্রলোকটি নিধুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করলেন। অন্যের থেকে গোপন করে তিনি নিধুর দশ টাকা মাইনে পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন। সুযোগ বুঝে নিধু নিজের জন্য এবং তার একজন সঙ্গীর জন্য পাঁচটাকা করে মাইনে থেকে আগাম নিয়ে নিল।

সেই পাঁচটাকা লঞ্চের ড্রাইভারকে ঘুষ দিয়ে লঞ্চ ছাড়ার আগে তারা দুজ'ন

কোনরকমে পাটাতনের নিচে একটু আশ্রয় জুটিয়ে নিল। ভাপ্‌সা গরমের মধ্যে সারাদিন খুবই কষ্টে কাটল। তবু যে শেষ পর্যন্ত ক্যানিং এসে নামতে পারল তাইতেই নিধু ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।

সুন্দরবনে বাঘ-সিংহের প্রতিবেশী হয়ে থাকার সময় শেষের দিকটায় গোপার কথা বড্ড বেশী করে মনে পড়ত। এবার আর কোন কাজ নয়; সোজা বাড়ীতে শুধু একবার দেখা দিয়েই সে চলে যাবে গোপার কাছে। সে একটা ভাল চাকরি জোগাড় করে গোপার কাছে গেলে অবিশ্যি সে শুনেও খুসী হত, তারও বলতে ভাল লাগত। কিন্তু যা হবার নয়, তার জন্য মন খারাপ না করাই ভাল। এখন ভগমানের ইচ্ছায় গোপা সম্পর্কে নিত্যানন্দের কথাটা মিথ্যা বলে প্রমাণ হয়, আর সে নিশ্চিন্ত মনে গোপা এবং শিশু পুত্রকে নিজের বাড়ীতে এনে ফেলতে পারে, তবেই একদিক দিয়ে অন্ততঃ মনটা তার অনেকখানি হাল্কা হয়ে যাবে।

বেতুই গাঁ-এর চৌহদ্দির মধ্যে অবিশ্যি সে আট্‌কা পড়ে থাকবে না; গোপা এবং পুত্রকেও যথাসময় এই বিষাক্ত আবহাওয়ার বাইরে নিয়ে আসবে। এক পৈতৃক ভিটা আর এক চিলতে একটি পৈতৃক ঘরের উপর তার কোন মোহ নেই। প্রতিবেশীদের মত জমি-জমার নাম শুনলেও তার জিহ্বায় রস জমে না। এমন কি এরপর সে মাছের লাইনটাও ছেড়ে দেবে। হঁ্যা, ট্রেনে আসতে আসতে এ বিষয়ে সে একরকম মনস্থির করেই ফেলেছে। মাছের ব্যবসাটাই অভিশপ্ত; এ কারবারের মধ্যে থেকে তাদের জাতির কেউ আজ পর্যন্ত কোন উন্নতি করতে পেরেছে এমন তো তার চোখে পড়ল না। আর হবেই বা না কেন অভিশপ্ত! কৃষ্ণের জীব তো বটে এই মাছও; মাছের কারবার তবে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে জীবহত্যার কাজ। তাতে কি কখনো ভাল হতে পারে কোন মানুষের? বিশেষ করে যারা বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত? মাছের কারবার ছাড়া আরও কত কাজের লাইন আছে বিশাল কলকাতা সহরে। দু' পাঁচ জন ভদ্র-লোককে ধরে একটা না একটা সে যোগাড় করে নিতে পারবেই। এটুকু আত্মবিশ্বাস তার মনে এখনো বজায় আছে।

তেরো

সাত মাস পরে বাপের বাড়ীতে ফিরে এসে ষোল বছরের মেয়ে গোপার মনে হল যেন রুক্ষ অনুর্বর বিদেশে অনেক কাল কাটিয়ে সে সুজলা সুফলা দেশের মাটীতে ফিরে এসেছে। আর এসেছেও সে এমনি সময়ে যখন এই কৃষিপ্রধান গ্রামটার পথ-ঘাট-মাঠ সব সদ্য ওঠা নতুন ধানের মদির গন্ধে ভরপুর ; ঘরে ঘরে এখন মড়াই-ভরা ধান, গাদা গাদা সোনালী খড় সাজানো রয়েছে প্রতি ঘরের প্রবেশ পথে। উঠানে উঠানে প্রতিদিন ধান মলন চলছে, তেমনি শোনা যায় শেষ রাত্রে শীতকালের উষ্ণ মায়া-ভরা কাঁথার নিচে শুয়ে শুয়ে আধা জাগরণের আবেশের মধ্যে গ্রাম বধূদের একটানা ঢেকিতে পাড় দেওয়ার শব্দ।

গ্রামের এই পরিপূর্ণ চিত্রখানি গোপার কী ভালই যে লাগল !

বড়দাদা তাকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, বরের ঘর পছন্দ হয়েছে তো তোর ?'

লজ্জিত হওয়ায় গোপার মুখটা বাদামী হয়ে উঠল। চট্ করে সে কোন জবাব দিল না। এ-সব প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতে নেই। কিন্তু নিচের ঠোঁটখানা উল্টিয়ে দিয়ে মনোভাব খানিকটা প্রকাশ করেও ফেলল।

বড়দা তৎক্ষণাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে গোপার হাতখানা ধরে ফেলল, যাতে সে উত্তর না দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে।

'ঠিক করে বল্‌দিনি গোপা,—ব্যাপারখানা কি ? ঘর পছন্দ হয়নি ?'

হাত ছাড়াতে চেষ্টা করেও যখন হাত ছাড়াতে পারল না, তখন গোপার মনে হল, এবার জবাব দিলে বোধ হয় দোষ হবে না। মাটীর দিকে চোখ রেখে জবাব দিল, 'ছাই ঘর !'

'ছাই ? কেন ছাই বল্‌ ? না বললে, ছাড়া পাচ্ছিসনি কো—ঠিক জানবি।'

'এক ফোঁটা ভিটে,—আগাছায় ভর্তি। এট্টুন একটু ঘর,—পা ফেলার জায়গা নেই। গাঁটাই লক্ষ্মীছাড়ার গাঁ!'

গোপার যখন বিয়ে হয়, তখন বাবা বেঁচে ছিলেন। স্বভাবতঃই বিয়ে ঠিক করার ব্যাপারে বড়দাদার কোন হাত ছিল না। বড়দা খুসী হয়ে বলল, 'বাবা যখন তোর বে' দিল, তখনই জানতাম এ ঘরে তোর মন টিঁকবে না। ঠিক তাই হল কিনা তা দ্যাখ! তখন আমার মত যদি নিত তবে দেখতিস্ কেমন বে' দিতাম তোর। তা যাক্‌গে. তবে বরটা পছন্দ হয়েছে তো তোর না—না আর কিছু বল্‌ব না তোকে, শুধু এই কথাটার জবাব দে' যা।'

এ কথার জবাব গোপা কিছুতেই দিল না। হাত টানতে টানতে হাত লাল করে ফেলল। শেষে দয়া হওয়ায় বড়দা হাতে একটু ঢিল দিতেই ছুটে পালালো। কিন্তু যাওয়ার সময় এবারও সে ঠোঁটটা একটু বাঁকিয়ে গেল।

কিন্তু সেইটুকুই ভগ্নী-অন্ত প্রাণ বড়দার পক্ষে যথেষ্ট। বড়দা আর তার ছোট মেজদা, এই দুই ভাইএর মধ্যে তৎক্ষণাৎ পরামর্শ সভা বসে গেল। বাবা যে অন্যায়টা করে গেছে তার প্রতিকার সহজ নয়। তবে অন্যায়টা সম্বন্ধে আলোচনা করলেও মনের ঝাল খানিকটা মেটে।

তার ঠোঁট বাঁকানোটা যে দাদারা বরের প্রতি তার বীতরাগের লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছে তা গোপা বুঝল। তখন সে ভাবতে বসল, কেন সে অমন করে ঠোঁট বাঁকাতে গেল? এমন তো নয় যে সে নিধুকে ভালবাসে না! নিধুর পেশাটা অবিশ্যি তার পছন্দের নয়। আর তার বাড়ীটার কথা অবিশ্যি না বলাই ভাল নিধুর যদি দু'চার বিঘে অন্ততঃ চাষের জমি থাকত, আর চাষীদের বাড়ীর মত খড়ের গাদা আর ধানের মাড়াইয়ে সমৃদ্ধ একখানা বাড়ী থাকত তবে নিঃসন্দেহে ভাল হত। কিন্তু এটুকুন্ অভাবের জন্য কোন স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি বিরূপ হতে পারে কি?

আলোচনার ঢেউ পুরুষদের মহল ছেড়ে মেয়েদের মহলেও গড়িয়ে এল। গোপাদের বাড়ীতে মেয়েছেলে বলতে অবিশ্যি তার এক বৌদি আর বৃদ্ধা মা। শাশুড়ী বৌতে আলাপ ভাল জমে না কাজেই বৌদি এসে পাকড়াও করলে গোপাকে।

'সত্যি নাকি ঠাকুরঝি ? তোর নাকি বর পছন্দ হয়নি ?'

'যা ! কে বলেছে।'

'সকলে তো তাই বল্‌তেছে।'

'বল্‌তেছে নাকি ? বলুক গে। বর আবার কার কবে অপছন্দ হয় ? তবে—।'

বলে গোপা একটু হেসে চুপ করল।

'তবে কিরে পোড়ারমুখী ?'

'না, মানে,—কেমন যেন ওকে ঠিক বর-বর বলে মনে হয় না। আত নেই, দিন নেই আমার সঙ্গে কোঁদল করে। সারা গায়ে ভক্‌ ভক্‌ করে আঁশের গন্ধ !'

এই সব কথা বলেই আবার গোপা ভাবতে বসে, এ-কথা বলার কি দরকার ছিল ? গায়ে একটু মাছের গন্ধ থাকলেই যে তা গোপার কাছে একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে তা তো নয়। চাষীর ছেলেদেরও গায়ে মাটির গন্ধ থাকে। মাটীর গন্ধটা মাছের গন্ধের মত বিট্‌কেলে অবিশ্যি নয়। তাই বলে মাছের গন্ধও এমন একটা কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয় যে-জন্য কেউ তার স্বামীকে অপছন্দ করতে পারে।

তারপর নিধুর সম্বন্ধে আলোচনাটা এ বাড়ীতে একটু বেশী বেশী হতে লাগল। নিধুর যে-সমস্ত দোষের কথা গোপা কোনদিন জানত না, নিধু সম্পর্কে সেইগুলোই গোপার মত বলে লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। এ-সব নিন্দাবাদ শুনতে গোপার যে খুব খারাপ লাগে তা-ও নয়। বরকে গোপা ভালবাসলে কি হবে ; বর হিসাবে সে যে একটা খুব আদর্শ বর নয়, তা তো আর অস্বীকার করা যায় না।

নিধুর বাড়ীতে যে সে ছিল, আর এ-বাড়ীতে যে বৌদি আছে, এ দুয়ের মধ্যে তুলনা করে গোপার মনে একটু আধটু ক্ষোভ জাগে বৈকি ! মার সামনে বৌদি দাদার সঙ্গে কথা বলে ফিস্‌ফিস্‌ করে। বৌ-মানুষের মুখে ফিস্‌ফিসানিটা কী সুন্দর যে মানায় ! মস্ত একটা ঘোমটা দিয়ে সারাদিন ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়ায় বৌদি। অথচ সারাদিন তার গলার স্বর প্রায় কেউ শুনতেই পায় না।

বড়দার সঙ্গে সে কথা বলে খুব কম, কথা বললেও দাদার গলার উপরে ওঠে না তার গলা কখনো। চাষীদের ঘরে বৌদের এই ধরণের রীতি-নীতিই দেখা যায় সাধারণতঃ, অন্ততঃ যদ্দিন পর্যন্ত শাশুড়ী বেঁচে থাকেন।

এর সঙ্গে কি কোন তুলনা হয় নিধুর বাড়ীতে গোপার চালচলনের? গোপা যেন সে-বাড়ীর বৌ নয়, মেয়ে!

গোপার ছেলের বয়স যখন দিন কুড়ি, তখন একদিন নিধু এসে উপস্থিত হল। ছেলে হওয়ার শুভ সংবাদ পেয়ে জামাই এসেছে শ্বশুরবাড়ী; তবু কেউ সোরগোল করে অভ্যর্থনা জানালো না। সম্বন্ধীদের মুখ দেখে বরং মনে হল সে যেন কোন শোকসন্তপ্ত বাড়ীতে এসে পড়েছে না জেনে।

'এসো, বাগ্দীর পো', বলে বড়জন সেই যে থামল, আর যেন সে বলার মত কথাই খুঁজে পাচ্ছে না। শেষে বহু কষ্টে যোগ করল, 'ভালো আছো তো?'

নিধুও গায়ে পড়ে আলাপ জমানোর তাগিদ বোধ করল না। সংক্ষেপে 'ভাল আছি', বলে পাশ কাটিয়ে অন্দর মহলে ঢুকল।

সম্বন্ধী-বৌ তবু হাসল একটু।

'লতুন মুখ দেখছি যে,—চিন্‌তে পারছি নি তো!'

এইবার নিধুও একটু সহজ বোধ করল।

'গায়ের ঘান লে' 'দ্যাখো তো দিদি চিনতে পার কিনা।' বলে হাতখানা বাড়িয়ে দিল নাকের কাছে, তারপর গালে একটা ঠোক্‌না দিল।

কিন্তু এইতেই কি আর শ্বশুর বাড়ীর আব্‌হাওয়া জমে?

ছেলের মুখ দেখতে এসেছে নিধু,—এটা একটা দস্তরমত 'অফিসিয়েল' ব্যাপার। গোপার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করার কোন সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভবই নয়। অন্ততঃ আপাততঃ। দাদারা, বৌদি, মা, এমন-কি দু'একজন প্রতিবেশীর উপস্থিতিতে গোপা একগলা ঘোমটা দিয়ে ছেলেকে নিয়ে এল কোলে করে।

দুটো রূপোর টাকা দিয়ে ছেলের মুখ দেখল নিধু। একটু হেসে সাবধানে প্রশ্ন করল, 'বাঃ! বেশ ডাগড় ডোগড় হয়েছে তো? মনে লিচ্ছে যেন পূরো দশ মাসের বাচ্চা।'

বড়দা গম্ভীরভাবে বলল, 'তাই হয়তো হবে। দশ মাসেই হয়েছে বাচ্চা।'

কথাটা আহত অভিমানের থেকেও বলা হতে পারে; আবার সরল স্বীকারোক্তিও হতে পারে। স্বীকারোক্তি বলে ধরে নিয়ে নিধু একেবারে আঁৎকে উঠল। বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। এ ধরণের কথা সত্যি হলেও এমন করে স্বীকার করার মানেটা কি? অস্বীকার করলে তবু তো সন্দেহ করার সুযোগ থাকে।

'নিজের মুখে কথাটা স্বীকার কত্তেছ সম্বন্ধী?' নিধু জিজ্ঞেস করল ভারী গলায়।

সম্বন্ধী-বৌ এবার সন্ত্রস্ত হয়ে ফিস্‌ফিস্ করে না বলে পারল না, 'কী কথায় কী কথা ওঠে. দ্যাখো দিনি? দশ মাস পেরোয় হলনি? হওয়ার পরে তো কুড়িদিন হ'য়ে গেছে!'

বড়দা একটা রাম ধমক দিল, 'তুই থাম দিনি মাগী! পুরুষ নোকের কথার মধ্যি মেয়েনোক লাক গলায় কেন? শোন নিধু, মোরা সাদা কথার মুনিষ। পষ্ট করে বল দিনে তোমার কথাটা? সাত পাঁচ বলে মোদের বোনকে আর তুমি লিতে চাইছ না, এই তো তোমার কথাটা? অর্থাৎ, ইস্ত্রীকে তুমি ত্যাগ করে যাচ্ছ, কেমন কি না?'

ছোট জন যোগ দিয়ে বলল, 'তাই তো দাঁড়াল গে কথাটা!'

কথাটা শুনে নিধুর পায়ের তলা থেকে যেন মাটী সরে যাচ্ছিল। এ-সব কী বলছে এরা? এমন করে কথা তৈরী করা যায়? আশ্চর্য তো! সে একটা জবাব দিতে যেতেই বড়জন আবার বলে উঠল, 'তা শোন নবাবজাদা, বৌ না লিবে তো তোমার পা ধরে মোরা সাধতে যাবনি। মোদের বোনকে মোরা আজসুখে নাখতে পারব।'

ছোটজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'মোদের বোনটা পথে কুড়ানো মেয়ে লয়কো।'

নিধুও পুরুষ মানুষ। এরা তার সঙ্গে এমন করে কথা বলবে, আর সে তাই সহ্য করবে? এ-বাড়ীর মেয়ে বিয়ে করে সে কি চোরের চাকর হয়ে গেছে নাকি? ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'তোমাদের এ-সব কথার মানে কি গো? বৌ লিব না এমন কথা আমি কখন বললাম? তোমাদের চালাকী আমি

বুঝতে পেরেছি, মোর নামে বদ্‌নাম দিতে চাও, আমি এক্ষুনি বৌ লিয়ে চলে যাব।'

ছোটজন বলল, 'বটে? কেড়ে লেবে নাকি?'

বড়জন বলল, 'যে-সব বদ্‌নাম দিলে তার ভগমান সাক্ষী আছেন! সেই মুয়ে আবার বলতেছ, বৌ নে যাবে? সাহস তো কম লয়!'

নত-নেত্রা গোপার দিকে তাকিয়ে নিধু বীরদর্পে বলল, 'চলে আয় গোপা। যে ভাবে আছিস্, অমনি এক বস্তরে চলে আয়।'

বড়জন বলল, 'বলে দে গোপা, মোরা কুত্তার জাত লই। দরকার হয় তো কোর্টের থে অর্ডার বের করে তোর ঘরে যাব।'

কাঠের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোপা কথাবার্তাগুলো শুনছিল। সারা গা তার কাঁপছে, রাগে, উত্তেজনায়, ভয়ে। যে কথা কল্পনাও করা যায় না এমন কথা কী করে এমন অনায়াসে বলতে পারল নিধু? এতদিন ধরে সে ঘর করে এল নিধুর সঙ্গে, খুব নাকি ভালবাসে তাকে নিধু! তবু এমন কথা বলার সময় নিধুর মুখে এতটুকু আটকাল না? নিধুর অপযশে এ-বাড়ীতে কান পাতা যাচ্ছে না। সে-অপযশটাই তবে সঙ্গত? ও যে এতকাল ভেবেছে, নিধুকে লোকে যত খারাপ বলছে, আসলে সে তত খারাপ নয়,—ওর সেই ভাবাটা তবে ভুল! শক্ত হয়ে উঠল গোপার হাত-পা; শক্ত কাঠ হয়ে গেল মনটাও।

গোপার দিকে তাকিয়ে নিধু বলল, 'কি বলছিস্ গোপা? এস্‌বি আমার সঙ্গে?'

স্বাভাবিক দরদের গলা নয়। গোপার উপর কর্তৃত্ব ফলাতে চায় নিধু,—সেই-রকমের উদ্ধত রুক্ষ গলা।

গোপা মৃদু, অথচ খন্‌খনে, শানিত গলায় বলল, 'তার আগে তুই সরল মনে স্বীকের কর্, মোর ন'মাসের ছেলে দশমাসে হয়েছে, এমন কোন সন্দ তোর মনে নেই।'

একটু তিক্ত হাসি হাসল নিধু।

'মোকে কচি খোকা পেইছিস্, লয়?'

বলে একঘর লোকের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে নিধু বেরিয়ে গেল গট্‌গট্‌ করে।

তারপর দাদারা গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে পরামর্শে মেতে উঠল। সকলেই জানল, গোপার নামে মিথ্যে কলঙ্ক আরোপ করে নিধু গোপাকে ত্যাগ করেছে। আজকালকার ছেলে-ছোকড়াদের মতি-গতি তো আর কারও অজানা নয়। আর কোন ছুঁড়ি-টুড়ি হয়তো জুটিয়েছে নিধু; অথচ বিনা অজুহাতে একটা বৌ-কে ত্যাগ করাও শক্ত। কাজেই নিঃসন্দেহে মতলব করেই নিধু এসেছিল মনে মনে আগেই মিথ্যা অপবাদের কথাটা তৈরী করে নিয়ে।

সমস্ত শুনে গাঁয়ের লোকেরা নিধুর উপর রেগে আগুন হল। তারা যে-সব পরামর্শ দিতে লাগল তাতে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না যে তারা সবাই গোপার অকৃত্রিম বন্ধু। শলা-পরামর্শের সমস্ত বিবরণ গোপার কাছে অবিশ্যি এসে পৌঁছল না। তবে মোটের উপর এটুকু সে জানল, স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রী হিসাবে সে যদি আবার বিয়ে করতে চায় তবে পঞ্চায়েৎ তাতে বাধা দেবে না।

কথাটা তেমন অসঙ্গত বলেও মনে হল না গোপার কাছে। ওদের মধ্যে এমন বিয়ে তো আজকাল চলছেই। নিধু কি ভেবেছে যে তার চেয়ে ভাল পাত্র আর এ ভু-ভারতে নেই?

গোপা যদি বিয়ে করে তো এবার বিয়ে করবে একটি বাড়-বাড়ন্ত খাঁটি চাষীর ছেলেকে।

বড়দাকে কিন্তু গোপা সে-কথা বলল না। বলল, আরও কিছুদিন সবুর করতে।

সেদিন স্নান সেরে কলসী কাঁখে ফেরার পথে গোপা একজন অচেনা লোককে দেখল বড়দার সঙ্গে। তারপর থেকে লোকটাকে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল। মাঝে মাঝে লোকটা তাদের বাড়ীতেও আসে। তাতে গোপার আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাড়ীর ভিতরের দিকে লোকটার ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত গোপার ভাল লাগল না।

সেদিন বিকেলেও লোকটা এসেছিল। হুকুম মত বৌদি চা তৈরী করে মাটীর ভাঁড়ে করে চা পরিবেশন করে এল। গোপা ছিল রান্না ঘরে বসে।

ফিরে এসে বৌদি বলল, 'হাত পুইড়ে চা তেইরী করনু, তা মিনসে শুনিয়ে দিল সোনার বুনে নাকি চা করেছে!'

গোপা শুনে তৎক্ষণাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'কেন গো বৌ? মিথ্যে করে মোর নাম বলার মানে কি?'

'বোধ হয় এ-কথা বলায় নোকটার মুখে চা আরও বেশী মিষ্টি নাগবে।'

এ উত্তরে গোপা খুসী হল না।

'উহুঁ, তুমি আসল কথাটা নুকোচ্ছ, বৌ!'

এবার বৌদি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

'বয়স তো তোর কম হল না লো ছুঁড়ী! ছেলের মা হয়েছিস্। গতর তো ঝুলে যাচ্ছে দিনের দিন। তো লাক দিয়ে পোঁটা পড়ে যে বয়সে, বুদ্ধিটা সেইর'ম রয়ে গেছে কেন? বুঝতে পাচ্ছিস্‌নি তোর দাদারা তোকে নিকে বসাবে ঐ বুড়োটার সঙ্গে টাকার নোভে?'

বুড়ো ঠিক নয়; কিন্তু নিধুর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। কেমনে চোঁয়াড়ে রুক্ষ চেহারা লোকটার। চাষীদের চেহারা যেরকম হয়ে থাকে।

কিন্তু বয়স আর চেহারা যাই হোক, ব্যাপারটা এমন বাস্তব ভাবে গোপার মনের সামনে ধরা পড়েনি এর আগে। নিধুর সঙ্গে আর সে কোনদিন ঘর করবে না, এমন-কি নিধুর চেহারাটা পর্যন্ত সে আর কোনদিন হয়তো দেখতে পাবে না, এ কথা ভাবতেই গোপার মনে বিস্ময় আর বেদনার অবধি রইল না। এক মুহূর্তে চাষীর ঘরের সমস্ত সৌন্দর্য মুছে গেল তার মনের আকাশ থেকে।

সেই রাত্রেই গোপা ভাইদের বাড়ী ছেড়ে পালালো। ছেলেটাকে রেখে গেল বৌদির কাছে। পরদিন লোক পাঠালে ছেলেটাকে তার সঙ্গে দিয়ে দেবে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

পথে যেতে যেতে নিধুর ঘরের সেই স্বাধীন স্বতন্ত্র জীবনের কথা মনে করে গোপা যেন শূন্য দিয়ে উড়ে চলল: সেখানে ষোল বছরের সামান্য মেয়ে গোপাও একটা পুরোপুরি মানুষ। লোকে তার কথা মন দিয়ে শোনে, কথার দাম দেয়। আর এখানে বস্তা বস্তা খড়ের গাদার চাপে ক্লিষ্ট জীবনে শুধু

লোভ আর স্বার্থের বেসাতি। এখানে দাদার মুখের দিকে বৌদি মুখ তুলে তাকাতে পারে না, কথা বলতে গেলে তার গলা শুকিয়ে যায়!

নিজের উপর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে গোপার; কেন থাকবে না? একজন যৌবনবতী সন্তানবতী নারীর পক্ষে পুরুষের মন জয় করতে কতক্ষণ লাগে! সে যদি দেবতার নামে শপথ করে নিধুকে বলে যে তার প্রকৃতই নয় মাসে ছেলে হয়েছে,—দশ মাসে হয়েছে বলে তার যে সন্দেহ তা ভুল সন্দেহ,—তবে নিশ্চয়ই নিধু তা বিশ্বাস করবে। নিধুকে সে তো জানে, কুচুটে হিংসুক প্রকৃতির সে মোটেই না।

গভীর রাত্রে ভূত-প্রেতের ভয়, সাপ খোপের ভয়, দস্যু-তস্করের ভয় উপেক্ষা করে, গোপা এলো নিধুর বাড়ী। অনেক হাঁক ডাকের পরে ও-ঘর থেকে অটবী বেরিয়ে এল। গোপাকে দেখে ব্যাঙ্গ আর সহানুভূতি মেশানো হাসি হাসল একটুখানি।

'তুমি? বৌমা? বড্ড দেরী করে এলে বৌমা। নিধু তো চলে গেছে কাজের চেষ্টায়। কোথায় গেছে জানিনি। কবে ফিরবে তা-ও জানিনি।'

উঠানের মাঝখানেই গোপা বসে পড়ল।

গোপার সব কথাই অটবী শুনেছে নিধুর মুখে। গরীবের ঘরের মেয়ে তো,—হদ্দ বোকা!

সহানুভূতি একটু জাগল বটে অটবীর; কিন্তু এতটা জাগল না যাতে আর একজনের উপকার করার জন্য সচেষ্ট হওয়া যায়।

বলল, 'আধার সঙ্গে ঘুমোও বাকি রাতটুকু। কাল সকালে আমি নিজে এখে এসব তোমাকে ভেয়ের কাছে।'

চৌদ্দ

যত সুখ সব পরী সঙ্গে করে নিয়ে গেছে ; যত দুঃখ সব অটবীর জন্য পড়ে আছে। অন্ধকারে থাকতে থাকতে অন্ধকারটা চোখ-সওয়া হয়ে যায় ; মাঝখানে একবার আলোকে গিয়ে আবার অন্ধকারে ফিরে এলে তবে বোঝা যায় অন্ধকার কতখানি অসহ্য। অটবীরও হয়েছে তাই। অন্ধকারের এই জ্বালা অটবী বোধ কোরছে একা। তার সঙ্গী-সাথীরাও তার মর্ম বুঝল না, অন্ধকার তাদের গা-সওয়া।

পরী-ঘটিত ব্যাপারটা গাঁয়ে জানাজানি হয়ে যাওয়ায় চারদিক থেকে বিদ্রূপের জিহ্বা লক্‌লক্ করে উঠেছে। অটবীর প্রতি কেউ সহানুভূতি জানাল না, কেউ অটবীকে বুঝতে চেষ্টা করল না। সাম্‌না-সামনি কেউ কিছু বলতে এলে অটবী অবিশ্যি ফোঁস করে উঠে তাকে থামিয়ে দিল। কিন্তু তাতে সকলের অন্তর অটবীর থেকে দূরে সরে গেল। আর অটবীও তার আহত গর্বের নিঃসঙ্গ অন্তঃপুরে নিজেকে গুটিয়ে আনল।

তার চোখ দিয়ে পৃথিবীকে কেউ দেখে না। তার মত করে তাদের অবস্থার কথা কেউ ভাবে না। পৃথিবীতে সে একা, একেবারে একা।

এতকাল যে পৃথিবীতে সে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতো, আজ মনে হল সে-পৃথিবীতে সে বুক ভরে নিশ্বাস টানতে পারছে না। জীবনে কি কি পায়নি, এক এক করে আজ সে তার হিসাব নিতে বসল। সে ভেবেছিল, চাকরি-বাকরি করে সংসারকে স্বচ্ছল করে তুলবে। দেখল, সেখানে তর্জনি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভেড়ীর মালিক। সে চেয়েছিল, মাছের কেনা-বেচা করে অবস্থা ঘুরিয়ে ফেলবে। দেখল, ব্যবসায়ের জগৎটা বড় কারবারীদের এক দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্রে আবদ্ধ। সে কল্পনা করেছিল, জমি পাবে, দেখল জমিদার দাঁড়িয়ে আছেন সমস্ত জমির উপর পা দিয়ে। একটা মেয়ের প্রতি তার কামনা জেগেছিল. কিন্তু দেখল বৌ নামক সম্পত্তিকে শক্ত হাতে আগ্‌লিয়ে রেখেছে

তার স্বামী। চারদিকে সবাই শরকি উঁচিয়ে রয়েছে, মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে একা, নিরস্ত্র। সঙ্গী-সাথীরা কখন সরে পড়েছে জানতেও পারেনি।

কেউ হাসলে আজকাল অটবীর গা জ্বালা করে। কেউ কথা বললেও এখন তার বিরক্তি বোধ হয়।

তার খিটখিটে মেজাজের কথা আজকাল সবাই বলাবলি কোরছে। বলরামের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ায় ওদের গ্রামের দলাদলি মিটে গেছে। কাজেই কাজ-কর্মের ব্যাপারে মালিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে তাকেই যেতে হয়। সে নাকি মালিকের সঙ্গে যে-ভাবে রোখা-রোখা কথা বলে তাতে গাঁয়ের লোকদেরও লজ্জা করে। অমনি করে নাকি মানী লোকদের সঙ্গে কথা বলতে নেই। মানী লোফেরা কিন্তু নির্বিবাদে তার রুঠো কথাগুলো হজম করেন। আগে আগে তাঁদের পাতলা চামড়ায় একটু একটু ফোস্কা পড়ত, আজকাল বেশ সয়ে এসেছে। ভীরু দুর্বল অকর্মণ্য মানুষগুলো নিজেদের সামলিয়ে চলতে একটু একটু শিখুক না। অত ডাঁট করে চলা কি সব সময় চলে? জোয়ান বয়সে ঠাণ্ডাকে অগ্রাহ্য করা যায়, বুড়ো বয়সে ঠাণ্ডাকে ভয় করে চলতে হয়।

গাঁয়ের লোকদের সঙ্গেও অটবীর আজকাল খিটিমিটি বাধে। অটবী কখনো কম মজুরিতে মালিকের সঙ্গে রফা করে না, কাজ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও। এই জন্য খিটিমিটি বাধছে রাধার সঙ্গেও। ঘরে বাইরে আজ আর এমন কেউ নেই যে অটবীকে পুরোপুরি বন্ধু বলে, মনে করে। যজ্ঞেশ্বরকাকা পর্যন্ত আজকাল উপদেশ দিয়ে যায়; বলে, মানুষকে চেনা যায় কিসে? স্বভাবে। মানুষের মন জয় করা যায় কি করে? স্বভাবের দ্বারা। অটবী, স্বভাবটা ভালো কর।

রাধাও যেন কেমন অন্য রকমের মানুষ হয়ে যাচ্ছে আজকাল। আজকাল যেন সে আগের থেকেও বেশী জেদী হয়ে উঠেছে। কোন কাজ করতে গেলে অটবীর সম্মতি নেওয়াটাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না। অটবী যেন একটা অনাবশ্যক বাধা তার কাছে। আগের মত আর অটবীর কাছে পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে না রাধা। জড়িয়ে ধরতে গেলে আজকাল তার মাংস-পেশীগুলো কেমন শক্ত হয়ে ওঠে। পুরুষের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার

সময় যে তৃপ্তির হাসি মেয়েমানুষের মুখে ফুটে ওঠে, তার বদলে রাধার মুখে দেখা যায় কেমন একটা সন্দেহের, তিরস্কারের ছায়া। পত্নীর সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা রাধা জেনে ফেলেছে বলেই কি তার এই পরিবর্তন? একাধিক মেয়েমানুষের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানোর যে স্বাভাবিক অধিকার আছে পুরুষের, তাকে যদি রাধা এখন কুনজরে দেখতে সুরু করতে থাকে তো সেটা ভাব্‌বার কথা। শহরের ভদ্দরলোকদের মধ্যে যে রোগ দেখা যায়, তার ছোঁয়াচ কি এসে লেগেছে গাঁয়ের বৌ-ঝিদের মনেও? অধঃপতনের আর বাকি থাকবে না কিছু তবে।

দিন কয়েক হল রাধা বায়না ধরেছে কোলকাতার বাজারে মাছের ব্যবসা করবে। দিন কয়েক জাওলা মাছ বেচতে গিয়ে আর লোকের মুখে শুনে শুনে তার ধারণা হয়েছে, মাছের পাইকার হলেই টাকায় গদির উপর শুয়ে ঘুম দেওয়া যায়! মজুর খেটে দেড় দু'টাকা যা হয় বিবির নাকি তাতে আর চলছে না! মেয়েমানুষও যদি ভাল-মন্দ ভাবতে শেখে তবে তো বড় সাংঘাতিক ব্যাপার!

রাধাই কথাটা তুলল সেদিন। অটবীর মত নেওয়ার জন্য নয়,—মত নেওয়ার দরকার থাকতে পারে এ-বোধ থাকলে তো!

রাধা বলল, 'গোটাকয়েক টাকা দিতে পারবিনি?'

অটবী পাল্‌টা প্রশ্ন করল, 'টাকার আবার কী দরকার পড়ল গো? পৈঁছা গড়াতে হবে? না কি মল কিনতে হবে?'

'বুড়ো বয়সে মল পায় দ্যায়? মিন্‌সের বুদ্ধি দ্যাখ। তা লয়। মাছের কারবার করব ভাবতেছি। তা কিছু টাকা না হলে তো হবেনি?'

'বেশ! বেশ! ভাল বুদ্ধি! শহরের হাওয়া গায়ে লাগলে অঙ্‌ ফরসা হয়।'

'ঠাট্টা লয়। কটা টাকা দাও না গো ধার টার করে।'

অটবী বুঝল যে রাধা সাময়িক ঝোঁকে কথাটা বলছে না।

'শোন, বৌ! শাস্তর বলছি একটা, এক ব্যাঙের একটা টাকা হয়েছিল। তা টাকার গরমে সে ওজ গে' আজার হাতীকে পাঁচ লাথ্যি মেরে এস্‌তো। রাজার আদেশে চাকরেরা গিয়ে তো টাকাটা দেখতে পেয়ে সইরে ফেলল। আর

ব্যাঙের কী হল জানিস্ ? টাকার নোভে বুক ফেটে মরে গেল। মানে বেশী বাড়তে যেওনি, গেলে মারা পড়বে, এই হল কথাটা। আর একটা গপ্প শুন্‌বি ? বিন্ধ্য পব্বত আছে জানিস ? তা সে একবার ভাবল বড় হতে হতে সুয্যিকে ঢেকে ফেলবে। ত্যাখন অগস্ত মুনি তার কাছে গেল। অগস্ত গুরুদেব, বিন্ধ্য তো পেন্নাম করলে উবু হ'য়ে। অগস্ত বলল, আমি ফিরে না আসা 'তক অমনি থাক, বৎস। সেই থেকে বিন্ধ্যর কোমর ভাঙা !'

এতসব দামী দামী উপখ্যান রাধা হেসে উড়িয়ে দিল।

'তোর য্যাত সব গাঁজাখুড়ি বানানো গপ্প। মোর কাছে শোন্ সত্য গপ্প। হরিহর ছেল হত দরিদ্দর। তাকে বিশকম্ম ঠাকুর ডেকে বললে, যাও বাপ, মাছের কাছে যাও ; আমার বরে তোমার ভাল হবে। তো পরদিন এক বাবু দু' আনা ভিখ্ দিল তাকে। তাই দে' একটা মাছ কিনে কারবারে নাগল,—তখন তো সস্তার বাজার। তা 'পর সেই কারবার থে' সে মাছের ঘাট করল, ভেড়ী করল। একটা মস্ত নোক হয়ে গেল। মাছ হল সাক্ষেৎ নক্ষী।'

দু'জনেই সেদিন ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিচ্ছে। অটবীর রাগ হয়েছে খুব, বৌ-এর মুখে পাল্টা গল্প শুনে। গল্প নয়, এটা সত্যি ঘটনা,—সবাই জানে। তবু বলল, 'তবে শোন্ মাগী, আর একটা শাস্তর বলি। এক চতুর আর এক বব্বরের কঁ্যাঠাল খাওয়ার সাধ হয়েছে। চতুর বোকাটাকে কঁ্যাঠাল পেড়ে দেবে বলে নোভ দেখিয়ে তো তার ঘাড়ে চাপল। তা'পরে কঁাঠাল পেড়ে গাছের উপরেই খেয়ে নিল। পরে নেবে এসে, "তোকে চাড্ডি দি'' বলে বব্বরের মুখে খানিক আটা লাইগে দিল। গাছের মালিক এসে ভাবল, বব্বরের মুখে আঠা তবে এই চুরি করেছে। তারপরে দমাদ্দম মার। তা মেয়েমুনিষ কারবার করতে যাবি তো তোরও ত সেই দশা হবে।'

'খুব বলেছিস্ ! কত মেয়েনোক কারবার কোত্তেছে, আমি আর দেখিনি ?'

'কী দেখেছিস শুনি ? মেয়েনোকগুনো মাছের বাজারে গে' ভক্ ভক্ করে বিড়ি ফোঁকে আর গোপনে গোপনে তাড়ী খায়। তা দেখেছিস ? উপরে একটা বেলাউজ পরে, তলায় একটা সায়া পরে, লাল ফিতে দে' চুল বাঁধে আর ব্যাটাছেলেদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করে। তা দেখেছিস ?'

স্বভাবতঃই এমনি কথা কাটাকাটি অনেকক্ষণ চলল, কোন মীমাংসা হল না। দিন তিনেক পরে অটবী লোক মুখে শুনে এল রাধাকে নাকি বাজারে মাছ বিক্রি করতে দেখা গেছে।

রাধা ফিরে এলে বলল, 'পিপীলিকা কাকে বলে জানিস্? পিঁপড়েকে। ভগমান তাকে পক্ষ দিলেন, মানে পাখা দিলেন। তা আনন্দে ডগমগ হয়ে পিপীলিকা উড়ে গে' আগুনে ঝাঁপ দিল। তাই কথা আছে, পিপীলিকার পক্ষ হয় মরিবার তরে।'

'ঈশ্! আবার শাস্তর আওড়াচ্ছে! মরদের গুণ কত! নিজে এক পয়সা ওজগার করবেনি, গতর কোলে করে বসে থাকবে! ঘরের মাগ খেটে খুটে দু' পয়সা ঘরে এন্‌বে তাতেও পাণ জ্বলে যায়!'

অটবী আজকে সহজেই রেগে গেল।

'ভারী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শিখেছিস্ তো মাগী? শূণ্য কলসি ঝন্ ঝন্ করে বেশী, সেই বেত্তান্ত! শোন্ হারামজাদী, বুঝে দ্যাখ কথাটা। পয়সা পয়সা করে যে তড়পাচ্ছিস্, জানিস্ পয়সার জাত-বিচের আছে? যাদের গায়ের অঙ্ ফরসা, ফরসা কামিজ গায়ে দেয়, গতর কোলে করে বসে থাকে, —নাড়ায় না, পাছে ব্যথা নাগে,—তাদের ভুঁড়ির তা লাগলে পয়সায় ডিম পাড়ে। যারা গতর খাটিযে খায় পয়সা তাদের বুড়ো আঙুল দেখায়। ভাল কথা বলতেছি, শোন, মাগী। পাখ্‌না গজাস্‌নি। এক পয়সা বেশী ওজগার হবেনি; শুধু শহরে গে' স্বভাবটা খারাপ করবি।'

কিন্তু বাইশ বছরের রাধা পয়সার গন্ধ পেয়েছে, সে কী আর শোনে জ্ঞানের কথা, বিবেচনার কথা?

'তুই মিনসে আল্‌সের গুরুঠাকুর হয়ে বসে আছিস, আর কাজে বাগড়া দিচ্ছিস্। কাজ আমি কোরবই। চার পাঁচশো টাকা হলেই দু'বিঘে জমি কিনে ফেলব। না'লে বুড়োকালে খাবি কি মিন্‌সে? বটতলায় বসে ভিখ্ মাগবি?'

অটবী আরও রেগে গেল,—'ফের মুখে মুখে কথা বল্‌তেছিস? বজ্জাত! তুই তাড়ী খেয়েছিস, লয়? ইদিগে আয় তো দেখি।'

বলে অটবী নিজেই এগিয়ে গেল রাধার দিকে। মুখ শুঁকে কোন গন্ধ পেল না বলে রাগ আরও বেড়ে গেল। ধাক্কা দিয়ে রাধাকে ফেলে দিতে গেল। রাধাও সেয়ানা মেয়ে! তার বাহু আঁকড়িয়ে ধরে নিজেকে সামলিয়ে নিল।

হঠাৎ অটবীর মনে হল, রাধা আর পরীর স্বভাবে অনেকটা মিল আছে। রাধাও তেমনি জেদী, তেমনি তেজী। পুরুষের মন বুঝে চলবে না, যেমন মেয়েমানুষের চলা উচিত। জোর করেও তাকে নোয়ানো যাবে না ; বেশী জোর করতে গেলে হয়তো একেবারেই ভেঙে যাবে। পরীর মধ্যে যে-গুণটা অটবীকে আকৃষ্ট করেছিল, নিজের বৌ রাধার মধ্যে সেই গুণটাই তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলল।

আচ্ছা, পরীর কথা কেন কখনো তোলে না রাধা ? পুরুষকে জব্দ করার এমন একটা অস্ত্র হাতে আছে, কেন ব্যবহার করে না ? ঝগড়া সুরু হলেই অটবী আশঙ্কা করে, এইবার মাগীটা হিংসায় ফেটে পড়বে আর তাকেও পুরুষের অধিকার রক্ষায় বাছা বাছা শব্দে রাধাকে ঘায়েল করতে হবে ! কিন্তু আশ্চর্য, রাধা সে-পথই মাড়ায় না ! কেন ?

সেদিন রাত্রে অটবী বিছানায় না শুয়ে আর এক দিকে মাদুর বিছিয়ে নিল। তা দেখে রাধা ঘর ছেড়ে দিয়ে নিধুর ঘরে শোবে বলে চলে গেল। কৈ রাধা তো তার পুরোন কৌশল প্রয়োগ করল না ? অটবীর গলা জড়িয়ে ধরে, তাকে তার উঁচু বলিষ্ঠ বুকের পেষণে অভিভূত করে, সারা মুখে ঠোঁটের ঘসায় লালা ছড়িয়ে, সে তো চেষ্টা করল না অটবীর সমস্ত রাগ ধুয়ে জল করে দিতে ? কী হল রাধার ? রাধা কি বদ্‌লিয়ে গেল নাকি।

নিধুর খালি ঘরের একক প্রহরী কাঁঠালকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে রাধা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে গেল। এগারো বছরের ছেলে কাঁঠালের চোখ থেকে কিন্তু ঘুম পালিয়ে গেল। যুবতী মেয়ে মানুষের গায়ের অপরিচিত মিষ্টি গন্ধটা কাঁঠালকে মুগ্ধ করল। গাঁয়ের সমবয়সী, খেদী, পেঁচী, লক্ষ্মী, তুলসীদের গায়ের গন্ধের মত একেবারেই নয় এ গন্ধটা। রাধার শাড়ীর আঁচলটা দিয়ে নিজের সারা গা জড়িয়ে নিল। রাধার শাড়ীর আড়ালে যেন

অনেক অনেক রাজপুত্র আর বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প লুকিয়ে রয়েছে! কী অজানা রহস্য আছে একটা মেয়েমানুষের দেহের মধ্যে? অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে কাঁঠাল ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে একেবারে রাধার বুকের মধ্যে আশ্রয় নিল। তার শরীর একরকমের গরমে আর উত্তেজনায় অবশ হয়ে এল। রাধার পান-খাওয়া লাল পুরু অল্প অল্প ফাটা ঠোঁটটার দিকে তাকিয়ে কাঁঠাল ভাবতে লাগল ঐ খানে একটা চুমু খেলে মামীমা টের পাবে কিনা, আর ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। আর ঘুমের মধ্যে রাধার অতৃপ্ত মাতৃত্ব কোলে শিশু এসেছে ভেবে কাঁঠালকে আরও ভাল করে জড়িয়ে ধরল।

পরদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে পরীর সঙ্গে অটবীর দেখা হয়ে গেল। অটবী যাদবপুর গিয়েছিলো মজুরীর পাওনা টাকার তাগিদে। টাকা পাওয়া যায়নি। কিন্তু একটা টাকা চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে সে পেট পূরে তাড়ী খেয়ে নিয়েছে। রাস্তায় বেরিয়েই দেখে, চুপড়ি মাথায় নিয়ে পরী চলেছে আগে আগে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে পুরু নিতম্বদেশটাকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। আদ্ধেক খোলা পিঠের উপর অযত্নে জড়ানো চুলের ঝুঁটি ভেঙে গড়িয়ে পড়েছে। যেন রাজার ঘোট্‌কী কেশর ছড়িয়ে চলেছে দুলকি চালে দু'পাশের জনতাকে মুগ্ধ করতে করতে।

চোট পায়ে হেটে পরীকে ছাড়িয়ে গিয়ে অটবী গতি শ্লথ্ করে দিল। বুকটা ধপাস ধপাস্ কোরছে। পরী কি ডাকবে? পরী কি ডাকবে না?

পরী ডাকল, 'ও বাগ্দীর পো! বলি, আজকাল কি আকাশের দিকে তেকিয়ে হাটা হয় নাকি? গরীব নোককে চোখ দে' দেখা হবেনি বুঝি?'

অটবী যেন হঠাৎ ডাক শুনে চমকে উঠেছে, এমনি ভাবে তাকালো। সতর্ক রইল যাতে মুখে হাসি না ফোটে। পরীর পাশাপাশি এসে গম্ভীরভাবে বলল, 'পৈরী না? বাড়ী মনসাপোতা? বাজার করে এলে বুঝি?'

যেন একজন অল্প-পরিচিত লোকের সঙ্গে মামুলী ভদ্রতার কথা বল্‌ছে অটবী।

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ! পৈরী,—ঐ যে আকাশে উড়ে যায়। চোখে ছানি পড়েছে নাকি,—চিনতে এত কষ্ট হচ্ছে!'

তারপর রাস্তা দিয়ে দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে পরী মিনিট দশ পনেরোর মধ্যে যে-কোন সংবাদপত্রের চেয়ে বেশী নিপুনভাবে পৃথিবীর যাবতীয় সংবাদ অটবীর কাছে পরিবেশন করল। বাজারের হালচাল, কারবার-পত্তরের অবস্থা, ধনী লোকেরা ছাড়া যে আর কেউ কারবার করতে পারবে না সেই কথা, মজুরাণী করেও যে আর পেট চলবে না, রিফিউজীর দল যে বাজার নষ্ট করে দিচ্ছে সেই খবর, দেশ-গাঁয়ের অত্যধিক গরম আর জলের দুরবস্থা, চাষের দুরবস্থা, গাঁয়ের কোন্ বৌ স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য লোকের সঙ্গে পালিয়েছে, মায় গত বছর যে ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে এবং দেশে এখন দেশের লোকই রাজত্ব কোরছে এই সদ্য-বাজার থেকে সংগ্রহ করা চমকপ্রদ সংবাদটি পর্যন্ত পরী গড়গড় করে বলে গেল।

শহর ছেড়ে গ্রামের রাস্তায় পড়ে গোড়ে'র খালের পাশে এসে পরী বলল, 'মুনিষটা এমন গম্ভীর কেন গো? বেগুন বেচে কত নোকসান গিয়েছে? না কি, বৌ গয়নার জন্য বায়না ধরেছে? চল না গো, ঐ গাছটার তলায় বসে এট্টু জিড়িয়ে নি।'

অটবীকে হাত ধরে টানতে টানতে পরী গাছতলার দিকে নিয়ে গেল। পলাতক দুরন্ত ছেলেকে মা যখন জোর করে ধরে পিটতে পিটতে ঘরে নিয়ে যায়, তখন সে যেমন নিরুপায় বাধ্যতায় সন্ত্রস্ত উড়ু উড়ু চোখে চারদিকে তাকায়, অটবীর মুখের অবস্থা ঠিক তেমনি।

গাছতলায় বসে গয়নার কথায় মনে পড়ে যাওয়ায় পরী নিজের কোমর দেখিয়ে বলল, 'এই দ্যাখ্, একটা পৈঁছা কিনেছি। নিজের টাকায় লুকিয়ে লুকিয়ে কিনেছি। ভাতার জানলে মেরে ফেলবে।'

তারপর পরী চুপড়ি থেকে দুটো ছোট্ট আম বের করল। একটা অটবীর হাতে দিয়ে আর একটা নিজে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তার একটা দিক দাঁত দিয়ে ফুটো করে চুষতে লাগল। অটবী আমটা হাতে করে চুপচাপ দেখতে লাগল।

আমটা দু'চারবার চুষে পরী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুই এখনো আগ করে আছিস্ অটবী ? মাপ করবিনি মোকে ? অন্যায় করলে তার কি কোনদিন মাপ হবেনি ?'

অটবী তবু চুপ করে রইল। পরী হঠাৎ এক কাজ করে বসল। অটবীর যে হাতে তার দেওয়া আমটা ধরা ছিল সেই হাতখানা চেপে ধরে মুখের সঙ্গে লাগিয়ে দিল। অর্থাৎ অটবী আমটা খাক পরী সেই ইচ্ছেটা জ্ঞাপন করল। আর তৎক্ষণাৎ অটবীর চোখ দুটো জলে উঠল রাগে। মাটী ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে। তক্ষুনি অটবী রওয়ানা দেবে ভেবে ভয় পেয়ে পরী তার একটা হাঁটু জড়িয়ে ধরল দু'হাত দিয়ে।

পরী বলল, 'বোস্ বোস্ অটবী, না'লে তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।'

অগত্যা অটবী আবার বসল। আর পরী বানিয়ে বানিয়ে একরাশ গল্প বলে গেল. অটবীকে জলের মত বুঝিয়ে দিল যে সেদিন তার কোন দোষ ছিল না। তার বর কোত্থেকে কথাটা জানতে পেরে তাকে নাকি রামদা দিয়ে কাটতে এসেছিল। প্রাণের ভয়ে অগত্যা তাকে অটবীর কথাটা স্বীকার করতে হয়েছিল। গোঁয়ার স্বামী তাইতেই কি রেহাই দেয় ? একখানা জলন্ত চা কাঠ নিয়ে এসে তার পিঠের উপর চেপে ধরে কবুল করিয়ে নিয়েছিল, তারা যে অটবীকে মারার জন্য তৈরী থাকবে, এ-কথা আগে যেন সে অটবীর কাছে ফাঁস করে না দেয়।

বলতে বলতে এমন কি পরী চোখের কোণে একটু জলও টেনে আনল। তবু, অটবীটা কী বজ্জাত, মুখ টিপে টিপে অবিশ্বাসের হাসি হাসতে লাগল।

'বল্, অটবী, মাপ করলি বল্।'

অটবী ভেবে বলল, 'মাপ করলাম। তবে তুই আর কোনদিন মোর ছায়াও মাড়াবি নি।'

'তবে তো তুই মোকে উব্গার করে ভেসিয়ে দিলি। তুই যদি মোর সাথে দেখা না করবি, তো তুই আগ করে থাকলেও আমার যা, না করে থাকলেও তা। বল্, রোজ মোর সঙ্গে দেখা করবি। ঠিক আগের মত।'

অটবী মুখ গোঁজ করে বসে রইল। তখন পরী আর একটা কাজ করে বসল। হঠাৎ ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে গিযে নিজের আমের রসে ভেজা দু'হাত দিয়ে অটবীর দু'গাল চেপে ধরে অটবীর ঠোঁটের উপর একটা চুমু খেল। তেমনি ক্ষিপ্রবেগে আবার খানিকটা পিছিযেও এল, পাছে অটবী ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল, 'কেমন, এবার দোষঘাট সব মাপ হয়ে গেল তো?'

'দেখা যাবে পরে', অটবী বলল।

'তবু বলতেছে, দেখা যাবে! মিনসের আগ দেখ! শোন্, কাল থেকে ওজ দেখা করবি মোর সঙ্গে। আজ যাই, বেস্ হযে গেছে অ্যানেক। আবার কোন্ কুটুম দেখে ফেলে গে' নাগিয়ে এস্‌বে।'

এতেই যে পরীর উপর অটবীর রাগটা উবে গেল তা নয়। কিন্তু পরীর যাওয়ার দিকে তাকিযে থাকতে থাকতে অটবীর মনে হল, পরী আর একটু থেকে গেলে বেশ হত। যত দোষই পরীর থাক, পরী তবু আশ্চর্য মেযে। অটবীর মনকে অভিভূত করে দেওযার মত জাদু তার ভালই জানা আছে। পরী যেন বর্ষাকালের জোয়ারের জল। যা-কিছু গ্লানি, আবর্জনা, রাগ সামনে পড়ে, সে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর পরীকে বাদ দিয়ে অটবীর চলবেই বা কী করে? কি আছে অটবীর, কে আছে? পরী আছে, তাইতে এ স্বার্থপর কুচক্রী পৃথিবীতে সে বেঁচে থাকতে পারছে।

পরীর ঠোঁটের আমের রস ওর ঠোঁটেও লেগে গিযেছিল। কেমন টক টক মিষ্টি মিষ্টি লাগছে স্বাদটা। গালেও আমের রস লেগেছিল; শুকিযে গিয়ে এখন চ্যাট্‌চ্যাট কোরছে।

পরীর কথাটা একরকম মুছেই গিয়েছিল অটবীর মন থেকে। এই ঘটনার পরে একটা ক্ষীণ আশার আলো হিসাবে পরী আবার উদয হল তার মনের কোণে। সে যে আবার চেষ্টা করে পরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবে এ অবিশ্যি চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু সে আশা করতে লাগল, দৈবযোগে পরীর সঙ্গে তার আবার সাক্ষাৎ হযে যাক্। অথবা, আরও ভাল হয়, পরী নিজেই সচেষ্ট হয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটানোর ব্যবস্থা করুক। দেখা হওয়ার পর পরী আবার ইনিয়ে বিনিয়ে দীনভাবে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা

করুক এবং তার একটি মিষ্টি কথার জন্য সজল চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকুক।

এমনি করে দিন পনেরো কুড়ি কেটে গেল; কোন দেখা-সাক্ষাৎ ঘটল না।

তারপর, কথা নেই বার্তা নেই, পরী একদিন হঠাৎ একেবারে অটবীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত। রাত তখন অন্ততঃ দশটা। সারা গাঁ একেবারে নিঝুম। অটবীদেরও খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছে, রাধাও শুয়ে পড়েছে। একমাত্র অটবী ঘুম আসছে না বলে একটা টিম্‌টিমে লম্ফের আলো মুখোমুখি বসিয়ে বারান্দার উপর বসে একমনে একটা বিড়ি টেনে যাচ্ছে। এমন সময় ছায়ার মত নিঃশব্দে পরী দাওয়ায় উঠে এসে একেবারে ঝুপ করে মাটীর উপর বসে পড়ল। সচকিত অটবীর দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। কী বিমর্ষ সে হাসি!

পরীর সে চেহারা দেখে অটবীর চোখের পাতা আর পড়ে না। পরীর শাড়ীখানা জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে; চাপ চাপ রক্তের দাগ লেগে আছে গোটা শাড়ীটাতে। শরীরের অনাবৃত অংশের মধ্যে দুটো হাতেই আঘাতের দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া দাগ। মাথার চুলগুলো আলু থালু; কানের উপরে কোন-একটা জায়গা বোধকরি কেটে গিয়ে থাকবে, গাল অবধি রক্ত গড়িয়ে এসে এখন জমে গিয়েছে।

অটবীকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে পরী বলল, 'এ আর কী দেখ্‌ছ? আরও কী করেছে দেখ না!'

পিঠের কাপড় সরিয়ে পরী দেখালো সমস্ত পিঠখানায় স্বাভাবিক চামড়া কোথাও নেই, সবটা জায়গা জমাট রক্তে কালো হয়ে গিয়েছে। তেমনি অবস্থা শরীরের নিম্নাংশেরও, পরী উরু অবধি কাপড় উঠিয়ে দেখিয়ে দিল।

'এমন করে তোমাকে কে মারল পৈরী? সে তো মুনিষ লয়!'

'মেয়ে নোককে আবার বাইরের কোন্ কুটুম এসে মারবে গো? ঘরের নোকেই মেরেছে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। জ্ঞান হতেই মিন্‌সের চোখে ধোঁকা দে' পাইলে এইচি।'

বলে কৃতিত্বের গর্বে পরী আবার একটু হাসতে চেষ্টা করল।

এতখানি আঘাত পাওয়ার পরও দু-ক্রোশ আড়াই ক্রোশ পথ অনায়াসে একা

একা হেটে এসেছে পরীর মত একটা সামান্য মেয়েমানুষ! অথবা মেয়েমানুষ বলেই হয়তো পেরেছে, পুরুষ হলে পারত না।

বিস্ময়ের ঘোরটা একটু কাটতেই অটবী ব্যস্ত হয়ে উঠল পরীর পরিচর্যার জন্য।

'দাঁড়াও। শুনব'খুনি সব পরে। আগে এটটু সুস্থ হয়ে নাও।'

মেয়েমানুষের সেবা-যত্নের ভার মেয়েমানুষে ছাড়া নিতে পারে না। অটবী রাধাকে ডাক দিল।

ঘুম থেকে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে রাধা বাইরে বেরিয়ে এসে পরীর ঐ চেহারা দেখে চমকে উঠল। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পরীর হাত ধরে বলল, 'পৈরী, না?'

পরীকে রাধা পুকুরে নিয়ে গেল। সেখানে তার রক্তের চিহ্নগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়ে নিজের একখানা সাড়ী পরিয়ে যখন তাকে ফিরিয়ে আনল তখন পরীর বিবর্ণ মুখের চেহারাটা একটু ফিরেছে। রাধা অন্য বাড়ীব থেকে চুন জোগাড় করে এনে হলুদ বাটার সঙ্গে মিশিয়ে আহত স্থানগুলিতে লাগিয়ে দিল।

রাধার আন্তরিক সেবা-যত্নে পরী একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। তাকে যে কেউ কখনো এতখানি যত্ন করতে পারে এ তার ধারণারও অতীত। বারবার বলতে লাগল, 'দিদি, তুমি খুব নক্ষ্মী মেয়ে। দিদি, তুমি সাগরের কন্যে।'

দুজনে যখন অটবীর কাছে ফিরে এল তখন পরী প্রায় তার স্বাভাবিক স্বভাব ফিরে পেয়েছে। অটবীর সঙ্গে এতদিনের এতখানি ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও যে কথা সে খুলে বলতে পারে নি, আজ মনের একান্ত দুঃখের মধ্যে সেই কথাগুলো সে এক এক করে খুলে বলল। তার ঘরের মানুষটি বোবা জানোয়ারের মত তার দাদার হাতে নির্বিবাদে মার খেয়েছে, মনসা পোতার মালিক তাকে অনায়াসে ঠকিয়েছে। তাই এই নিরুপায় নির্বোধ মানুষটির প্রতি পরীর একটা মমতা বোধ জন্মেছিল। জীবনের একটা চরম বিপদের সময় এই মানুষটা তাকে সাহস করে আশ্রয় দিয়েছিল। তাই খানিকটা

কৃতজ্ঞতা বোধও ছিল। তার প্রতি অনেক খারাপ ব্যবহারও সে এই জন্য এতকাল সহ্য করে এসেছে। কিন্তু তার প্রতি মানুষটা এমনি ব্যবহার করে চলেছে সে তাকে মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার বলে গণ্য করা সত্যিই শক্ত। ভেড়ীতে ত্রিশ টাকা করে মানুষটা মাইনে পায় ঠিকই, মাইনে পাওয়ার পর পাঁচ দশ টাকা সংসার খরচ বাবদ যে তাকে না দেয় এমনও নয়। কিন্তু তারপর নিয়মিত তাড়ীর খরচায় যখন টান পড়ে তখন অনায়াসে সেই পাঁচ দশ টাকার চেয়ে অনেক বেশী পরীর থেকে সে আদায় করে নেয়। ফলে সংসারের সমস্ত খরচাই পরীকে নিজের রোজগারের থেকে চালাতে হয়। সে একা মানুষ, এ জন্যে তার খুব অসুবিধা বা ক্ষোভের কারণ ঘটে না। কিন্তু ক্ষোভ এই জন্যে যে সংসারের কোন দায় বহন না করেও লোকটা কারণে অকারণে পরীর উপর নিয়মিত নির্যাতন করতে ছাড়ে না। পরী যে তার ঘরে আছে এই যেন তার যথেষ্ট অপরাধ!

আজকের ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক। তাড়ীওলার কাছে গোটা পঁচিশেক টাকা নাকি তার দেনা ছিল। টাকাটার জন্য কড়া তাগিদ পড়াতেই হোক বা যে জন্যই হোক, আজ সন্ধ্যার পরে সে এসেই আরম্ভ করল যে পরী তাকে না জানিয়ে গোপনে গোপনে টাকা জমায়। ঘরের বৌ এর পক্ষে এটা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ বলে সে তৎক্ষণাৎ পরীর কাছে জমানো টাকাটা সব দাবী করে বসল। স্বভাবতই পরী তার কাছে কোন জমানো টাকা আছে এ কথা অস্বীকার করল ; এক কিস্তি মার খাওয়ার পরেও পরী কিছুই কবুল করল না। এমন সময় পরীর কোমরের পৈঁছাটার উপর তার নজর পড়ল। তখন তার রাগ দেখে কে? নিজে তো জীবনে পরীকে একগাছা কাচের চুড়িও কিনে দেয় নি। তবু পরী নিজের রোজগারে একটা গয়না কিনেছে তাকে না জানিয়ে এত বড় অপরাধে সে ক্ষিপ্ত-প্রায় হয়ে উঠে সামনে একটা লোহার শিক পেয়ে তাই দিয়ে পরীকে পিটতে আরম্ভ করল। কয়েক ঘা দেওয়ার পরই পরী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিল। জ্ঞান হলে দেখে মানুষটা তার চেতনা সঞ্চারের জন্য কিছু মাত্রও ব্যস্ত না হয়ে লম্ফ নিয়ে যেদিকে পরী পৈঁছাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সেখানটা খুঁজছে। খানিক পরে বিফল

হয়ে সে দারুণ বিরক্তির সঙ্গে ফিরে এসে খানিক দূরে বসে তামাক টানতে লাগল। ভয়ে পরীর রক্ত হিম হয়ে এল। তার আশঙ্কা হল, শাস্তি এই খানেই শেষ হয়নি। সে সুস্থ হয়ে উঠলেই, তার উপর পৈঁছাটা খুঁজে দেওয়ার হুকুম হবে। খুঁজে না দিতে পারলে, যা মানুষ, আবার তাকে মারতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করবে না। উঠে বসার সাহস ছিল না পরীর। গড়িয়ে গড়িয়ে বারান্দা পার হয়ে কোনরকম নিচে পড়ে পালিয়ে এসেছে।

অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো স্বাভাবিক তরল কণ্ঠে বলে গেল পরী; যেন আর কোন মেয়ের ঘটনা বলছিল সে। তারপর একটু সলজ্জ ভাবে হেসে আঁচলের খুঁটটা খুলে দেখালো। বলল, 'তবে পৈঁছেটা দৈবাৎ পেয়ে গেলাম। পেইলে আসার সময় পায়ে ঠেকল। টাকাটাও আমি নিয়ে এসেছি অটবী। ঐ দুশমনটার জন্য ফেলে এসব নাকি ভেবেছো?'

বলে কোমরের থেকে একটা বাঁশের ডোঙা বের করে সেটা ঝেড়ে দেখালো, তার মধ্যে বাষট্টী টাকা কয়েক আনা পয়সা আছে।

'যাক্, তবে ভাতারের বাড়ী আর ফিরে যাচ্ছিস্‌নি, কি বলিস্!' অটবী জিজ্ঞেস করল।

পরী বলল, 'আবারও!' তারপর একটু থেমে, একটু ভেবে আবার বলল, 'তবে নোকটা যদি খুব নরম হয়, যদি খুব কান্নাকাটি করে তা'লে কী করব বলদিনি, অটবী? বারবার ঘর বদল করা কি ভাল? মেয়েছেলের পক্ষে ওটা বড় দোষ! বলতে গেলে ঐ তো আমার পেথম সোয়ামী। আগে যখন বে' হয়েছিল, ত্যাখন তো মোর বুদ্ধি সুদ্ধি কিছু হয়নি কো।'

রাধা বলল, 'বেশ বুদ্ধি আছে তো তোর পরী? লোকের মন বুঝে কথা কইতে পারিস!'

পরী বুঝল, রাধা তার কথাটা বিশ্বাস কোরছে না। হাসতে হাসতে বলল, 'তোর কোন ভয় নেইকো দিদি। তোর ঘর ভেঙতে এ'সনি।'

কিন্তু পরীর শেষের কথাগুলো শুনে অটবীর যেমন বিস্ময় বোধ হল, তেমনি রাগও হল। তাদের জাতের মানুষগুলো আজকে এতই নীচে নেমে এসেছে যে মান অপমানের বালাইও তাদের মন থেকে লোপ পেয়েছে। ঘরের আপন

মানুষগুলো যাচ্ছেতাই করে অত্যাচার কোরছে, বনের পশুর চেয়েও অনেক বেশী খারাপ ব্যবহার কোরছে, তবু আশ্চর্য! পরীর মত একটা মেয়েও সেই ঘরে ফিরে যাওয়ার আশাটা একেবারে ছাড়তে পারছে না। এ সব মানুষের কপালে দুঃখ আছে, অনেক দুঃখ আছে।

কিন্তু ফিরে যাওয়ার আশা পরী একেবারে কী করে ছেড়ে দেয়? মেয়ে যদি বার বার ঘর বদ্‌লাল তবে তো সে একটা বেশ্যার তুল্য হয়ে গেল। তেমন করে শুধু বেঁচে থাকার জন্যই বাঁচতে সে চায় না। যে লোকের ঘরে এসে সে প্রথম নিজেকে খুঁজে পেয়েছে, যে লোকটা তাকে একান্তভাবে নিজের বলা যায় এমন একটা ঘর দিয়েছে, অন্যের ঘরে চোরের মত থাকতে হয় না যেখানে, সে লোকটাকে, সে ঘরখানাকে, কি সহজে ছাড়া যায়?

পরদিন সকাল বেলায় অটবী গাঁয়ের লোকদের কাছে পরীর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে তার কাহিনী সবিস্তারে জানালো। তার আশা ছিল, গ্রামের লোকেরা সহজেই সহানুভূতিশীল হয়ে পড়বে। কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা এমন আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আসল ঘটনাটা ধরে ফেলতে পারল যে অটবী অবাক না হয়ে পারল না।

ঘটনার বিবরণ শুনেই তৎক্ষণাৎ সবাই কাজে যাওয়া এক বেলার জন্য স্থগিত রাখল। কখনো ঘরের দাওয়ায় কখনো হাজরার 'থানে' কখনো বা বাঁধের উপর, নানা ছোট বড় জটলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা নিয়ে আলোচনার আর অন্ত রইল না।

নিতাই বলল, আরে অটবী যে ডুব দিয়ে দিয়ে জল খায় এ আর নতুন খবর কি?'

পুনু বলল, 'আরে, ডুব দে' জল খাওয়া তো ছোট কথা। এখন সে সকলের সামনে ডেঁইড়ে ডেঁইড়ে জল খেতে সুরু করল। তার তোমরা কোরছ কি?'

কালা বলল, 'তাই দেখ্‌তেছিস্‌ শুধু। আর ইদিগে ছুঁড়ীটা যে কী জিনিষ তা তোদের নজরে এস্‌ছেনি?' অমন ছুঁড়ীর পাল্লায় পড়লে মাথা ঠিক রেখবে এমন মুনিষ কে আছে?'

'ছুঁড়ীটার কথা ছেড়ে দে' না রে !' আর একটি লোক তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'ও মাগীর তো নেয়মই আছে, পিতি দু' বছর অন্তর অন্তর ঘর পালটায়।'

সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে বুড়ো নিত্যানন্দ একটু কেশে মন্তব্য করল, 'তোরা দেখে লিস্, ও ছুঁড়িও সতী নক্ষ্মী হবে চুল পাকলে।'

শুনে সবাই বেশ হাসতে পারল খানিকটা।

সকাল বেলা যথারীতি কাঁঠাল বাইরে বেরিয়েছিল। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরতে বাধ্য হল। গাঁয়ের লোকেরা তাকে দলশুদ্ধ মিলিত হয়ে একেবারে জোঁকের মত ছেঁকে ধরেছিল।

'তোর মামার কাপড়ে কাছা পেরায়ই থাকে না কেন রে?' 'তোর মামার গালে দাগ কিসের রে? কামড়ের দাগ নাকি?' 'মামার মত ওস্তাদ কদ্দিনে হবিরে ধম্মের ষাঁড়! নাকি হয়ে উঠেছিস্ তলে তলে?' ইত্যাদি নানারকমের বিচিত্র ধরণের প্রশ্নে কাঁঠাল একেবারে দিশাহারা হয়ে উঠেছিল; আর কাঁঠাল যত বেসামাল হয়ে যাচ্ছিল লোকগুলোর ততই সে কী আনন্দ।

সকাল বেলা রাধা কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সন্ধ্যের মধ্যেও সে যখন আর ফিরে এল না তখন অটবীর বা গাঁয়ের লোকদের আর কোন সন্দেহ রইল না যে সে আর ফিরে আসবে না। তার জায়গায় একজন দাবীদার এসেছে, অটবীর মনটাকে সে ইতিপূর্বেই দখল করে নিয়েছে, একথা জানতে পারার পরেই, আশ্চর্য! বৌ-টা অনায়াসে নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কোন প্রতিবাদ জানালো না, মিথ্যে কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি, মান-অভিমানে সময়-ক্ষেপ করল না। অটবীকে সে ভালবাসত, আইনতঃ বৌ বলেও তার একটা স্বাভাবিক দাবী আছে অটবীর উপর। কিন্তু সে দাবী নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করারও এতটুকু প্রয়োজন বোধ করল না, এমনি আশ্চর্য তেজী মেয়ে সে!

বৌ-এর কাণ্ড দেখে অটবীর পিত্তি অবধি জ্বলে গেল। ঘরের একটা সামান্য বৌ-এর এতই দেমাক যে, পরী সতীন হয়ে আসেনি, সতীন হতে পারে, এইটুকু জেনেই, অনায়াসে বিনা প্রতিবাদে ঘর ছেড়ে চলে গেল? রাধা যদি

ঝগড়া-ঝাটি, পায়ে ধরাধরি, মান-অভিমান করত, তবে অটবী খানিকটা খুসী হতে পারত। এত অনায়াসে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে সে যেন প্রমাণ কোরছে, সে একটা কেউ কেটা মেয়েমানুষ নয়, চূণের থেকে পান খসলেই তার মেজাজ খারাপ হয়, তাকে সাধ্য সাধনা করে তবে ঘরে রাখতে হবে। ঈশ্‌! ভারী তো একটা মেয়েমানুষ, যার একমাত্র গুণ যে সে পেটের মধ্যে এক একটা গোটা মানুষের বাচ্চাকে ধারণ করতে পারে!—সে নাকি সতীনের সঙ্গে ঘর করতে পারে না? তাকে নাকি সাধ্য সাধনা করে রাখতে হবে অটবীকে? রাধা বুঝি ভেবেছে, সে একটা বামুন কায়েতের ঘরের বৌ হয়ে গিয়েছে, যারা বিয়ে হওয়া মাত্র মনে করে কর্তাটি তাদের ভিটে বাড়ীর প্রজা!

রাধা ফিরে না আসাতে এতক্ষণে সমস্ত ঘটনাটা জলের মত স্পষ্ট হয়ে গেল গাঁয়ের লোকদের কাছে। আসলে অটবী আর ঐ ছুঁড়ীটা অনেকদিন ধরেই ষড়যন্ত্র কোরছিল। শেষটায় স্বামী মেরেছে, এই অজুহাত সৃষ্টি করে মাগী কাল পালিয়ে এসেছে। গায়ের মারের দাগগুলো বানানোও হতে পারে, আবার অবিশ্যি, সত্যিও হতে পারে। ঘরের মাগ পরের সঙ্গে পিরীত কোরছে, এ-কথা জেনে কোন মরদ যদি বৌকে না মারে তো বুঝতে হবে তার গায়ে ব্যাঙের রক্ত বইছে। রাধাকে অটবী নিশ্চয় অনেকদিন ধরেই সরে যেতে বলছিল; রাধা কথাটায় গুরুত্ব দিচ্ছে না দেখে কাল পরীকে এনে অটবী দেখিয়ে দিল যে সে শুধু মুখের কথায় নয়, বাস্তবিকই অন্য মেয়ে নিয়ে বাস করতে চায়। কাল রাত্রে নিশ্চয়ই অটবী রাধাকে ভয় দেখিয়েছে যে, যদি সে চলে না যায়, তবে তাকে খুন করবে। অনেকে সাক্ষী দিল যে রাত্রিবেলা অটবীর ঘরে কান্নাকাটির শব্দ শোনা গিয়েছে।

অটবী এ-গাঁয়ের মাথা ছিল, কার্যতঃ গাঁয়ের মোড়ল ছিল বললেই চলে। বাইরের লোকের সঙ্গে যাবতীয় দরদস্তুর, কথাবার্তা চালানোর জন্য অটবীকে না হলে একটা দিনও চলত না। একটা দিনের ঘটনায় সেই অটবীর জন্য গাঁয়ে একটি বন্ধুও রইল না। সবাই যেন অটবীর এই মতিচ্ছন্নতার জন্য পরম খুসী হয়ে উঠল; একবারও ভাবল না, বিপদে-আপদে এই অটবী তাদের কতখানি উপকারে আসে; তাকে না হলে কতখানি অসুবিধা হতে পারে!

গাঁয়ের লোকদের মনোভাবের কথা শুনে অটবী অবাক হয়ে গেল। তারা নিজেদের মন-গড়া কাহিনী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল, অটবীর কাছ থেকে প্রকৃত ঘটনাটা জানার চেষ্টা পর্যন্ত করল না! আশ্চর্য!

যজ্ঞেশ্বরের কাছে গাঁয়ের লোকদের আলোচনার মর্ম শুনে অটবী বেরিয়ে গিয়ে তাদের বলল, 'ভুগমান যদি তোদের সগ্‌গে নে' যায়, তবে সগ্‌গে গিয়ে তোরা ভগমানের মাথাও মাটীতে নেইবে দিতে ছাড়বিনি। আর যদি টানতে টানতে' নরকে ফেলে দেয়, তো সেই ভগমানের পায়ে লাক ঘসতেও তোদের আপিত্ত হবোন! সাধে কি আর দুনিয়ে সুদ্ধ নোক তোদের তিনটে করে নাথ্যি দে' যাচ্ছে!'

শুনে গাঁয়ের লোকেরা চুপ করে বসে থাকে নি। তাদের নানারকম অশ্লীল গালি-গালাজের জবাবে অটবী শেষটায় বাধ্য হয়ে বলল, 'কুকুরে মেলাই ঘেউ ঘেউ করলে মোর ঘুমের ব্যাঘাত হয়।'

বলে ঘরে ফিরে এসেছিল। অটবীর অত রাগ দেখে পরী তো হেসেই খুন।

'অত আগ কোরছ কেনে? ওরা তো বলবেই। পরের বৌ ঘরে পুরে এখেছ তো? অল্যায় কাজ তো বটে! তা ওরা বলবে নি দু'টো মন্দ কথা?' পরী বলল।

অটবী বলল, 'তোর নামে কী বলছে জানিস্? বলৃছে যে তোর পেটটা নাকি কোকিলের বাসা! অন্য নোকের ছেলে নাকি পুষিব্ তুই!'

পরী শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল।

'বাঃ! বেশ বলেছে তো? তা, অমন কিছু তো হতেও পারত! না কি বলতেছ গো,—হতে পারতনি?'

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'অত গরম হোস্‌নি গো। নরম-সরম হয়ে থাক্। দু'দিন পরে দেখবি, সব ঠিক হয়ে গেছে। ও-সব মোর জানা আছে।'

অটবীর এই দুর্দিনে তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বলতে রইল একমাত্র বলরাম যদি বুড়োমানুষ যজ্ঞেশ্বরের কথা না ধরা যায়। রাত নেই, দিন নেই, অটবীকে কেন্দ্র করে গাঁয়ের লোকদের মধ্যে যে ছোট ছোট নানা সাইজের জটলা চলতে

লাগল, তার মধ্যে বলরাম রইল অনুপস্থিত। অবিশ্যি অটবীর হয়ে যে সে গাঁয়ের লোকদের কাছে কিছু বলতে পারল, তা নয়। তবু, অনেকদিনের পুরোনো শত্রুকে একবার যখন সে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে, তখন এত তাড়াতাড়িই আবার সে তার বিরুদ্ধে যাবে না, এ নিশ্চিত।

এ-বিষয়ে অবিশ্যি বলরামের মনে কোন সন্দেহ নেই যে অটবী কাজটা ভাল করেনি। নিজের ঘরের বৌকে তাড়িয়ে দিয়ে আর একজনের বৌকে ঘরে এনে তোলা,—এমন কাজ যদি দেশসুদ্ধ লোক করতে সুরু করে তবে পৃথিবীতে ধর্ম-কর্ম বলে আর কিছু থাকবে না। ভাগবত কাকা তো স্পষ্ট বলেছে যে এমন ঘটনা চলতে থাকলে, ভগমান শেষ পযন্ত আর ভাল লোক মন্দ লোকও বাছবেন না: গোটা দেশটাকে তুলে নিয়ে নরকে বসিয়ে দেবেন। বাইরের কোন মেয়ে বা বৌ-এর প্রতি ভালবাসা থাকাটা খুব বেশী দোষের নয়,—বলরামেরও তো সুভদ্রা ছিল। সুভদ্রার কথা মনে পড়লে তো বলরামের এখনো মন কেমন করে। কিন্তু বলরাম কি তাই বলে বিন্দুকে তাড়িয়ে দিয়ে সুভদ্রাকে ঘরে এনে তুলেছিল? এইখানেই বলরাম আর অটবীর মধ্যে তফাৎ অটবীরা চলে চিন্তা-ভাবনা না করে ঝোঁকের মাথায়, আর বলরাম সব সময় সব কাজে ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ বিচার করে চলে।

দিন দুই পরে এই গাঁয়ে পরী লুকিয়ে আছে খবর পেয়ে মনসাপোতার থেকে তিন-চারটি লোক এল বেতুই গাঁয়ে। দেখা গেল গাঁয়ের একটি পুরুষকে উপকার করার বাসনা তাদেরও নেহাৎ কম নয়।

বেলা তখন গোটা তিনেক। গাঁ-সুদ্ধ লোক তখন ঘরে। লোকগুলো হাজরার থানের পাশ দিয়ে গাঁয়ে ঢুকতেই কালা আর পুমু তাদের গতিরোধ করল।

'কে গো তোমরা? কাকে চাও?'

'অটবীকে। তোমাদের গাঁয়েই তো থাকে অটবী?'

'তা থাকে। কিন্তুক কি দরকার না বললে তো তার সঙ্গে তোমাদের দেখা হবেনি।'

'আচ্ছা, সে-নোকটা একটা বৌকে ধরে এনে আটকে রেখেছে, লয়?'

'সে খবরে তোমাদের দরকার ?'

'মোরা সে বৌটার গাঁয়ের নোক। তাকে নিতে এয়েছি। অটবী তাকে ধরে রেখে অন্যায় করেছে তো বটে। তারও তো সাজা হওয়া দরকার।'

তাদের গাঁয়ের একটি লোককে শাস্তি দিতে চায় ভিন্ গাঁয়ের কয়েকটা উড়, লোক এসে ? সাহস তো কম নয়! কালা গরম হয়ে বলল, 'মোদের গাঁয়ের নোক দোষ করেছে-কি করেনি সে মোরা বিচার করতে পারব। সেজন্য তোমাদের ডেক্‌বনি ? তোমরা যাও এখন।'

লোকগুলো তবু যেতে চায় না।

'বেশ, তোমাদের নোকের ব্যবস্থা তোমরা করতে চাও, কর। কিন্তুক মোদের বৌকে মোদের হাতে ফিরিয়ে দাও। বৌ তো তার স্বামীর সম্পত্তি! তার স্বামী বলেছে, বৌ-কে একবার পেলে সে টুক্‌রো টুকরো করে কেটে জলে ভাসিয়ে দেবে। তা সে তার ইস্তিরীকে যা খুশী তা করতে পারে। মোদের কাজ তার জিনিষ তার হাতে দে' দেওয়া, লয় কি ?'

'বটে ? ও-সব কথা মোদের কাছে বলে কোন নাভ হবেনি। ভাতারের হাতে মার খেয়ে সে-বৌ মোদের ঘরে আশ্চয় লিয়েছে। সে মোদের অতিথ্। তাকে মোরা সব সময় অক্ষে করব। বুঝেছ, বাছাধনেরা, এবার বিদেয় হও।'

লোকগুলো গজ্‌গজ্ করতে করতে চলে গেল। শাসিয়ে গেল যে তাদের সঙ্গে গাঁয়ের বাইরে যখন দেখা হবে তখন তারা এর উপযুক্ত প্রতিফল দেবে।

অটবীর বিচারের জন্য অনেকদিন পরে গাঁয়ে পঞ্চায়েতের বৈঠক বসানোর আয়োজন চলছিল। কিন্তু গাঁয়ের লোকের বিচার তারা নিজেরাই করবে, তাদের এ জিদ বজায় রইল না শেষ পর্যন্ত।

জমিদারের বাড়ীতে তাদের ডাক পড়ল। অটবী বলরাম গেল না। গাঁয়ের লোকের পাণ্ডা হয়ে গেল ভাগবতকাকা। ভাগবতকাকার অবিশ্যি যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না,—এ সব আবিল্যির মধ্যে সে নিজেকে জড়াতে চায় না। গ্রামের লোকের একান্ত অনুরোধে শেষপর্যন্ত যেতে বাধ্য হয়েছে সে।

জমিদার বৈঠকখানায় উপস্থিত সবাইকে বিদায় করে দিয়ে তাদের সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করতে বসলেন।

'শোন তোমরা, তোমাদের সব ভাললোক বলেই জানি। তোমরা নিশ্চয়ই দেখ্ছ, এখনো আকাশে ঠিক সময়মত চন্দ্র সূর্য উঠ্ছে।'

ওদের মধ্যে একজন জবাব দিল, 'আজ্ঞে তা দেখ্ছি, কত্তাবাবু।'

'দুনিয়ার সব-কিছু নিয়মে চলছে যখন তখন ধর্ম-কর্মকেও আমরা বাদ দিতে পারি না। অটবী যে-কাজটা করেছে, তাকে যদি তোমরা প্রশ্রয় দাও তবে কি ধর্ম-কর্ম বলে কিছু থাকবে? কিগো ভাগবত, তুমিই বল না, কথাটা ঠিক কি-না।'

ভাগবত হাত জোড় করে বলতে সুরু করল, 'আজ্ঞে কত্তাবাবু, কথাটা যখন তুললেনই, তখন দু'একটা কথা বলি। শাস্তরে আছে, চার পো কলি যখন পুন্ন্ হবে, ত্যাখন কল্কী অবতার এস্বেন। চার পো কলির লক্ষণ কি কি? না, বাম্ভণ-শুদ্দুরে তফাৎ থাকবেনি; বিয়ে-সাদী বলে কোন জিনিষ থাকবেনি, যে-কোন ইস্তিরী নোক যে-কোন পুরুষের সঙ্গে ঘর করবে। তা অটবীরা যা কর্ছেছে তাতে তো মনে লিচ্ছে যে বে' সাদী তারা একবারে তুলেই দিতে চায়।'

জমিদার সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছ। তুমি পরম ধার্মিক লোক। তুমি সব গুছিয়ে বলতে পারলে। আচ্ছা, চার পো কলি পূর্ণ হলে কী হবে, এদের একটু শুনিয়ে দাও।'

'সে বড় সাংঘেতিক ব্যাপার হবে। সমস্ত পিথিমী বণ্যায় ভেসে যাবে।'

'শুনলে তো! কিন্তু পৃথিবীটাকে তো আমরা বণ্যায় ভেসে যেতে দিতে পারি না, কাজেই অটবীর পাপের প্রতিবিধান করতে হবে।'

'আজ্ঞে কত্তাবাবু, আমরা তো শাস্তি দেব অটবীকে। মোরা পঞ্চায়েৎ ডেকেছি।'

'তোমাদের আবার পঞ্চায়েৎ কোথায় হে? সে-পঞ্চায়েতের মোড়ল তো সুধন্য? সুধন্যকে তোমরা কি একটা মস্ত মানুষ বলে মনে কর নাকি?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে ? শোন, আমি ভেবেছি, এত বড় ঘটনায় সপ্ত গ্রামের পঞ্চায়েৎ ডাকা হোক। তারা যা মীমাংসা করে দেবে, তাই মানতে হবে।'

জমিদার বলছেন; তা ছাড়া অটবীর শাস্তি হওয়াও দরকার; কাজেই সবাই এ-কথায় রাজী হল। সপ্তগ্রামের পঞ্চায়েৎ বলে কোন একটা জিনিষ কোনকালে ছিল বলে শোনা যায়। এখন তার কোন অস্তিত্ব আছে বলে কেউ জানে না। কিন্তু জমিদার যখন বলছেন, এবং তিনিই যখন পঞ্চায়েৎ ডাকার ভার নিচ্ছেন, তখন তার উপর আর কথা কি ? সবাই রাজী হয়ে ফিরে এল।

অটবী জানে না বটে, কিন্তু অটবী যে একটি বিপজ্জনক চরিত্র এ-বিষয়ে জমিদার এবং আশে-পাশের ভেড়ীওলারা সবাই একমত। অটবীর বিরাট নৈতিক অপরাধের ফলে চার পো কলি পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনায় তাই সবাই একটু বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছে। কাজেই জমিদার বিশিষ্ট কারবারী আর মহাজনদের ডাকিয়ে পঞ্চায়েতের আয়োজন করলে তারা নিশ্চয়ই অটবীকে কোন লঘু দণ্ড দিয়ে ছেড়ে দেবে না। গাঁয়ের মূর্খ লোকেরা দু'দশ টাকা জরিমানার চেয়ে বেশী কিছু করার কথা ভাববে না। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই অটবীর অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তির বিধান দেবেন।

সারা গাঁ-এর মধ্যে অটবী আজকে একা, নিঃসঙ্গ। নিজের ব্যাপার নিয়ে গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে বাদানুবাদ বা আপোষ-নিষ্পত্তি করার কোন প্রবৃত্তি তার নেই। যজ্ঞেশ্বরের মারফৎ সে সমস্ত খবরই পায়। পঞ্চায়েৎ ডাকার যে ব্যবস্থা হয়েছে তা-ও সে শুনেছে। জমিদার যে সপ্তগ্রামের পঞ্চায়েৎ ডাকার পরামর্শ দিয়ে তার ভার নিয়েছেন তা-ও শুনেছে। এই জমিদার তাঁর যৌবনকালে যে-কোন সময় দুটি তিনটি করে 'রাঁঢ়' পুষতেন। তিনি একসময় ঘরে একটি বৌ থাকা সত্ত্বেও আবার একটি বামুন-কায়েতের মেয়ে নিকে করে জাতে ওঠার জন্য ক্ষেপে গিয়েছিলেন। সে-সব ইতিহাস এ-গাঁয়ের সবাই জানে। তবু আজ যখন সেই কলুষিত চরিত্রের মানুষটা নীতি-ধর্মের রক্ষক সেজে বসল, তখন সারা গাঁয়ের ভেড়ার পালদের মধ্যে এমন একজনকেও পাওয়া গেল না যে প্রতিবাদ করে! ভাগবতকাকা তো ছিল সঙ্গে, সে-ও

তো নিজের ধার্মিকত্বের দোহাই দিয়ে বলতে পারত, এ-দায়িত্ব তার উপর থাক ? ভাগবত কাকার উপর অটবীর কোনদিনই শ্রদ্ধা নেই ; কিন্তু আজকে মনে হল, লোকটা মেষপালের মধ্যে মেষরাজ। খুব কুঁদে কুঁদে কষে প্রভুর জয়ঢাক পেটাতে পারে ! এ-লোকটাকে আবার দূর দূর গ্রাম থেকে পর্যন্ত ডাকতে আসে ! জল-পড়া, ঝাড়-ফুঁক, ঘটি-চালান ইত্যাদি রাশি-রাশি বুজ্‌রুকির আশ্রয় নিয়ে ভণ্ডটা বেশ দু'পয়সা গুছিয়েও নিচ্ছে !

সমস্ত গাঁয়ের লোকদের বিরুদ্ধেই অটবীর অসহ্য রাগ আর ঘৃণা বোধ হল। এমন কি তার রাগ হল নিজেদের গোটা জাতটার বিরুদ্ধে। এই জাতটার মধ্যে একটা লোককেও সে দেখতে পাচ্ছে না, যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে, পয়সাই যাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, 'আর আমি তোমার পায়ে নাক ঘস্‌ব না।'

সেইজন্যই তো সবাই এদের ঠকিয়ে যায়, অটবী ভাবল। সারা জীবন ধরে বঞ্চিত হয়েও এরা বুঝতেও পারে না যে এরা ঠকছে ! পৃথিবীর নিকৃষ্ট জীব যে ব্যাঙ, সেই ব্যাঙ এদের রোজ সাতবার করে লাথি দিয়ে যাচ্ছে, আর এরা হাতীর দল ভাব্‌ছে যে সোনার ঝালর দিয়ে তাদের আদর করা হচ্ছে ! অটবী নিজের সারাটা মন খুঁজে খুঁজেও এই ভীরু, অপদার্থ দাস-ভাবাপন্ন জাতির জন্য এতটুকু মায়া-মমতা, আত্মীয়তাবোধ খুঁজে পেল না। নিজের ঘৃণার আগুনে নিজেই সে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, এমনি মনে হতে লাগল তার কাছে।

নিজের কী হবে তার জন্য অটবী একটুও চিন্তিত হল না। যে-আঘাতই আসুক, তা সইবার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু এই ঘটনার ভিতর দিয়ে সে তার জাতির লোকদের যে নীচ-অন্তঃকরণ আর দাস-মনোভাবের পরিচয় পেল, তার দারুণ আঘাত এবং বেদনা তার মনের থেকে মরলেও মুছে যাবে না।

কাজে যাওয়ার সময় গাঁয়ের লোকেরা তাকে ডাকল না ; সে নিজেও তাদের সঙ্গে গেল না। এই সর্বপ্রথম শুধু একার জন্য সে জন-মজুরীর কাজ জোগাড় করে নিল। কাজ করার মত মনের অবস্থাও তার নয়। কিন্তু পরীকে খাওয়াতে হবে তো ?

জীবনের এই তিক্ততা ও গ্লানির মধ্যে ঘরে এসে পরীর মুখখানা দেখে সে একটু সান্ত্বনা পায়। পরীর সহানুভূতি-পূর্ণ হাসি-হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে অটবীর মন জুড়িয়ে যায়। অবাক হয়ে ভাবে, এই পৃথিবীর এত গ্লানি আর কদর্যতা কি এই মেয়েটিকে স্পর্শও করতে পারে না? পরীর স্বামী শাসিয়েছে, পরীকে কুচিকুচি করে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে; মনসা পোতার লোকেরা অটবীকে খুঁজছে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য; তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য জমিদারের পরামর্শে সাত সাতটা গাঁয়ের লোক তৈরী হচ্ছে! এ সব খবরই পরী শুনতে পায়। কিন্তু তার সরল হাস্য-মুখর মুখখানায় এতটুকু আশঙ্কা বা বেদনার ছায়াটুকুও দেখা যায় না। আশ্চর্য এই মেয়ে,—এই মেয়ের জন্য পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায়।

একদিন পরীকে জোর করে আয়ত্ত করতে গিয়েছিল অটবী। আজ পরী একান্তভাবে তার আয়ত্তের মধ্যে; নিজে এসে সে ধরা দিয়েছে। তবু অটবীর একবার মনেও হয় না যে পরীর উপর সে কোনরকম বল প্রয়োগ করবে। পরীর দেহের উপর তার যে কোন লোভ নেই, তা নয়। কিন্তু সে লোভ কোনদিন সার্থকতা লাভ করবে কিনা সেটা একান্তভাবে নির্ভর কো'ছে পরীর ইচ্ছার উপর। ঘরে কোন মেয়েছেলে নেই বলে অটবী যজ্ঞেশ্বরের বৌকে নিয়ে এসেছে পরীর সংগে থাকার জন্য। রাত্রে আলাদা, নিধুর পরিত্যক্ত ঘরটায় তার সঙ্গে শুয়ে থাকে বৌটি।

তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কী হবে তা নিয়ে পর্যন্ত সে ভাবে না। এ নিয়ে পরীর সঙ্গেও তার একদিনের জন্যও আলাপ হয়নি। পঞ্চায়েতের রায়ের জন্য সে ভাবে না। পরী যা ইচ্ছা করবে, তার উপরই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।

অনেকদিন ধরে অনেকবার ঠেকে ঠেকে অটবী এটুকু বুঝেছে যে পরীর মত মেয়েকে জোর করে পাওয়া যায় না। জোর করে পাওয়ার চেষ্টা করতে গেলে একেবারেই হারানোর আশঙ্কা আছে! সেই কবে থেকে অটবী পরীর মনের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। অটবীর চরিত্রে ধৈর্য বলে কোন জিনিষ ছিল না। পরী তাকে ধৈর্য শিখিয়েছে। আজ সে দরকার হলে আরও

অনেকদিন পরীর জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারবে। কিন্তু এ বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই যে পরী একদিন তার হবে। পরী যদি তার না-ই হবে, তবে এই নিঃসঙ্গ একক অনুর্বর পৃথিবীতে সে বেঁচে থাকবে কাকে নিয়ে ?

অবিশ্যি অটবীর এই ভালমানুষ মনটির পিছনে গা ঢাকা দিয়ে আর একটি মন নিঃশব্দে ওৎ পেতে বসে আছে। সে চাইছে প্রতিশোধ নিতে। একদিন অটবী পরীকে পাওয়ার জন্য বারবার করে কাকুতি মিনতি জানিয়েছে। অহংকারী পরী সেদিন তার ডাকে সাড়া দেয়নি। এমনকি স্বামীকে বলে দিয়ে তাকে মার পর্যন্ত খাইয়েছে। আজ এতদিন পরে অটবী দিন পেয়েছে। সেদিনের প্রতিশোধ সে নেবে। অদৃষ্টের পরিহাসে পরীকে আজ নিজে যেচে সেধে আসতে হয়েছে অটবীর ঘরে। কিন্তু তাতেও যথেষ্ট হয়নি। পরীকে আরও নিচে নেমে আসতে হবে, মাথা আরও নিচে নামাতে হবে অটবীর সামনে। দিনের পর দিন পরী এখন অধৈর্য ভাবে অপেক্ষা করবে অটবী তার কাছে আগের মত প্রণয় নিবেদন করবে এই ভাবনায়। অটবী কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতেও তার কামনা প্রকাশ করবে না। শেষে একদিন না একদিন পরীকে হার মানতেই হবে। অপমান স্বীকার করে একদিনের প্রত্যাখ্যাত মানুষটির কাছে প্রণয় ভিক্ষা করতে হবে করুণ ভাবে। সেদিন অটবীর প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পূর্ণ হবে।

পরী যেমন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, অটবী কিন্তু তেমন করে পরীকে ফিরিয়ে দেবে না। পুরুষের ঔদার্য নিয়ে অসহায় নারীকে সে আশ্রয় দেবে।

নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে পঞ্চায়েতের সভা বসল হাজরার 'থানে'। খান দশ পনেরো চেয়ার গ্রামের লোকরাই টানাটানি করে নিয়ে এসেছে কালাচাঁদ প্রামাণিকের বাড়ী থেকে। প্রামাণিক মশাইও পঞ্চায়েতে স্থান পেয়েছেন, যদিও জমিদার কাঞ্চন রায় বে-আইনীভাবে তাঁর জমি বেদখল করার পর থেকে তাঁরা এখন পরস্পরের সঙ্গে মামলায় লিপ্ত।

পঞ্চায়েতের সভ্য হিসাবে যাঁরা এলেন, অর্থাৎ জমিদার যাঁদের সভ্য হিসাবে মনোনীত করেছেন, তাঁরা সবাই এ অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রায় সব ক'জনই বড় বড় ভেড়ীওলা। পঞ্চায়েতের সভ্য বলে স্বীকৃত না হওয়া

সত্ত্বেও এসেছেন কাঞ্চন রায়ের বড় ছেলে, অর্থাৎ ওদের বড়বাবু। কাঞ্চন রায় নিজে আসতে পারেননি। প্রতিনিধি হিসাবে সুমন্তবাবুকে পাঠিয়েছেন। সামান্য একজন জনমজুরের একটা অপরাধের বিচারের জন্য বেতুই গাঁয়ের মত গণ্ডগ্রামে এতজন বিশিষ্ট লোকের পদার্পণ হওয়ায় গ্রামের লোকেরা পুলকিত হল। না, দেশের ধর্ম কর্ম সব একেবারে রসাতলে গেছে বলে 'হায় হায়' করার সত্যিই কোন কারণ নেই। নীতি ধর্ম রক্ষার জন্য এই সব লোকেরা যদি তাঁদের সময়ের ক্ষতির কথা চিন্তা না করে তৎপর হয়ে ওঠেন তবে আর চিন্তা কি?

কালাচাঁদ বাবুই প্রথম আলোচনা সুরু করলেন।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা একটা অপ্রিয় কর্তব্য পালন করতে এই সভায় উপস্থিত হয়েছি। আসামী অটবীকে আমরা সবাই অত্যন্ত স্নেহ করি সে কাজের লোক বলে আমরা প্রশংসাও করি। দুঃখের বিষয় সে একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে। নিজের বৌকে তাড়িয়ে দিয়ে সে আর একজনের বৌ কে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে। ইউরোপে এরকম ঘটনা নাকি ঘটে। কিন্তু আমরা হিন্দু হয়ে তো এ-ধরণের ঘটনা সম্পর্কে চোখ বুঁজে থাকতে পারি না! ধর্ম যাতে রক্ষা পায়, এ-জন্য আপনারা এর সুবিচার করুন।'

অবনীবাবু নামে এক ভদ্রলোক, যিনি একটি ভেড়ীর অংশীদারও বটেন, আবার সহরের একজন বিশিষ্ট উকিলও বটেন, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'লোকটার সম্পর্কে আপনাদের যখন ভাল ধারণা ছিল, তখন আগে দেখা দরকার, এ-সত্যিই তার বৌ-কে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে কি-না, এবং সত্যিই অন্যের বৌ-কে ভাগিয়ে এনেছে কিনা। এ-বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছু আছে?'

এ-কথা শুনে উপস্থিত সবাই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কেন যে তাকালেন, নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রয়োগের গর্বে গর্বিত ভদ্রলোক তার কারণ বুঝতে পারলেন না।

গৌর মণ্ডল উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তি ভরে বললেন, 'সে-সব প্রমাণ-ট্রমান আমাদের আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছে। নতুন করে আর সাক্ষ্য প্রমাণ নেওয়ার দরকার নেই? কী বলছ গো গাঁয়ের লোকেরা, দরকার আছে?'

দু'তিনজন বলে উঠল, 'না, নেই।'

কিন্তু আবার গোলমাল বাধালো যজ্ঞেশ্বর।

'আজ্ঞে কর্তারা! যে-বৌটার কথা বলা হচ্ছে, সে এই সামনেই আছে। তাকে জিজ্ঞেসা করে দেখুন, সে তার স্বামীর হাতে অত্যন্ত মার খেয়ে আরও মারের ভয়ে পেইলে এসেছিল। আর অটবীর বৌ-কে কেউ তেইড়ে দেয়নি, সে নিজেই পেইলে গিয়েছে। কেন ভাগমান জানেন।'

এ-কথা খণ্ডন করলেন বীরু অধিকারী। মানুষটা সরু, কিন্তু তাঁর গলাটা বাজখাঁই, প্রভুত্বব্যঞ্জক।

'এ বুড়ো অথর্ব লোকটার কথাকে আমল দেওয়ার কোন মানে হয় না। তবু তার কথা যে মিথ্যা তা প্রমাণ কোরছি। প্রথমতঃ, সে যে বলছে, স্বামী স্ত্রীকে মেরেছে, এ হতেই পারে না। আগেকার দিনে ক্বচিৎ কখনো এমন ঘটনা হয়তো ঘটত। কিন্তু আজকাল এমন একটি ঘটনার কথাও শোনা যায় না। কারণ স্ত্রীকে মারা আজকাল আইনতঃ নিষিদ্ধ। আইন ভঙ্গ করলে তার কঠিন সাজা হয়। আমার তো অভিজ্ঞতা এই যে আজকাল স্বামীরাই স্ত্রীদের যথেষ্ট ভয় করে চলে। দ্বিতীয়তঃ, লোকটা বলেছে, অটবীর স্ত্রী স্বেচ্ছায় পালিয়ে গিয়েছে। কেন তা নাকি ভগবান জানেন, অর্থাৎ সে জানে না। অর্থাৎ যে অমানুষিক অত্যাচারের ফলে বৌটা চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তার খবর কেউ জানে না।'

এ-সব অকাট্য যুক্তি শুনে উকিল অবনীবাবু অনেকটা নরম হয়ে গেলেন। তবু বললেন, 'আচ্ছা, আসামীর বক্তব্যটা একবার শোনা যাক।'

সভার হালচাল দেখে অটবী ইতিমধ্যেই ত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। উঠে না দাঁড়িয়ে বসে বসেই বলল, 'আমি কিছু বলতে চাই না। বলে কোন লাভ হবেনি।'

কালাচাঁদবাবু বললেন, 'দেখলেন তো অবনীবাবু, বুড়োটার কথা জেরায় টিকল না দেখে এ আর কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। এর তো আর নতুন কিছু বলার নেই। আসলে এই-তো বুড়োটাকে ঘুঁষ দিয়ে হাত করে শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিকঠাক করে রেখেছিল।'

এইবার অবনীবাবু একেবারেই হেরে গিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

অটবীর অপরাধটা খুব তাড়াতাড়িই প্রমাণ হয়ে গেল, কিন্তু শাস্তির পরিমাণটা সাব্যস্ত হতে দেরী হতে লাগল। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনেক সময় ধরে নিজেদের মধ্যে গুজ্‌গুজ করে আলোচনা করতে লাগলেন। গাঁয়ের লোকেরা রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো। এত সব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এতখানি বিবেচনা করে যে রায় দেবেন তা নিশ্চয়ই তাদের সমস্ত কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাবে।

গেলও তাই। কল্পনাকে নয়, প্রত্যাশাকে। তাঁরা রায় দিলেন যে হয় অটবী পরীকে ছেড়ে দেবে এবং পরী তার স্বামীর কাছে ফিরে যাবে; আর নয়তো, অটবী আর পরী যদি এক সঙ্গেই থাকতে চায় তবে তাদের সপ্তগ্রামের এই চৌহদ্দী ছাড়িয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। আর যে কোন ক্ষেত্রেই, গর্হিত অপরাধ করার জন্য অটবীকে দেড়শো টাকা খেসারৎ দিতে হবে পঞ্চায়েতের হাতে।

একটা নষ্ট মেয়েমানুষের জন্য অটবী কখনোই তার বাপের ভিটে ত্যাগ করে যাবে না, এইটেই অবিশ্যি তাঁরা আশা করেন। এবং অটবী নিশ্চয়ই পরীকে তার স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করবে।

শুনে গাঁয়ের লোকেরা কেমন নিরুত্তেজ মন-মড়া হয়ে বসে রইল। এই রায় দেওয়ার জন্য একঘণ্টা পরামর্শ করতে হয়! তারা হলে তো পাঁচ মিনিটের মধ্যে এ-কথা বলে দিতে পারত।

সভার ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল, 'কিন্তুক পরীকে যদি তার স্বামী নিতে রাজী না হয়?'

কালাচাঁদবাবু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'নিতে না চাইলে তার আমরা কী করব? ভাল জ্বালা! নেওয়া না নেওয়া তার ইচ্ছা, তাকে তো আমরা বাধ্য করতে পারি না। না নিলে পরী তার সুবিধামত ব্যবস্থা করে নেবে,—আমরা তার কি জানি?'

এতক্ষণ পর্যন্ত বড়বাবু একটাও কথা বলেননি। তিনি যে সভায় আছেন এ-কথাই লোকে ভুলে গিয়েছিল। এবার তিনি মুখ খুলে বললেন, 'সেজন্য তোমরা ভেব না। পরীর স্বামী যদি পরীকে না-ই নেয়, তবে আমি তার ব্যবস্থা করে দেব। আমি ওর থাকার জন্য আশ্রম ঠিক করে দেব।'

তবু গাঁয়ের লোকেরা এতটুকু উৎসাহ না দেখিয়ে চুপচাপ বসে রইল। অত কালো যাদের মুখ, তাদের মুখের ভাবে হর্ষ বা বিষাদ্ চট্ করে বুঝতে পারা যায় না। এত সুচারু বিচারের ব্যবস্থাতেও তারা খুসী হয়েছে কিনা বুঝতে না পারায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভাবলেন, গরীব লোকদের বিশেষত্বই এই যে তাদের কিছুতেই খুসী করা যায় না।

একমাত্র ভাগবত কাকা খুসী হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'এতদিনে জানলাম, বড়বাবু য্যাতদিন আছেন, ত্যাতদিন মোরা বটগাছের ছাওয়াতে আছি।' তারপর পরীকে লক্ষ্য করে বলল, 'ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কী দেখছিস মাগী? বাবুদের কাছে গড় কর, পায়ের ধূলো নে। কত বড় উব্গার করলেন উনারা বুঝতে পারছিস্‌নি? যে পাপ তুই করেছিস্, তোর মাথা মুড়ে ঘোল ঢেলে দেশ থে' বের করে দিলেও কিচ্ছুটি তোর বলার ছেল না।'

সুমন্তবাবু বললেন, 'গাঁয়ের মধ্যে মানুষ থাকলে একমাত্র ভাগবতই আছে।'

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিদায় নেওয়ার আগে আর একবার করে অটবীকে নানারকম উপদেশ দিলেন। খুব ভেবে চিন্তে মাথা ঠাণ্ডা রেখে অটবী যেন ইতিকর্তব্য ঠিক করে। বেশী দেরী করলে কিন্তু চলবে না। তিন দিনের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে হবে পঞ্চায়েৎ-কে।

আর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চলে গেলে অটবী নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ভাগবতের গালের উপর প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল।

এত বড় একটা ধার্মিক লোককে মারতে দেখে সমস্ত লোক চম্‌কে উঠল। পানু তাড়াতাড়ি গিয়ে অটবীর একখানা হাত ধরল। কিন্তু অটবীর কাছে শক্তিতে সে ছেলেমানুষ; অটবী এক ঝট্‌কায় হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

কালা পানুকে ধমক দিল, 'এই ব্যাটা, অটবীদাকে ছেড়ে দে। ভাগবত কাকার শরাল হল গিয়ে পুণ্যের শরীল। একটা চড় মারলে অমন শরীলে দাগ নাগ্‌বেনি।'

ভাগবত যখন দেখল তার সমর্থনে আর কেউই এগিয়ে আসছে না, তখন বলল, 'আচ্ছা বা অটবী অনেক মনোকষ্ট পেয়েছিস্—তোকে মাপ করে দিলাম।'

অটবী বাড়ীতে ফিরে আসতে আসতে ভাবল, পরী যদি সঙ্গে যায়, তো দেশ ছেড়ে চলে যেতে তার দুঃখেরই বা কী আছে। গাঁয়ের লোকেরা তার দিকটা একবারও বিবেচনা করে দেখেনি ; তার যে কিছু বলার থাকতে পারে তাই তারা মনে করেনি। বরং বিচার করার জন্য ডেকে এনেছে জাতি-শত্রুদের। কাজেই এ-মানুষদের ছেড়ে চলে যেতে তার মনে কোন দুঃখ নেই। দুঃখ এই যে তাকে যেতে হচ্ছে এমন একটা পঞ্চায়েতের নির্দেশে যাকে মান্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু পরী যেতে রাজী হবে তো ?

গাঁয়ের থেকে চার-পাঁচজন লোক এল অটবীর সঙ্গে দেখা করতে।

'তোদের মিলনে য্যাতক্ষণ আপিত্য নেই, তবে তোরা গাঁয়েই থাক না অটবী ? না হয় গাঁয়ের পঞ্চায়েৎ-কে কিছু মিষ্টি-টিষ্টি খেইয়ে দিস্ !'

অটবী জিজ্ঞেস করল, 'জমিদার যদি না মানে তোদের কথা ?'

তাইতো ! সে-কথাটা তো তারা ভেবে দেখেনি ! সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

'বেশ, মোরা কাল সকালেই গিয়ে জমিদারের মত নে' এসব।'

অটবী একটু তিক্ত হাসি হাসল, জবাব দিল না।

কিন্তু অনেক রাত অবধি অনেক রকমে বুঝিয়েও পরীর থেকে কোন পষ্টাপষ্টি জবাব পাওয়া গেল না। কখনো বলল, 'ভেবে দেখি' ; কখনো বলল, 'আজ রেতেই তো আর বোঁচকা বেঁধে রওনা দিচ্ছিস্‌নি ! সকাল হোক, বলব।' শেষে একবার স্বগতোক্তির মত বলল, 'মিন্‌সেটা কি বে-আক্কেলে দেখেছিস্ ? পিথিমী ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে। ব্যাটা একবার খোঁজ নিলেনি ?'

পরদিন সকালবেলা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বয়ং বড়বাবু শম্ভুকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। অটবী এল, পরী এল একগলা ঘোমটা দিয়ে।

বড়বাবু বললেন, 'সেই সাত সকালে বোকাটা আমার ঘরের দরজায় গিয়ে বসে আছে। এদিকে খবর রেখেছে সব ; কাল যে পঞ্চায়েতের বৈঠক হয়ে গিয়েছে তা-ও খবর রেখেছে। আমি তো উঠি একটু দেরীতে। বাইরে আসতেই পা জড়িয়ে ধরেছে ; কাঁদতে কাঁদতে বলে, কী খবর হল বাবু ? বললাম। তক্ষুনি ধরে বসল, সঙ্গে আমাকে আসতে হবে। পরীকে যেমন

করেই হোক, বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করতে হবে। পরীকে না হলে নাকি সে বাঁচবেই না। তা বুঝলি পরী, লোকটা তোকে ভালবাসে খুব। তোকে মেরেছিল বটে, কিন্তু সেই থেকে অনুতাপে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছে। দেখ্‌ছিস্ না, চেহারা কী হয়েছে ? তা এক কাজ কর, পরী, যা তুই তোর স্বামীর সঙ্গে।'

অটবী বলল, 'আপনি জানেন নি বড়বাবু, এ-লোকটা বলেছে যে পরীকে পেলে কুচি কুচি করে কাটবে।'

বড়বাবু জিব্‌ কেটে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ! তেমন মুনিষ লয় হে শম্ভু।' শম্ভুরে কত কথা রটায়, তাতে কান দিতে নেই।'

পরী ঘোমটার আড়াল থেকে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল, 'জিজ্ঞেস কর তো, আর মার-ধর করবেনি তো?'

কথাটা শম্ভু শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ বলল, 'কক্ষনো লয়। তুই লাকে খৎ দিতে বলিস্ তো দি।'

'বেশ তবে আমি যাব।' পরী বলল শান্তগলায়।

দারুণ রাগে অটবীর অন্তর অবধি যেন জ্বলে গেল। এই মেয়েটার জন্য সে এত নিগ্রহ, এত লাঞ্ছনা ভোগ করেছে! সে নিজের বাপের ভিটা ছেড়ে চলে যেতে পর্যন্ত তৈরী হয়েছে। আর এখন মরদের মুখখানা দেখেই মেয়েটা সব কথা ভুলে গেল। মেয়েমানুষ কি তবে কুকুরের জাত।

অটবী রেগে বলল, 'তাই যা ভাতার হাড়ি হাড়ি মধু রেখে দিয়েছে, খেগে যা।'

শম্ভু আর বড়বাবুর সংগে যখন পরী রওয়ানা হল, অটবী কোন প্রতিবাদ করল না, একবার সামনে গিয়ে তাদের গতিরোধ করল না। শুধু তার চোখ দুটো যেন জ্বলে যেতে লাগল।

বড় রাস্তার পৌঁছে, পরী আর শম্ভু তাদের বাড়ীর রাস্তা ধরল। বড়বাবু তাঁর গাড়ীর দিকে গেলেন।

মাত্র হাত কুড়িক গিয়েই শম্ভু তার কোমরের গামছাটা খুলে নিয়ে মাথায় জড়াল। এর মধ্যেই রদ্দুর বেশ চড়ে গিয়েছে।

শম্ভুর কোমরে কি গোজা রয়েছে দেখে পরী জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কিরে?'

'ওটা?' বলে শম্ভু উৎসাহিত হয়ে খাপসুদ্ধ ছোরাটা টেনে বের করে খাপের থেকে আন্‌কোরা নতুন গ্রীজ-লাগানো ঝক্‌ঝকে ছোরাটা বের করে দেখালো।

'হাট থেকে কেনা নয়রে, অর্ডার দে' তেইরী করিয়েছি। খাঁটি জিনিষ। চাদ্দিকে শত্তুর, একটা অস্তর থাকা ভালো।'

তারপর পরীর ভীত সন্ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভয় পাস্‌নি! এই এই ভর দুকুরবেলা আস্তার উপর তোকে কাটবনি।'

অর্থাৎ, কাটবার জন্য আরও অনেক নিরাপদ অবকাশ আছে। রাত্রি আছে, নিজের বাড়ীর নিরাপদ চৌহদ্দী আছে!

একমুহূর্তে পরী বুঝতে পারল মনের মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র পুষে রেখে শম্ভু তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। মানুষটা বোকা। কিন্তু খুনের নেশা তার মনকে এমনি করে পেয়ে বসেছিল যে তা তার মনে দুষ্টবুদ্ধি জুগিয়েছে। এমন চমৎকার করে অনুতাপের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল মুখে যে পরীর মত মেয়েও প্রতারিত হয়ে এতদূর চলে এসেছে তার সঙ্গে!

পরী দারুণ ভয়ে আর ঘৃণায় একটা হ্যাচ্‌কা টানে শম্ভুর হাত থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে, 'মেরে ফেলল, মেরে ফেলল', বলে চীৎকার করতে করতে ছুটল। চীৎকার শুনে বড়বাবু গাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। খোলা দরজা পেয়ে পরী সোজা গিয়ে গাড়ীর ভিতর ঢুকল।

শম্ভু পিছনে পিছনে আসতে আসতে বলল, 'কি বিপদ! দেখুন তো বাবু। আমি ঠাট্টা কচ্ছিলাম। আর মাগীটা ভয় পেয়ে দৌড় দিল।'

'হুঃ', বলে বড়বাবু গাড়ীর ভিতর ঢুকলেন। গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়াই ছিল। একরাশ নীল ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ী চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শম্ভু পরীর কথাও ভুলে গেল। গাড়ী তার কাছে নতুন জিনিষ নয়: কিন্তু যখনই দেখে তখনই বিস্ময়ে সম্ভ্রমে তার মন ভরে যায়। হাওয়ায় চলে এই গাড়ী, গরু বা ঘোড়াতেও টানে না,

মানুষেও ঠেলে নেয় না। যন্ত্রের সাহায্যে হাওয়ার উপর এমন চাপ দেয় যে হাওয়াটা একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে নীল হয়ে যায়। তাই তো নীল ধোঁয়া বের হয়।

অত বড় ঘটনার কোন সাক্ষী ছিল না। তাই খবরটা বেতুই গাঁ-য়ে পৌঁছতে দু'তিন দিন দেরী হল। বিভিন্ন সূত্র থেকে বিকৃত এবং অতিরঞ্জিত হয়ে নানারকম পরস্পর-বিরোধী সংবাদ আসতে লাগল। কাজেই যার যার মর্জি অনুসারে খবরগুলো গ্রহণ এবং বর্জন করতে লাগল। অনেকে ভাবল, পরীই ইচ্ছে করে বড়বাবুর সঙ্গে গিয়েছে। ওর মত মেয়ের পক্ষে তা তো স্বাভাবিকই; বড়বাবুর নধরকান্তি দেখে নিশ্চয় ভেবেছে, চাষা-সামান্তির ঘর তো অনেক চেখে দেখা হল, এবার একটু উঁচুর দিকে 'পমোশন' হোক না। আবার অনেকে বড়বাবুর চরিত্রের কথা স্মরণ করে ভাবল, নিশ্চয় বড়বাবুর চক্রান্ত; দু'দিন পর পর এসেছে এতদূর পায়ে হেটে,—সে কা এমনি এমনি!

শুধু অটবী কোন বিশ্লেষণে যোগ দিল না। পরীকে উদ্ধার করার জন্য গাঁয়ের লোকদের আন্তরিক অনুরোধেও সাড়া দিল না। সে বুঝতে পারল, এ-সংসারে তার কাজ ফুরিয়েছে। সংসারটা যদিও খুব বড়, কিন্তু তার মত মানুষের এখানে স্থান নেই। এ-সংসারে অনেক বাড়ীঘর দেখা যায়, আসলে সেগুলো গাছ-গাছড়া। শাল তমালের মত নয়; নীমগাছ, পাঁকুরগাছ, কদম গাছ, এইসব। এই জঙ্গলের মধ্যে যে-সব পশুরা বাস করে তাদের মধ্যে অবিশ্যি বাঘ-সিংহ একটাও চোখে পড়ে না। এ-জঙ্গলে রাজত্ব করে শেয়ালের পাল, আর তাদের কাছে চাকরান্ খাটে পালে পালে অগুণতি ভেড়া।

আকাশে পাখীরা ওড়ে; ঈগল পাখী-টাখা নয়; শকুনি আর দাঁড়কাক।

পনেরো

সেদিন গড়িয়াতে হাট ছিল। হাটের ভিতর দিয়ে ফিরছিল অটবী। হাট পার হয়ে যে চওড়া মেটে রাস্তাটা পড়ে সেই রাস্তা দিয়ে একটুখানি গিয়ে অটবী হঠাৎ মোড় ঘুরে একটা সরু পায়ে-চলা পথ ধরল। বড় রাস্তায় ভীড় বেশী ছিল, সেই ভীড়টা এড়ানোর জন্য।

খানিকদূর এগিয়ে অটবী দেখতে পেল, একখানি বাড়ীর পরে একটু ফাঁকা জায়গায় একটা গাছতলায় বসে আছেন সুমন্তবাবু। একা; একেবারে আদুল গা। বোধকরি অনেক প্রজাদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে গরম বোধ হওয়ায় এখানে বসেছেন ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য। খালি গায়ে কী কুৎসিৎ দেখায় ভদ্রলোকদের! সরু বুকখানা ক্রমশঃ মোটা হতে হতে গিয়ে পেটের বিপুল ভুঁড়িতে শেষ হয়েছে। শরীরের ধড়টার তুলনায় হাত-পাগুলো যেন আরও সরু। জিড়জিড়ে হাড়ে খানিকটা থলথলে মাস লাগিয়ে দিয়েছে যেন! মুখখানা খুব চকচকে,— লোভে আর শঠতায়।

তবু এমন অদ্ভুৎ জায়গায় নায়েবমশাইকে এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখে কেমন কৌতূহল বোধ হল অটবীর।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নায়েবমশা' লয়? এখানে এমন একা বসে আছেন?'

কে জিজ্ঞেস কোরছে একবার তাকিয়ে দেখে নায়েবমশাই যেদিকে তাকিয়ে ছিলেন সেইদিকে মুখ ফেরালেন।

'বিশ্রাম কোরছি। হরেকে পাঠিয়েছি হাটে।'

'আপনি পাইঠেছেন হরেকে? ও ব্যাটাকে তো দেখলাম শুঁড়ীর দোকানে দু' লম্বরের পাঁট লিচ্ছে একটা। আপনার পয়সা মেড়েই মনে লিচ্ছে সুরা-ঠাকুরুণে পূজো হচ্ছে! পয়সা ফেরৎ নেওয়ার সময় হিসেব করে লিবেন বাবু।'

'ভারী বুদ্ধিমানের মতই কথা বললি বেল্লিক! আমার পয়সায় মদ খাবে

'হরে'—ত্রিশ বছর নায়েবী কোরছি আমি! হরি মদ খাবে কী রে, ব্যাট উজবুক? মদ খেতে পয়সা লাগে না? ও ব্যাটা খাবে ছ' আনার এক ঝাঁপা তাড়ী।'

বেশ আমোদ বোধ হচ্ছিল অটবীর. বলল, 'আপনি বাংলা মদ খাবেন বাবু? ছি! ছি! ভদ্দরনোকে বাংলা মদ খায়?'

গোড়া থেকেই সুমন্তবাবু লক্ষ্য করেছেন, অটবী কথা বলছে যেন তাঁর সমস্তরের মানুষ হিসাবে। এতক্ষণ তবু ভাবা সম্ভব ছিল, গেঁয়োলোক, ভব্যতা জানে না। কিন্তু এখন যে কথাটা বলল, এর মধ্যে তার বজ্জাতী বুদ্ধি সুপরিস্ফুট। তা তো হবেই; কর্তাবাবুর প্রজাদের মধ্যে অটবী হল সেরা শয়তান; ওর বিষ দাঁত কিছুতেই ভাঙা যাচ্ছে না।

'হারামজাদা, কার সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয় জানিস্ না? আমি বাংলা খাই, না, বিলিতি খাই, তা দিয়ে তোর দরকার? তোকে একটা কড়া রকমের আক্কেল দিতে হবে দেখছি!'

অটবী হাসতে হাসতে রওয়ানা দিল; যাওয়ার সময় বলে গেল, 'বাবু জানেন না, কলিযুগের বাম্ভনরা ঢোঁড়া সাপ?'

অটবী চলতে চলতে নায়েবমশাই ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে যে তার পিঠটাই দগ্ধ করতে চেষ্টা কোরছেন, সেটা কল্পনায় উপভোগ করতে লাগল। খানিকদূর গিয়েই সে আবার ফিরে এল। নায়েবমশাই এর কাছে এসে পকেট থেকে এক টুক্‌রো কাগজ বের করে সামনে ধরল। মুড়ি কেনার সময় মুদীর দোকানদার এই কাগজটা জড়িয়ে মুড়ি দিয়েছিল।

'বাবু, এই চিঠিখানা কোর্ট থে' দিয়েছে। কি নিখেছে একটু বলে দেবেন?'

ভুল নির্দেশ দিয়ে লোকটাকে জব্দ করা যেতে পারে ভেবে নায়েবমশাই কাগজটা হাতে নিলেন। কিন্তু পকেট হাতড়িয়ে চশমা-জোড়া পেলেন না। পকেটের থেকে মুখটা বের করে আছে দেখে অটবী চশমা-জোড়া আগেই সরিয়ে ফেলেছিল। অগত্যা খালি চোখেই নায়েবমশাই কাগজটার পাঠোদ্ধারে মন দিলেন।

অটবী হঠাৎ বলল, 'অমন করে কাঁধের উপর চাদর রেখেছেন বাবু? পড়ে যাবে যে!'

বলে নায়েবমশাই কিছু বলার আগেই অটবী নায়েবমশাই-এর চাদরখানা তার গলায় জড়িয়ে দিল। নায়েবমশাই অবাক হয়ে এবং ততোধিক ক্রুদ্ধ হয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে কিছু বলার জন্য হা করলেন। অটবী ক্ষিপ্রবেগে সেই হা-এর মধ্যে তার কোমরের গামছাখানা টেনে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল। তারপর চাদরটার দু'প্রান্ত দু'হাত দিয়ে ধরে টানতে লাগল,—জোরে, আরও জোরে, তার গায়ে যত জোর আছে তত জোরে।

কাজটা যে অটবী হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় করল তা নয়। অনেকদিন আগেই, এমন-কি পরীকে বড়বাবু নিয়ে যাওয়ারও আগে, সে বলরামের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল নায়েবমশাইকে খুন করার জন্য। অনেকদিন ধরেই তার মন একটা সাংঘাতিক কিছু, ভয়ংকর, লোমহর্ষক কিছু, করার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। অনেকদিন ধরেই জীবনটা তার কাছে অসহ্য একঘেঁয়ে এবং অর্থহীন বলে বোধ হতে সুরু করেছে। নির্বিচারে ঠকানো এবং নির্বিচারে ঠকার ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমীর মধ্যে তার শরীরের রক্ত যেন ক্রমশঃ গতি হারিয়ে ফেলে জমাট বরফে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। পিপে পিপে মদ তাড়ীও আর এই জমাট রক্তের মধ্যে কোনরকম উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারছিল না। মাঝখানে পরী এসে তার দেহের উত্তাপে রক্তটাকে একটু একটু গলাতে পেরেছিল বটে, কিন্তু সেটা নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। তাতে বরং অটবী আরও ভাল করে বুঝতে পারছিল তার রক্তটা আর তরল নেই। এই ঝিমানো রক্তের মধ্যে উত্তেজনার দাপাদাপি সৃষ্টি করার জন্য তীব্র, মদ-তাড়ীর চেয়ে অনেক বেশী তীব্র, একটা উত্তেজক কিছুর দরকার। এমন কিছু অটবীকে করতে হবে যাতে তাদের সমস্ত অঞ্চল, জমিদারের সমস্ত জমিদারী, থরথর করে কেঁপে ওঠে ভয়ে, আতঙ্ক এবং বিস্ময়ে। আর চারদিকে দারুণ তোলপাড়, হট্টগোল লেগে গেলে তার মধ্যে অটবী বুঝতে পারবে, সে বেঁচে আছে।

পৃথিবীতে এমন ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে একটি মাত্র ঘটনা, নরহত্যা। পরীকে বড়বাবু বুক ফুলিয়ে সদর রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর অটবী প্রথমে

ভেবেছিল বড়বাবুই খুন করার উপযুক্ত লোক। কিন্তু কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করেও কোন সুবিধাজনক জায়গায় বড়বাবুকে পাওয়া গেল না। দেশ-গাঁয়ের দিকে বড়বাবু আজকাল কমই আসেন। পরীকে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে এ দিকে একদিনও এসেছেন বলে কারও চোখে পড়েনি। সহরে বড়বাবু সব সময় তাঁর সাকরেদদের সঙ্গে থাকেন। তা ছাড়া শহরে যথেষ্ট যাতায়াত থাকলেও সহরটা ঠিক অটবীর নিজস্ব এলাকা নয়। একটা সাংঘাতিক কাজ করবে বলে মনস্থির করে অটবী এমনভাবে কাজে হাত দেবে না যাতে কাজটা ভেস্তে যেতে পারে।

কাজেই দিন যেতে লাগল, আর অটবীর সঙ্কল্পও ক্রমশঃ ফিকে হয়ে এল। শেষটায় অটবী ভাবতে সুরু করেছিল, আর কিছু করা যায় কিনা। এমন সময় আজকে নায়েবমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। নায়েবমশাইকে দেখেই তার মনে কোন অসদভিপ্রায় জাগে নি। তাঁর কাছে এসেছিল শুধু মানুষটাকে একটু বিরক্ত করতে। কিন্তু তারপরেই তার মনে হল, হত্যার পাত্র হিসাবে নায়েবমশাইয়ের চেয়ে উপযুক্ত আর কেউ নয়। বড়বাবু তো মানুষ নামেরও যোগ্য নয়; জমিদার হবার সম্ভাবনা আছে বলে এবং নায়েবমশাইয়ের বুদ্ধি পিছনে রয়েছে বলেই না তাঁর এত তেজ। আজ যদি জানা যায় সে জমিদার হবে না তো কাল তার অবস্থা রাস্তায় যে জুতো সেলাই করে বেড়ায় তার চেয়েও খারাপ হয়ে পড়বে। কারণ জুতো সেলাই-এর কাজটাও সে নিরেট মূর্খটা জানে না। জমিদার অবিশ্যি তাঁর জমিদারির মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক, কিন্তু তিনিও একেবারে হাত-পা ভাঙা ঠুটো জগন্নাথ হয়ে থাকতেন যদি না এই শকুনী নায়েবটা তাঁর সঙ্গে থাকত। কাজেই জমিদার যে এতবড় একজন জমিদার, বড়বাবু যে একজন গুণ্ডাদলের সর্দার, সে শুধু এই নায়েবটির বুদ্ধি পরামর্শের জোরে। যত লোক ঠকানোর পরামর্শ, যত প্রজা ঠ্যাঙানোর বন্দোবস্ত, সমস্তই চলে এই নায়েবটির একার পরামর্শে। আকাশে আছেন ভগমান; আর পৃথিবীতে আছে এই শয়তানের অবতার নায়েব; এদের সমতুল্য তৃতীয় আর কেউ নেই।

এই নায়েবকেই অটবী হত্যা করবে। আজকে যদি সে এই ক্ষুদ্র-দেহ,

কুৎসিৎ খালি-গা নায়েবটিকে যমের বাড়ী পাঠাতে পারে তবে কালকেই, ইঞ্জিনটা বিগ্‌ড়িয়ে দিলে কেমন প্রকাণ্ড রেল গাড়ীটা বন্ধ হয়ে যায়, হৃৎপিণ্ডটা ফাটিয়ে দিলে যেমন মস্ত মানুষটার ভবলীলা শেষ হয়ে যায়, তেমনি করে জমিদারের নিকট জমিদারী হঠাৎ যেন ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে পড়বে খান খান হয়ে। আর আশ-পাশের আর যত জমিদার আর ধনী লোকেরা আছে তারা সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসবে, এ কী হল! চারদিকে মানুষগুলো যখন হতভম্ব হয়ে 'হায় হায়' করতে থাকবে তখন তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অটবী, একা অটবী, মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকবে। এ আনন্দটুকুই অটবীর পক্ষে যথেষ্ট ; এর চেয়ে বেশী সে আর কিছু চায় না। তারপরে যা হয় হোক। তার জন্য সে মাথাও ঘামাবে না এবং তখন কৃতকর্মের জন্য সে কোন আপশোষও করবে না।

সুমন্তবাবুর গলাটা হঠাৎ যেন রবার টানলে যেমন হয় তেমনি করে অনেকখানি বেড়ে গেল, আর তাঁর চোখ দুটো ঠেলে অনেকখানি উঠে গেল কপালের দিকে। ঠিক সেই সময়টায় দুটো লোক রাস্তা দিয়ে হেটে চলে গেল হাটের দিকে। একবার তাকিয়েও দেখল তাদের দিকে ; তবু কোন অস্বাভাবিক কিছু তারা টের পেল না। না, পৃথিবীতে সব চেয়ে সহজ আর স্বাভাবিক ঘটনা যে নরহত্যা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নায়েবমশাইকে ছেড়ে দিয়ে অটবী হাটতে হাটতে হাটের মধ্যে এল। এক জায়গায় শব্জীর বাজারে লোকের খুব ভীড় জমেছে। অটবী তাদের পাশে গিয়ে বেশ জোরে জোরে বলল, 'একটা লোক যে খুন হয়েছে গো। এস্‌তে এস্‌তে দেখে এলাম। ঐ হোথা গাছ তলায় পড়ে আছে।'

সবাই কান বাড়িয়ে শুনল ; কিন্তু কেউ বিশেষ গা করল না। দু একজন জিজ্ঞেস করল, 'কে খুন হয়েছে চিনতে পারলে?'

'না। কাছে তো যাইনিকো। দূর থে' চেনা বলে মনে হলনি।'

শুনে সকলেই নিশ্চিন্ত হয়ে যার যার কাজে মন দিল। সবাই সেখানে কাজের লোক। কে না কে মরেছে তার জন্য উৎসাহ দেখানোর মত সময় নেই কারও। কিন্তু উত্তেজক কোন কিছুর কথা শুনলেই সব জায়গাতেই একদল লোক

জোটে যারা হুজুগের লোভে ছুটতে আরম্ভ করে। অটবীও আর দু'এক জায়গায় কথাটা বলতে না বলতেই একদল লোক ছুটল তার নির্দেশিত জায়গায় ব্যাপারটার মধ্যে মজার কিছু আছে কিনা দেখতে। তারা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে পথচারীও দু'চার জন জমেছে। সবাই মৃতদেহটার থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে জল্পনা কল্পনায় ব্যস্ত। লোকের দৌড়াদৌড়িতে হুজুগ বাড়তে লাগল। খানিকক্ষণের মধ্যে দেখা গেল প্রায় গোটা হাটের লোকই সেখানে এসে জড়ো হয়েছে।

কেউ কেউ চিনতেও পারল যে লোকটা কাঞ্চন রায়ের নায়েব। একজন বলল, 'যা বেহদ্দ শয়তান ছিল নোকটা! এমন লোক বেঘোরেই মরে।'

আর একজন তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'নোকটা মরে গেছে,—তবু তাকে তোরা নিন্দে করতে ছাড়িস্‌নি? তোরা কী রে?'

খানিক পরে অটবীও ঘুরতে ঘুরতে এসে সেই জায়গায় উপস্থিত। তখন খুব ভীড় জমেছে। অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে দুটি পুলিশও দাঁড়িয়ে আছে ভীড়ের মধ্যে। একজন তার নোট বইতে কী যেন লিখছে। অটবী তাদের কাছে গিয়ে বলল, 'ভেঁইড়ে আছ কেন সিপাইজী? খোঁজ ভাল করে—খুনী হয়তো এই ভীড়ের মধ্যেই আছে।'

একটা দুর্বোধ্য স্বদেশীয় গাল উচ্চারণ করে সিপাইজী বলল, 'আছে তো রহনে দাও না বাপ। ঝামেলা করবে তো তোমাকে ভি নিয়ে হাজতে পুরব হারামজাদ্‌।'

একটু থেমে সিপাইটি নিজেই গজ্‌গজ্‌ করে অনেক কথা বলে গেল। তাদের কাজ হাটের শান্তিরক্ষা করা, খুনের তদারক করা নয়। হাটে চোরাই আফিং এলে তারা তার খবরদারী করতে বাধ্য। তাতে দু'চার পয়সা লাফা হয়। হাটের কাছেই খুনটা হয়েছে বলে তারা এখন একটা বাড়তি দায়ের মধ্যে পড়ে গেল না কি? এক পয়সা লাভের আশা নেই, অথচ ঘটনাটার রিপোর্ট দেওয়া, মৃতদেহ মর্গে পাঠানো ইত্যাদি সাতশো ঝামেলা তাদের ঘাড়ে এসে চাপল। এতে কারো মেজাজ ঠিক থাকে? শালা বেঁচে থাকতে নিশ্চয়

খুব খারাপ আদমী ছিল,—না হলে এত ভাল ভাল জায়গা থাকতে শেষটায় এই হাটের কাছে এসে খুন হয়ে পড়ে থাকে ?

গ্রামে এসে খবরটা বলতেই তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত আলোচনার বৈঠক বসে গেল।

যজ্ঞেশ্বর বলল, 'আহা, নোকটা শেষে এমন বেঘোরে মরে গেল ? নোকটা খুব পাজী ছিল। তবু একবারে খুন হয়ে যাওয়াটা ঠিক হলনি বাবা।'

যেন. খুন হয়ে মরা আর অন্যভাবে মরা, নায়েব ইচ্ছে করলেই এর যে-কোন একটা পছন্দ করে নিতে পারত।

বলরাম বলল, 'মোকে য্যাখন অন্যায়ভাবে মারলে, ত্যাখনই জানতুম ওর একটা শাস্তি হবে। একবারে খুন হবে তা ভাবিনিকো। এ তো একরকম অপঘাতে মিত্যু হল,—ওর আত্মার তো সদ্‌গতি হবেনি।'

নিতাইয়ের সঙ্গে নায়েবের কিছুটা সদ্‌ভাব ছিল ; তবু দেখা গেল নায়েবের মৃত্যুতে সে বেশ উৎসাহিত।

'তা যা বল বলাদা,—নোকটা মরেছে না হাড় জুইড়েছে !'

প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে আলোচনা চলল প্রসঙ্গটা নিয়ে। অটবীও মাঝে মাঝে দু' একটা ফোড়ন দিচ্ছিল আলোচনায়। নিজেকে একটা প্রকাণ্ড বীর বলে মনে হচ্ছিল অটবীর। গ্রামের লোকদের মধ্যে এতখানি উত্তেজনা যে সঞ্চার হয়েছে তাব কারণ তার অত্যাশ্চর্য কাজ। সোজা কথা কি ? অনেক দিন পরে অটবী নিজের প্রতি একটু সন্তুষ্ট বোধ করল।

সংবাদটা নিয়ে সেই রাত্রেই জমিদার বাড়ী যাওয়া উচিত কিনা তা নিয়েও আলোচনা হল। অনেক গুরুতর ব্যাপারের সময় রাত্রিতেও তারা জমিদারের বাড়ীতে যায়। কিন্তু আজকে এত বড় একটা ঘটনার জন্যও কেউ অতদূর অবধি যাওয়ার কোন উৎসাহ বোধ করল না। জমিদার তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না,—কাল সকালে গেলেই অনায়াসে চলবে !

পরদিন সকাল-বেলা দেখা গেল প্রত্যেকেরই যার যার কাজ আছে। জমিদারের কাছে নায়েবের জন্য দুঃখ জানাতে গেলে জমিদার তো আর পেট ভরিয়ে দেবে না ! কাজেই শেষপর্যন্ত একমাত্র সুধন্য গেল জমিদারের কাছে গাঁয়ের প্রতিনিধি হয়ে।

পরবর্তী তিন চারটে দিন অটবীর দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল। প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার সময় সে ভাবে, বাইরে তাকিয়েই দেখতে পাবে তার বাড়ীর চারদিক লাল-পাগড়ীতে ছেয়ে গেছে। তাদের সারা গাঁ পুলিশে পুলিশময়। শুধু তাদের গাঁ-ই নয়, এমনি আরও অনেক গাঁ পুলিশে চষে বেড়াচ্ছে খুনীর সন্ধানে।

কি করে কে জানে, কিন্তু পুলিশের দল খুনীকে খুঁজে বের করবেই। তুমি সাধু হও, ভিখিরীর পোষাক পর, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াও, তবু পুলিশ ঠিক তোমার সন্ধান পাবে। অটবীকেও অবশ্যই পুলিশেরা দেখলেই খুনী বলে চিনতে পারবে। তখন তারা তার হাতে হাত-কড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে রাস্তা দিয়ে হাটিয়ে। কী ভয়টাই যে তখন করবে অটবীর!

তা করুক। কিন্তু তাই বলে সে তার মুখখানাকে শুকিয়ে যেতে দেবে না। সারাটা পথ একবারও সে মাটীর দিকে চোখ নামাবে না। মাথা উঁচু করে হাসতে হাসতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে সে পথ চলবে। গড়িয়া শহরের রাস্তা দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার ভদ্রলোকের দল সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ভীত বিস্মিত চোখে খুনীর দিকে তাকিয়ে থাকবে। দারুণ ভয়ের মধ্যেও সে দৃশ্যটা দেখতে কী ভালই যে লাগবে অটবীর! ওরা দেখবে আর বুঝবে যে পাখীর পালকের তৈরী বিছানার মধ্যেও বিষ-লাগানো কাঁটা লুকিয়ে থাকে।

কিন্তু অটবীকে দারুণভাবে নীরাশ করে কয়েকটা সকাল পরপর পার হয়ে গেল; কোন দুর্ঘটনাই ঘটল না। পুলিশ তো এলোই না, এমন-কি আশ-পাশের জীবন-যাত্রাতেও এতটুকু উনিশ-বিশ পরিবর্তনও দেখা গেল না। না হল সূর্যের রঙ্ একটু গাঢ়, না হল আকাশের রঙ্ একটু ফিঁকে।

এমন-কি গাঁয়ের লোকদের কাছে পর্যন্ত ঘটনাটা দু' একদিনের মধ্যে বাসি হয়ে এল। নায়েব-হত্যার প্রসঙ্গটা আলোচলার মধ্যে উঠলেও, অল্প পরেই অন্য কথা উঠে পড়ায় সেটা চাপা পড়ে যায়। এত বড় একটা উত্তেজক ঘটনা ফেলে রেখে গাঁয়ের লোকেরা এখনো সেই সব চিরকালের বস্তা-পচা একঘেঁয়ে কথাগুলো নিয়ে অনায়াসে সময় কাটাচ্ছে! সেই বাজারের দুরবস্থার কথা;

সেই কোন্ ভেড়ীওলাটা ভালো, তাড়াতাড়ি টাকা-কড়ি মিটিয়ে দেয় ;আর কোন্ ভেড়ীওলাটা খারাপ, টাকা শোধের ব্যাপারে নানা টাল বাহানা করে; সেই কোন্ বৌটা রোজ রাত্রে গড়িয়া যায় বাড়তি রোজগারের জন্য, স্বামীটা জেনেও কিছু বলে না, ইত্যাদি ইত্যাদি ! এ লোকগুলোর মন একেবারেই মরে গেছে ; —না হলে কোন্ খবরটা গুরুতর আর কোন্ খবরটা মামুলী তাও এরা বোঝে না

জমিদারের জীবনেও তেমন-কিছু ইতর-বিশেষের সংবাদ না পাওয়ায় অটবী আরও মন-মড়া হয়ে গেল। শেষটায় অধৈর্য হয়ে অটবী একদিন নিজেই গেল জমিদারের কাছারীতে।

কাছারীতে বিশেষ ভীড় ছিল না। জমিদার কী একটা কাগজ দেখছিলেন ; চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি মনে করে অটবী ?'

'আজ্ঞে, কিছু লয়, কত্তাবাবু। এমনি এলাম খোঁজ-টোজ নিতে। নায়েব মশা'র এমন অপঘাতে মিত্যু হল ! বড় ভাল নোক ছিলেন।'

'মানুষ তো অমর নয়।'

বলে জমিদার আবার তাঁর কাগজের দিকে মন দিলেন। পরে বললেন, 'তোমার কাছে আরও গোটা কতক টাকা পাওনা আছে অটবী।'

'আজ্ঞে দিয়ে দোবখুনি। আচ্ছা কত্তাবাবু, খুনীটাকে ধরার জন্য কিছু চেষ্টা চরিত্তির কত্তেছেন না ? অমন মুনিষটা খুন হয়ে গেল !'

'আমি আবার কী করতে যাব ? সে পুলিশের কাজ, পুলিশে কোরছে। নায়েব খুন হয়েছে বলে জমিদারী ফেলে রেখে আমি তো আর খুনীর পিছনে ছুটে বেড়াতে পারি না।'

'তা তো ঠিকই বাবু। তবে নায়েবমশা' আপনার ডান হাত ছেল, তাই ভাবতেছিলাম, খুনীটাকে আপনি কক্ষনো ছেড়ে দেবেননি।'

জমিদার উদারভাবে হেসে বললেন, 'ডানহাত বাঁ-হাত সবই পয়সার ব্যাপার বাবা। ভাত ছড়ালে কি কাগের অভাব হয় ? ব্যাটা বুড়ো হাড়,—দেড়শো করে নিত, তা-ও কত গাঁই-গুঁই ! আর দ্যাখ্ তো এই নতুন নায়েবকে, বি-এ পাশ, অভিজ্ঞ, জুয়োন বয়স। পঁচাত্তর টাকা দোব, তাইতেই খুশী ! খুনী —সে ধরা পড়বেই। ভগবানের কাজ ভগবান করবেন।'

বুড়ো হাড়ের বদলে কচি হাড় পেয়ে জমিদারকে তো বেশ খুশীই দেখা যাচ্ছে! শত হলেও কাঁচা হাড় চিবুতে স্থবিধে, চিবুলে রসও বেশী পাওয়া যায়। অটবী ভেবেছিল, নায়েবের মৃত্যুতে জমিদারী ছত্রখান হয়ে যাবে! অথচ জমিদারীতে কোথাও যে এতটুকু ফাটল ধরেছে, এমন তো দেখে-শুনে বোধ হচ্ছে না!

সেখান থেকে বেরিয়ে অটবী হাটতে হাটতে এল কশবার মাছের আড়তে। বেলা তখন অনেক হয়েছে। মাছের নিলাম-বিক্রি কখন শেষ হয়ে গিয়েছে! তবু এখনো আড়তের লোকেরা হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি নানা কাজে ব্যস্ত। অটবী দেখল, কালাচাঁদবাবু তাঁর নতুন আড়তে গদিয়ান হয়ে বসে আছেন। একটা নড়বড়ে প্যাকিং বাক্সের কাঠে-তৈরী চৌকীর উপর বসে দু' জন কর্মচারী স্তূপাকার খুচ্‌রো পয়সা-কড়ি গুণে গুণে থাক থাক করে সাজিয়ে রাখছিল। আর কালাচাঁদবাবু গরমের জন্য গেঞ্জীটা বুকের উপরে ঠেলে তুলে দিয়ে আদুল ভুঁড়িটাকে হাওয়া খাওয়াতে খাওয়াতে তাই দেখছেন। পরনের ধুতিটাও একেবারে উরু অবধি তুলে নিয়েছেন। থল্‌থলে উরু জোড়াও আসলে ছোটখাটো এক একটা ভুঁড়ি! কালাচাঁদবাবুর চোখদুটো টাকার দিকে আর তিনি কথা বলছেন পাশেই একটি ভাঙা টিনের চেয়ারে বসা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। এঁকেও অটবী চেনে,—একজন ভেড়ীওয়ালা।

ভদ্রলোক বলছিলেন, 'তা হলে কালকে রথের দিনে বেণী মাছ পাঠাতে নষেধ কোরছেন?'

কালাচাঁদবাবু জবাবে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যা। এতকাল ধরে দেখছি তো, পরব-টরব পড়লেই চার ধার থেকে মাছের আমদানী হয় আর মাছের দাম যায় পড়ে। পাইকাররা অবিশ্যি লাভ করে ভাল।'

এমন সময় কালাচাঁদবাবুর চোখ গিয়ে পড়ল অটবীর উপর।

'আরে অটবী যে? তারপর তোদের জমিদারের নায়েবটা তো টেঁসে গেল! যাক্। তবে খুনী-টুনীগুলোও এক আধটা ভাল কাজ করে, কী বালস্?'

পরীকে লুট করার ব্যাপারে এই কালাচাঁদবাবুও ছিলেন। এখন কথা

বলছেন যেন পরম অন্তরঙ্গ লোক! মনের ভাব গোপন করে অটবী মুখখানাকে যথাসাধ্য করুণ করে বলল, 'আজ্ঞে বাবু, নায়েবমশা' খুন হওয়াতে মোদের জমিদারের জমিদারীটা একবারে কানা হয়ে গেল।'

ভদ্রলোকটি এবার কালাচাঁদবাবুকে বললেন, 'খুন? কোন্ নায়েব খুন হল গো মশাই?'

'শোনেননি? কাঞ্চন রায়ের নায়েবটা খুন হয়েছে গড়ে'র হাটের ধারে। বাঁচা গেছে। কাঞ্চন রায়টা যেমন এক ছুঁচো, তেমনি ঐ নায়েবটাও ছিল ছুঁচোর ঘাড়ের বিচ্ছু। এত বজ্জাতি বুদ্ধিও জানত হারামজাদা! এই কাঞ্চন রায় আমার দু'বিঘা জমি গায়েব করে বসে আছে। মাম্‌লাটা ঝুলছে। দেখি নায়েবটা সরে পড়ায় এবার যদি কিছু সুবিধে হয়!'

সবটা খবর শুনে ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হয়ে শুধু বললেন, 'ও'। যেন এই ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর যেটুকু কৌতূহল জেগেছিল তা ষোল-আনা নিবৃত্তি হয়ে গেল!

অটবী বলল, 'কিন্তুক কী সাংঘেতিক কাণ্ডটা হল বলুন দিনি বাবু! জলজ্যান্ত মুনিষটা খুন হয়ে গেল।—এর যদি পিতিকার না হয় তবে দুষ্টু নোকের আস্পধ্বা আরও বেড়ে যাবেনি?'

কালাচাঁদবাবু হেসে বললেন, 'আরে বোকা! ও ব্যাটা মহা ধড়িবাজ লোক ছিল; উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে গেল। আবার যে খুন করেছে, সে-ও একদিন শাস্তি পাবে। সেজন্য ভাবিস্‌নি। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।'

হ্যাঁ, তা তো বটেই! আর সেই জন্যই ধর্ম-চূড়ামণি তোর যে অক্ষয় স্বর্গবাস হবে তার আর ভুল নেই! তবে সে স্বর্গটা উপরের দিকে নয়, নিচের দিকে, তা মনে রাখিস্।

দিন যেতে লাগল আর অটবীর মন যেন একটা অতল গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগল। এমনটা যে ঘটবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। নায়েবটাকে তারা চিরদিন একটা সাংঘাতিক শক্তিশালী লোক বলে মনে করে এসেছে; জমিদারীকে ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতে সে ছিল যেন পাকা বাঁশের খুঁটি! অথচ এত বড় একটা প্রতাপশালী লোকের মৃত্যুতে কারও

এতটুকু ক্ষতি তো হলই না, কেউ এতটুকু দুঃখ পর্যন্ত বোধ করল না! জমিদারের দুটো পয়সা আয় বাড়ানোর জন্য লোকটা তার সমস্ত সময়, সমস্ত উদ্যম আর বুদ্ধি ব্যয় করেছে ; অথচ পঁচাত্তর টাকা খরচ বেঁচে যাচ্ছে বলে জমিদার যেন তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন। আশ্চর্য! মানুষ কি এত অকৃতজ্ঞ! তেম্নি মহাজন বড় কারবারীরা এত বড় একটা ঘটনায় এতটুকু ভয় তো পেলই না, বরং অটবীর অনেক সময় মনে হয়েছে তারা যেন বেশ আরামই বোধ করেছে। মানুষের এমন-কি অপঘাত-মৃত্যুও কি তবে মানুষের কাছে স্বস্তির কারণ?

আস্তে আস্তে অটবীর বুদ্ধির গোড়ায় যেন একটু একটু করে জল যাচ্ছে। সত্যি, নায়েবকে খুন করাটা একটা নেহাৎ ই ছেলেমানুষীর কাজ হয়েছে। একটা সামান্য কর্মচারীকে খুন করে সে কিনা আশা করেছিল এত বড় জমিদার-মহাজন-কারবারীদের দুর্গে সে শৃঙ্খলা আর ত্রাস সৃষ্টি করবে! এদের দুর্গটাকে এত খেলো বলে তার মনে না করাই উচিত ছিল। নায়েব তো কোন্ ছাড়, স্বয়ং জমিদারও যদি মারা যায় বা খুন হয়, তাতেই কি তার জমিদারী ভেঙে পড়বে? না তাতে কোন ফাটল ধরবে? বড়বাবু না হয় বয়ে গিয়েছে ; কিন্তু মেজবাবু তো জমিদারীর কাজ শিখ্ছে। কর্তাবাবু না থাকলে সেই-ই অনায়াসে জমিদারীর কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। নাবালক ছেলে রেখে বা অপুত্রক অবস্থায় কত তো জমিদার মারা যায়! তাদের জমিদারী কি আর তাই বলে ভেসে যায়? সরকারের কোর্ট অব্ ওআর্ডস্ আছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তাছাড়া জমিদারী ভেঙে গেলেই কি? ভেঙে যাওয়া মানে তো হাত বদল হওয়া!

এই জমিদার মহাজনদের জগৎ-টা একটা মহাশক্তিশালী জোট। হিমালয় পর্বতের মতই এতই শক্তিশালী তার প্রাচীর যে দু'চার শো অটবী সেখানে মাথা কুটলে, তাদের মাথা ফেটে যাবে বটে, কিন্তু প্রাচীরের কিছু হবে না।

অথচ সে, বোকা অটবী, সে ভেবেছিল কিনা সামান্য একটা কর্মচারীকে খুন করে সে এই প্রাচীরের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করবে! আসলে তার ভুল হয়েছিল এই জন্য যে তারা মানুষগুলোকে আলাদা আলাদা করে ভাবতে অভ্যস্ত।

জমিদার মহাজন বলতে তারা অমুক, অমুক, অমুককে আর অমুককে বোঝে। কিন্তু জমিদার মহাজন বলতে শুধু দু'চার জন চেনা-জানা ধনীকেই বোঝায় না; তারা ছাড়া আরও যে অনেক অনেক অজানা অচেনা দূরদশেবাসী জমিদার-মহাজনেরা আছে, তাদেরও বোঝায়। ও'র এই যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ বাইরে থেকে এদের আলাদা আলাদা বলে মনে হয় বটে, এদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি, খেওখেয়িরও অভাব নেই; তবু এদের মধ্যে একটা অদৃশ্য যোগ-সূত্র আছে। সেইজন্যই ওদের এত শক্তি। ওদের দু'চার দশ জনকে মেরে ফেললেও কিছুই আসে যায় না। বোকা অটবী এত ব্যাপার তলিয়ে বোঝেনি বলেই সে ভাবতে পেরেছিল একজন সুমন্তবাবুকে সরিয়ে দিয়ে সে যেন একটা মস্ত কাজ করেছে।

দিন কয়েক আগে নিরঞ্জনবাবুও তার দল-বলের সাহায্যে গোটা কয়েক জমিদার মহাজনকে সরিয়ে দিয়েছে সোনারপুরে, খবরটা শুনে আর পাঁচজনের মত সে-ও রোমাঞ্চিত হয়েছিল। অটবী এখন কথাটা ভেবে হাসল মনে মনে। এই নিরঞ্জনবাবু এবং তার দলের লোকেরা আসলে তারই মত নিরেট বোকা সামান্য দু'চার জন মানুষকে সরিয়ে দিয়ে তারাও ভাবছে এই বিরাট জমিদার মহাজনের দুর্গটা বুঝি উড়েই গেল? ছোঃ!

নিরঞ্জনবাবুর প্রতি একটুখানি ঈর্ষাবোধ হয় তবু। তাঁর কাজের কথাটা দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে, এমন-কি ধনী লোকেরাও একটু চিন্তিত হয়েছে। সর্বত্র বেশ একটু নাড়াচাড়া পড়েছে। সে-ও তো সেই একই কাজ করেছে। সে তো আর একটা লোককে সরিয়ে দিয়ে আশা করেনি যে যত ধনীরা সব যার যার ঘরে মরে পড়ে থাকবে! একটু নাড়াচাড়া পড়বে এইটুকুই সে ও চেয়েছিল। অথচ নিরঞ্জনবাবুর কাজটাকে লোকে যতখানি গুরুত্ব দিয়েছে তার কাজটাকে তেমনি তারা তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিয়েছে। না, সে নিরঞ্জন-বাবুর চেয়ও অক্ষম অপদার্থ আর বোকা। লোকের মুখে মুখে নিরঞ্জনবাবুর নাম ছড়িয়ে পড়ছে; আর সে নিজের মুখেও বলতে পারবে না সে কী করেছে।

আর অটবী যতই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল, ততই জমিদার মহাজনদের

জগৎটার শক্তির পরিমাণ যেন তার চোখের সামনে সমস্ত কূল-কিনারা ছাড়িয়ে যেতে লাগল। একটা বিরাট আকাশের সমান উঁচু দৈত্যের সামনে সে যেন একটা পিঁপড়ে, হয়তো তার চেয়েও ছোট, যাকে ভাগবত কাকা বলে কীটস্য কীট। আর, নিজেকে অটবীর যতই ছোট, তুচ্ছ, দুর্বল বলে বোধ হতে লাগল, ততই সেই বিরাট দানবের বিরুদ্ধে তার অক্ষম রাগ আর ঘৃণা তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। জীবনের সব-কিছু গ্লানি আর দুঃখের জন্য সে ওদের দায়ী করল। ওদের সব কাজ চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সব কিছুর পিছনেই যে ওরা আছে এ বিষয়ে অটবীর মনে কোন সন্দেহ নেই। সুভদ্রাদের আর পরীদের যখন তারা ছিনিয়ে নিয়ে যায়, সেটা চোখে পড়ে। রাধারা যখন ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়; নিধুদের আর গোপাদের মধ্যে যখন ভুল বোঝা-বুঝির দরুণ বিচ্ছেদ ঘনিয়ে আসে, বলরামদের আর অটবীদের মধ্যে যখন হিংসা দ্বেষ দলাদলি সুরু হয়,—তখন ওদের কারসাজিটা চোখে দেখা না গেলেও এই কারসাজিটাই গরীবদের জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। না হলে গরীবেরা বোকা, মূর্খ হতে পারে, কিন্তু বজ্জাত নয়।

এই বিরাট দৈত্যটার বিরুদ্ধে একটা আঘাত দিয়েই অটবী যেন আজ চুপ্‌সে গিয়েছে। তার আর কিছু যেন করার ক্ষমতা নেই। আর কী যে করা যায় তা তার জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। তবে অটবী এখন কী করবে? সে কী আবার তার স্যাঁৎসেঁতে নোংরা ভাঙা ঘরটাতে ফিরে যাবে? যে-ঘর থেকে রাধা চলে গিয়েছে, যে ঘর হতে পরী ফিরে গিয়েছে, সেই ঘরে? আবার কি সে যাদের নীচ, স্বার্থপর আর লোভী বলে জানে সেই কারবারীদের পায়ে পায়ে নাক ঘষ্‌বে কাজের জন্য আর মজুরীর জন্য? না, সেই জীবনটায় আর অটবী ফিরে যেতে পারবে না.—অসম্ভব। কিন্তু অটবী তবে এখন কী করবে?

ফিরে-রথের দিন তাদের গোঁসাই এলেন গাঁয়ে এই গোঁসাই-এর কাছেই বলরাম এবং আরও কেউ কেউ মন্ত্র নিয়েছে; অন্যেরাও মন্ত্র নেওয়ার দরকার হলে তাঁর থেকেই নেবে। মানুষটার রঙ্‌টা কালো; কিন্তু সদাহাস্যময় মুখখানায় কেমন একটা প্রশান্তি লেগে আছে।

গোঁসাই-এর সম্মানার্থে রাত্রি বেলায় কীর্তণের আয়োজন করা হল।

গোঁসাই নিজেই ভাল গান গাইতে পারেন ; তিনিই মূল গায়েন হবেন।

কীর্তণ আরম্ভের আগে তুলসীর মালার উপর দিয়ে শাদা ফুলের মালা গলায় জড়িয়ে মুখে চন্দনের ফোঁটা একে গোঁসাই যখন আসরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে প্রণাম করার হিড়িক পড়ে গেল। সকলের সঙ্গে অটবীও নীরবে গিয়ে প্রণাম করল। সকলের বেলায় যেমন, অটবীর বেলায় গোঁসাই কিন্তু শুধু নীরব হাস্যে প্রণাম গ্রহণ করলেন না, বললেন, 'তুই কেরে ?'

অটবী নাম বলল।

'তোর মুখে বৈরাগ্যের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। তোর তো সাধন-ভজন হবে বলে মনে হচ্ছে রে ? চল্ না আমার সঙ্গে,—আমি যে আশ্রম করেছি।'

শুনে তৎক্ষণাৎ বলরাম অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, 'তাই যাও না গো অটবী ?—গোঁসাই অত্যন্ত ভাল কথা বলতেছেন। তোমার তো ঘর সমসার সব ভেসেই গেল। অন্ততক দিন কতক গোঁসাই-এর আশ্চয়ে থেকে এসোগে। এত মন-মরা হয়ে আছ, মনটা ভাল হবে।'

অটবী শুধু হাসল করুণভাবে।

কিন্তু অটবী কিছু না বললেও গোঁসাই কাকদ্বীপ হযে কি ভাবে তাঁর আশ্রমে যেতে হবে বুঝিয়ে দিলেন। তাতেও খুশী না হয়ে, এক টুক্‌রো কাগজে ঠিকানাটা লিখে অটবীর হাতে দিলেন।

বলরামকে হাত ধরে আসর থেকে বার করে নিয়ে এল অটবী।

'বলাদা, অমন কথা তুমি বলতে গেলে কেন গোঁসাইয়ের ঠেয় ?

বলরাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন গো ? খারাপ কথা বলিচি কিছু ? তোর ভালর লেগেই তো বললাম।'

'না, ওর'ম কথা আর কখনো বলতে পারবে নি। অত উব্‌গারে মোর কোন দরকার নেইকো।'

'মোকে বন্ধু বলে মানিস্, তাই বললাম। এত মন মরা হয়ে আছিস্। ভাবলাম, গোঁসাই-এর থানে গেলে মনটা তোর ভাল হবে।'

অটবী চেঁচিয়ে বলল, 'না, বন্ধু-টন্ধু মোর কেউ নেই। মোকে অত

উবগার তোমরা কেউ করতে এস্‌বেনি। গোঁসাই-এর থানে আমি যাবনি, কক্ষণো-না।'

অটবী উত্তরের অপেক্ষা না করে চলে গেল। বলরাম অবাক হয়ে তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা কি পাগল হয়ে গেল নাকি?

গোঁসাই চলে গেলেন পরদিন। আর তার পরদিনই অটবী বেলা এগারোটার ডায়মণ্ডহারবারগামী গাড়ীতে চড়ে বসল। উদ্দেশ্য, গোঁসাই-এর থানেই একবার গিয়ে দেখবে কেমন লাগে।

ষোল

একটু সুস্থ হওয়ার পর বলরামকে শেষপর্যন্ত কিষ্টবাবুর ভেড়ীতেই কাজ নিতে হল।

প্রথমে দিন কতক গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে জনমজুরী খেটে দেখেছিল। দেখল যে রোজ রোজ অত কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়ানোর মত উৎসাহ তার আর নেই। তারপর বেরুলো চাকরির চেষ্টায়। কাছাকাছি জানা-শুনা ভেড়ী-গুলোতে খুঁজে দেখল আপাতত কোথাও লোক নেবে না। তখন গিয়ে ধরল গাঁয়ের মোড়ল সুধন্যকে; সুধন্য তাকে নিয়ে গেল নিধিরাম বাগ আর মুখুজ্জে বাবুর কাছে। যেতে যেতে সুধন্য গল্প বলল যে নিধিরাম নাকি কোলকাতা থেকে ক্যানিং পর্যন্ত একটা মোটর যাওয়া-আসার রাস্তা করবে, কারণ কোন্ সাহেব নাকি তাকে মিনি পয়সায় একটা মোটর গাড়ী সম্মানী দিতে চেয়েছে। আরও বলল, নিধিরাম নাকি ছোটলাটের কাছে বাংলাদেশটা কিনে নিতে চেয়েছিল; ইংরেজরা ভয়ে রাজী হয়নি।

কিন্তু নিধিরামের কাছে যেতেই তিনি বললেন, তাঁর নাকি লোকসান যাচ্ছে কারবারে। নতুন লোক না নিয়ে তিনি এখন পুরোণোদের ছাঁটাই করতে পারলে বাঁচেন।

তারপর তারা গিয়েছিল মুখুজ্জেবাবুদের বাড়ী। পথে সুধন্য মুখুজ্জেবাবুর পরিচয় দিল। একবার নাকি কোলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জ আসবার সময় তাকে থাকতে দেওয়ার বাড়ী খুঁজে খুঁজে সাহেবরা হয়রাণ হয়ে গেল। শেষে তাঁকে জায়গা দেওয়া হল মুখুজ্জেদের বাড়ীতে। তা তাঁকে মুকুট খুলে বাড়ীতে ঢুকতে হয়েছিল আর মুরগী মটন খাওয়া বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

মুখুজ্জেবাবুর কাছে চাকরির কথা বলতেই তিনি রেগে আগুন হলেন। সুধন্যর এতবড় ধৃষ্টতার জন্য তিনি যা-তা বলে গাল দিলেন এবং দরোয়ান লেলিয়ে দিলেন।

তারপরই কিষ্টবাবুর কাছে কাজ নিতে হল বলরামকে। অবিশ্যি সুধন্যই

কথাবার্তা ঠিক-ঠাক করে দিয়েছিল। না হলে নিজে সেধে সে কখনো যেতে পারত না কিষ্টবাবুর কাছে। কিষ্টবাবুর কথা কি তারা কোনদিন ভুলতে পারবে? তারাই তাকে কারবারে বসিয়েছিল, আর তাদেরই চোর অপবাদ দিয়ে সে তাড়িয়ে দিয়েছিল! বাধ্য হয়ে তার দ্বারস্থ হয়ে অপমানে মাথা কাটা গেল বলরামের।

কাজটা দিতে গিয়ে কিষ্টবাবু কথা অনেক শোনালেন।

'চুরি-টুরি করবি না তো আবার? সেই ভয়েই তো তোকে কাজ দেওয়া। তবু যদি মোর নুন খেলে মনে ধরমভাব জাগে!'

যে-লোকটাকে মানুষ বলেই গণ্য করে না বলরাম, তার এত বড় অন্যায় অভিযোগ শুনে বলরাম লজ্জিতভাবে হেসে দাঁত দিয়ে জিভ্ কাটল।

'কোন ভয় নেই বাবু। সেদিগে নিশ্চিন্তি থাকুন।

'কথা-টথা শুন্‌বি তো?'

'যদি না শুনি তো দু'ঘা জুতো মেরে দেবেন বাবু।'

'মনে থাকে যেন। তোদের আমি বিশ্বাস একটু কমই করি। চোখে চোখে রাখব; দোষ দেখেছি কি ঘাড় ধরে বের করে দেব।'

এত বড় অপমানের কথা শুনেও বলরাম কৃতার্থের হাসি হাসল। কেষ্টবাবু ভাবলেন, এ-সব লোকের আবার মান-অপমান? জুতো সামনে না ধরে থাকলে এদের দিয়ে কাজ করানো যায়?

মাইনে ধার্য হল পঁচিশ টাকা। সাত বছর আগে এই ভেড়ীতেই বলরাম তিরিশ টাকা মাইনেয় ঢুকেছিল। এতদিনের অভিজ্ঞতার ফলে, এ-অঞ্চলে একটা পাকা কাজের লোক বলে সুনাম হওয়ার ফলে, এইটুকু উন্নতি হল তবে! ভাগবতকাকা বলেছিল, এ-বছরটা তার পক্ষে ভাল। তা আরম্ভটা ভালই দেখা যাচ্ছে বটে!

প্রথম মাসের মাইনে পাওয়ার সময় সুধন্য তিন দিনের রোজের ক্ষতিপূরোণ বাবদ পনেরো টাকা কেটে নিল। বলরাম পাছে টাকাটা দিতে ঢিলেমি করে, তাই সুধন্য আগেই কিষ্টবাবুর থেকে টাকাটা নিয়ে নিয়েছে। সুধন্যর কাছে এ-নিয়ে অনুযোগ জানালে সে বলল, সাধারণ একটা লোকের দিন মজুরী দুই

টাকা হলে তার মত একটা গাঁয়ের মোড়লের মজুরী পাঁচ টাকা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

সেদিন দুপুরবেলায় হঠাৎ কার্তিক গিয়ে বলরামকে ডেকে নিয়ে এল ভেড়ী থেকে। ঘরে এসে বলরাম তো অবাক! সুভদ্রা এসেছে এত পথ ভেঙে এই অজ পাড়াগাঁয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে? দীর্ঘ ছ' মাস পরে এমন করে যে সুভদ্রা নিজে সেধে এসে তাকে দেখা দেবে এ যেন কল্পনারও অতীত!

পান খেয়ে ঠোঁটজোড়াকে টুক্‌টুকে লাল করেছে সুভদ্রা। গায়ে চড়িয়েছে একখানা শোভন তাঁতের শাড়ী। শাড়ীর নিচে রয়েছে ব্লাউজ এবং সায়া। এর মধ্যেই শুক্‌নো হাড়গিলে চেহারাটায় বেশ মাংস লেগেছে।

কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গীতে সুভদ্রা বলল. 'ছেলেটাকে দেখতে এলাম। আগ করলেনি তো?'

কী যে বলবে তা যেন ভেবে ঠিক করতে পারছে না বলরাম। এই মেয়েটিকে হারাণোর দুঃখ আজও বলরামের মন থেকে মুছে যায়নি। এখনো সে গোপনে গোপনে সম্ভবপর জায়গাগুলিতে খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। অথচ মেয়েটা আজ সশরীরে উপস্থিত হতেই মনে হচ্ছে, এ যেন একজন বেশ গণ্যমান্য লোকের বৌ, অনেকদিন আগে এর সঙ্গে অল্প-স্বল্প আলাপ ছিল মাত্র। একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষ যতখানি ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসতে পারে এ মেয়েটার সঙ্গে যে তার এককালে সেই সম্পর্ক ছিল, এ যেন আজ কল্পনাও করা যায় না।

'আগ করব কি গো আমি যে অবাক হয়ে গেছি। ভাবতেই পারিনি তুমি এস্‌বে। এস, ঘরে এসে বসবে।'

ঘরে নিয়ে গিয়ে একখানা মাদুর বিছিয়ে বলরাম বসাল সুভদ্রাকে। বলরামও মাদুরটার একপাশে বসতেই সুভদ্রা সরে গিয়ে তার গা ঘেঁষে বসল।

'ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে?' বলরাম জিজ্ঞেস করল।

'না তো। দেখতেই পাচ্ছিনি তাকে।'

'সে কী কথা?' বলে সুভদ্রার স্পর্শ এড়ানোর জন্যই যেন বলরাম ছেলে খোঁজার অজুহাতে উঠে গেল তাড়াতাড়ি।

ছেলেটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে বলরাম বলল, 'পেন্নাম কর্ মাকে।'

বোকা ছেলেটা শরীর শক্ত করে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, নড়ল না।

'কীরে কথা শুন্‌ছিসনি? মাকে বুঝি চিনতে পারছিস্‌নি?'

এবার ছেলেটি ঠোঁট বাঁকিয়ে শুধু বলল, 'ছাই মা!'

অপ্রীতিকর অবস্থাটাকে সামলিয়ে নেওয়ার জন্য সুভদ্রা বলল, 'থাক্, থাক, পেন্নাম করে কী হবে?'

তারপর নিজেই উঠে গিয়ে ছেলের চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেল এবং মাথায় হাত বুলোতে লাগল। ছেলেটি বিরক্ত মুখ থেকে তার হাতখানা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। তারপর বলরামের মুঠো একটু ঢিল হতেই সুযোগ পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। পিছন থেকে যে বলরাম ডাকতে লাগল তাতে কানও দিল না।

সুভদ্রা একটু ম্লান হেসে বলল, 'এমন কপাল করেছি যে ছেলেটাও মোর পর হয়ে গেল।'

কিন্তু সুভদ্রা খুব দুঃখিত বা মর্মাহত হয়েছে বলে মনে হল না।

একটু পরেই সে নিজের কথা বলায় মগ্ন হয়ে গেল। সে বলে গেল, মাস তিনেক সে বড়বাবুর কাছে ছিল। বড়বাবু খেতে পরতে ভালই দিত; কিন্তু বড় বদমেজাজী ছিল। তার যে কখন কী মেজাজ হবে বুঝতে না পেরে সুভদ্রা বড়ই অস্বস্তি বোধ করত। তারপর তো একদিন বড়বাবু তাকে তুচ্ছ কারণে ঘর থেকে বের করেই দিল। তা সেই সময় বলরামদের গাঁয়ের নিতাই তার খুব উপকার করেছিল। সে-ই তখন কালাচাঁদ প্রামাণিকের আশ্রয়ে তাকে নিয়ে আসে। কালাচাঁদবাবু তাকে এখন যাদবপুরের একখানা ঘরে রেখেছে; তার ব্যবহার খুব ভাল। তার বিরুদ্ধে সুভদ্রার বলার কিছুই নেই। বুড়োমানুষ, তবু মেয়েনোকের সঙ্গে তার পিরীত করার সখ দেখ্‌লে বলরামের নিশ্চয়ই হাসি পাবে।

'বেশ আছিস্ তবে, সুভদ্রা ?' বলরাম জিজ্ঞেস করল।

'বেশ আর কি ? তবে বেঁচে আছি।' সুভদ্রা জবাব দিল, তারপর একটু ভেবে যোগ করে দিল, 'তোর কথা ভেবে মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যায়।'

বলরামের মনে হল, সুভদ্রার কথাগুলো নিতান্তই ফাঁকা। সুভদ্রা আজ যে এখানে বেড়াতে এসেছে, এ আসলে কারও প্রতি টান আছে বলে নয়। আয়েসী বৌরা দুপুরবেলায় সময় কাটানোর জন্য যেমন পাড়া বেড়াতে বের হয়, সুভদ্রার আসাটাও ঠিক তেমনি।

প্রথম যেদিন বড়বাবুকে সুভদ্রার কাছে বলরাম নিয়ে গিয়েছিল সেদিন তার কথায় চাহনিতে যে জ্বালা ছিল, আজ তার বিন্দুবিসর্গও নেই। দরজায় দরজায় সুভদ্রাকে রক্ষিতা হয়ে বেড়াতে হচ্ছে বলে তার মনে এতটুকু আপশোষ নেই। বরং ভাল খাওয়া-পরা পাওয়া যায় এমন পথটা দেখিয়ে দিয়েছিল বলে সে এখন বলরামের কাছে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে পারে।

সুভদ্রা বলরামের গা ঘেঁষে বসল, দু'একবার তার গলা জড়িয়ে ধরল, দু'একবার এমন কি তার গালের উপর নিজের গাল রাখল। তবু যে মেয়েটিকে একদিন পাওয়ার জন্য বলরাম চার পাঁচ ক্রোশ পথ চলে যেত, আজ তার প্রতি এতটুকু কামনা জাগল না দেখে বলরাম দুঃখিত হল।

সেদিন বিকেলবেলা সুভদ্রা চলে যাওয়ার পর বলরামের মনটা কী যে খারাপ হয়ে গেল ! এ-সংসারে আজ সে একা, একেবারে একা। সুভদ্রা মুছে গিয়েছে তার জীবন থেকে। বৌ-ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তার যোগটা নিতান্তই অভ্যাসের। এমন-কি গ্রামের লোকদের থেকেও সে বিচ্ছিন্ন। অটবী চলে যাওয়ার পর গাঁয়ে চুরির ব্যাপারে, বা কোথাও ঠিকে কাজ নেওয়ার ব্যাপারে নবীন-ই সর্দারী কোরছে। নিতাই নবীনের চেয়ে বেশী কাজের ; কিন্তু তাকে গাঁয়ের লোকেরা বিশ্বাস করে না। বলরামকে পেলে তারা হয়তো খুশী হত। কিন্তু যে সব কাজে তার এতটুকু স্বার্থের যোগ নেই, সে কাজে সে আর কাঁহাতক মন দেবে। গাঁ-এর লোকদের থেকে সে যে এতখানি দূরে সরে গিয়েছে, তার কারণ তার সৎ হওয়ার চেষ্টা। অথচ সৎ

হয়েই বা তার কী লাভ হয়েছে। অন্তরে বা বাইরে, কোন দিকেই তো সৎ হয়ে সে কোন নতুন আলোর সন্ধান পাচ্ছে না। কোন্ এক সুদূর পরজন্মে তার ভাল হবে, তা ভেবে তো কই সে কোন সান্ত্বনা পাচ্ছে না।

তার বয়স এই সবে ছত্রিশ; বাঁচলে আরও অনেকদিন সে বাঁচতে পারে। কিন্তু এইটুকুন বয়সেই আজ তার মনে হচ্ছে সে যেন অনেকদিন বেঁচেছে। অনেকগুলো বিবর্ণ ক্লান্ত বছরের ভারে সে যেন কুঁজো হয়ে গিয়েছে। এতদিন ধরে অনেক অনেক জিনিষ সে মনের মধ্যে গোপনে চেয়ে এসেছে, আজ যেন সে-চাওয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে। তেমনি নতুন কিছু পাওয়ার কথাও তার জীবনে আর কখনো উঠবে না। এদিক দিয়ে বুড়ো অথর্ব ছেলে-বৌ-দের অত্যাচারে ক্লিষ্ট নিত্যানন্দের সঙ্গে যে তার কোন তফাৎ আছে তা মনে হল না বলরামের। নিত্যানন্দের মতই মরণের দিন গোণা ছাড়া তার আর কোন কাজ আজ আর বাকি নেই।

দু'তিন দিন পরে বলরাম বসেছিল হাজরার থানে। নবীন এসে খবরটা দিল।

'সোনারপুরের খবর শুনেছ বলাদা?'

'না তো? কি খবর রে?'

'শোননি? সাংঘেতিক খবর যে! পাঁচ পাঁচ হাজার লোক একটা মীটিং-এ জড়ো হয়েছিল। পুলিশ এসে তাদের উপ্‌রে গুলী চাইলে দেয়। তা তারাও ছাড়েনিকো। একটা দারোগা নাকি খুন হয়েছে। দুটো পুলিশকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনি। দুটো বড় জোত্‌দারও নাকি সাবাড়!'

শুনে বলরাম তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'বলিস্ কি? এ নিশ্চয় মোদের নিরঞ্জনবাবুর কাজ!'

'তাতে আর মুন্দ' কি! এবার আগুন জলল বলাদা! তুমি দেখে লিও, গরীবের দুক্ষু এবার দূর হবে।'

খবর শুনে গাঁয়ের আরও দু'চারজন এসে জুটল, সবাই খুসী হয়ে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

যজ্ঞেশ্বর বলল, 'চেরকাল কি একভাবে যায় ? ওদের পাপের ভরা পুন্ন্ হয়েছে। বলরাম, তুমি এই বেলা একবার যাও, নিরঞ্জনবাবুর ঠেঁয়ে।'

তখনকার মত বলরাম দায়িত্বটা স্বীকার করে নিল। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল, ততই তার মনে হতে লাগল, কী হবে নিরঞ্জনবাবুর কাছে গিয়ে ? ওখানে ওরা তেভাগা আন্দোলন কোরছে। ওরা চাষী, কিছু জমি আছে নিজস্ব, কিছু চাষ করে ভাগে। ভাগের জমিতে ফসলের আদ্ধেক অংশ পেত, এখন তিনভাগ দাবী কোরছে। মাটীর মধ্যে শক্ত করে শিকড় গেড়ে ওরা বসে আছে, ওদের হটায় কে ? কিন্তু তারা এখানে কিসের দাবী করবে,—তাদের কি জমি আছে ? বেশী মাইনে বা বেশী মুজ্‌রো দাবী করবে ? তা কারবারীরাও সেয়ানা লোক, তারা অন্য লোককে ডেকে এনে কাজ দেবে,—কত লোক ঘুরছে কাজের জন্য ! কাজ না দিলে তারা কী করতে পারে ? জমির উপর দাবী করা যায়, কাজ দেওয়া না দেওয়া মালিকের মর্জি।

এর অল্প পরেই একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল,—নায়েবমশাই খুন হলেন। কিন্তু এতবড় ঘটনাটাতেও বলরাম যেন বেশী উত্তেজিত হতে পারল না। পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার থেকে তার যেন নাড়ীর যোগ ছিন্ন হ'রে গিয়েছে। তার রক্ত যেন ঠাণ্ডা হিম-শীতল।

যেদিন থেকে তাদের জমি গিয়েছে, সেদিন থেকে ভাগ্য তাদের উপর বিরূপ। নিরঞ্জনবাবু তাদের সমস্যার কোন প্রতিকার করতে পারবেন না।

আরও দিনকতক পরে হঠাৎ একদল পুলিশ এসে নায়েব হত্যার ব্যাপারে বলরামকে সুদ্ধ গ্রামের পাঁচসাত জন প্রধান ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গেল।

এই গ্রেপ্তারগুলো করানো হল অবিশ্যি কাঞ্চন রায়ের ইঙ্গিত অনুসারে। তাঁর প্রথমটায় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যে-সব জমিদার-মহাজনের বিরুদ্ধে তাঁর মামলা-মোকদ্দমা চলছে, তাদেরই কেউ চড় লাগিয়ে কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। জমিদারীর দুষ্ট্‌ প্রজাদের কাউকে সন্দেহ করা যায় কিনা তা-ও অবিশ্যি তিনি ভেবেছেন। যেমন ভেবেছেন অটবীর কথা। কিন্তু নায়েবের বিরুদ্ধে অটবীর কোন তীব্র আক্রোশ থাকার কোন সঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পাননি। বড় ছেলের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ হলে অটবীকে সন্দেহ করা যেত।

কিন্তু নায়েবের সঙ্গে অটবীর কোনদিনই কোন কারণে কোন উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়নি।

এমন সময় হঠাৎ রামাই একদিন বলে বসল, 'কত্তাবাবু, এ লিচ্চয় বলরামের কাজ।'

কাঞ্চন রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন রে? এ-কথা কেন বলছিস?'

'সেবার নায়েবমশা বলরামকে যা মারটা দিয়েছিলেন,—ওর সব-কটা হাড় ভেঙে গিয়েছিল। সেই আগটা তো ওর মনে ছেল,—যে গোঁয়ার জাত ওরা!'

কথাটা কাঞ্চন রায়ের মনে লাগল। তৎক্ষণাৎ দারোগাকে তিনি খবর পাঠালেন।

দারোগাবাবু কিন্তু তাদের তিন-চার দিন আটকে রেখে এবং আরও অন্যান্য সূত্রে খবর নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দিলেন। জমিদারকে বললেন, 'কাঞ্চনবাবু, আপনি এখন দড়ি দেখে সাপ বলে ভয় পাচ্ছেন। বাগ্দীজাত কখনো জমিদারের বিরুদ্ধে যায়? ওরা হল জমিদারের হাতের লাঠি;—জমিদারের হয়ে ওরা দশটা খুন করতে পারে; কিন্তু জমিদারের হাতে লেগে থাকবে যেন ভিজে ন্যাকড়া।'

কথাগুলো জমিদার ঠিক বিশ্বাস করলেন না। আগে এদের বিশেষ সন্দেহ না করলেও, দারোগার কথার পরে সন্দেহটা একটু বাড়ল। এদের তিনি অনেক উপকার করেছেন। এদের জায়গা দিয়ে বসিয়েছেন, অনেক কাজ দিয়ে পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা দেখিয়ে দিয়েছেন; চুরি-টুরি করলে পর্যন্ত সামলিয়ে চলেছেন। এত উপকার যাদের করেছেন, তারা প্রতিদানে তাঁর কোন অনিষ্ট করবে না, এটা মানব-চরিত্র-সম্মত কথা নয়।

একটা কুটীল আক্রোশ তিনি মনে মনে পুষে রাখলেন।

আর বলরামেরা তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুমান করতে পারল যে তাদের এই গ্রেপ্তার আর হয়রানীর পিছনে জমিদারের হাত আছে।

সতেরো

ট্রেণে বেশ ভীড় ছিল। কিন্তু চার পাঁচটা ষ্টেসন পার হওয়ার পরেই ভীড়টা অনেক পাতলা হয়ে গেল।

অটবী যাদের মধ্যে বসেছিল তারা সবাই বাজার-ফেরতা। কেউ আনাজ নিয়ে কেউ-বা মাছ নিয়ে কোলকাতার বাজারে এসেছিল, এখন খালি চুপড়ি নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরছে। প্রথমটায় অটবী তাদের কথার দিকে কান দেয়নি, নিজের বিষণ্ন চিন্তাতেই মগ্ন ছিল। যখন ভীড় পাতলা হয়ে এল, এবং কথাও ফিস্‌ফিসানি ছাড়িয়ে আর একটু উঁচু পর্দায় উঠল, তখন বাধ্য হয়েই কান দিতে হল।

একজন বলছিল, 'আচ্ছা সোনাদা, এত তো খবর রাখ্‌তেছ তুমি। তা মোর একটা কথার জবাব দাও দিনি,—ইংরেজরা ইদেশটা ছেড়ে চলে গেল কেনে?'

সোনাদা বলে সম্বোধিত আধবুড়ো লোকটি বলল, 'কেন শুনবি? বেশী খেয়ে দেখেছিস্ কখনো?—আবার উগ্‌ড়ে ফেলতে হয় খানিক। তো ইংরেজেরও তাই হয়েছেল। যদি বল কেন? না, জার্মেণী ভারতবশ্যটার আদ্ধেক ইংরেজের থে' চেইছিল। তা ইংরেজ রাজী হলনি; বলল, সেই সবটা খাবে, আর সব উপোস থাকবে। ত্যাখন দুই দেশে নাগল লড়াই। ইংরেজ আর এঁটে উঠতে পারে না; ত্যাখন রুশিয়ে যোগ দে' জার্মেণীকে তেইড়ে দিলে। তা'পর রুশিয়ে বললে, ভারতবশ্যটা তোমাকে ছাড়তে হবে। উটি কেউ লিবে না, লিজের মত লিজে থাকবে। যদি না ছাড়, তো কথা দিচ্ছি, তেরো দিনের মধ্যে আমি দেশটা দখল করে নোব। শুনে, ইংরেজ হাতজোড় করে বললে, দোহাই বাবা, যুদ্ধু কোরোনি; হেরে গেলে পিথিমীতে বদনাম লিয়ে থাকতে হবে। আমি অমনি চলে যাচ্ছি। আর কি, তা'পর চলে গেল।'

আর একজন বলল, 'এখন তবে দেশের আজা কে হল গো?'

'পণ্ডিত নেহেরু।'

'পণ্ডিত? মাথায় তবে টিকি-ফিকি রাখে? যাক্ তবে এবার ক্ষত্তিয়ের বদলে বাম্ভণ আজা হওয়ায় পূজোআচ্চার দিকে নোকের মতি যাবে।'

সোনা এবার ধমক দিয়ে বলল, 'ধেৎ বোকা! আজা আজা কত্তেছিস্ কেন? আজকাল কি আর দেশে আজা থাকে? থাকে না। আজকাল সব মন্তি। তা নেহরু খুব বড় মন্তি বটে। তার কথা বলতেছি শোন্। যে ঠিক করেছে, দেশটার খুব উন্নতি করবে। বড় বড় বাড়ী করবে,—খড়ের বাড়ী আর থাকবেনি, সব পাকা বাড়ী হয়ে যাবে। কলের নাঙলে জমি চাষ হবে। এ-সব করবে। তা এর জন্য টাকা তো নাগ্‌বে! টাকা সব ইংরেজে নে' গেছে, দেশে আর টাকা নেইকো। ত্যাখন আম্‌রিকা বলল, "আমি টাকা দোব। দেশময় চাল্লিশতলা পঞ্চাশতলা বাড়ী তুলে দোব। কিন্তুক দেশের আদ্ধেক মোর নামে নিখে দাও।" নেহরুও শক্ত নোক, তাতে আজী লয়। ইদিগে রুশিয়ে বলতেছে, আমি কিচ্ছুটি চাইনে। অমনি টাকা দোব। কিন্তুক দুটি সর্তে,—এক, দেশে ধনী-গরীব থাকতে পারবেনি, সব সমান হয়ে যাবে। আর দুই, খিষ্টেন আর মোচলমানকে দেশ থে' তেইড়ে দিতে হবে।'

এবার কে বলে উঠল, 'দূর বোকা। রাশিয়ে নিজেই খিষ্টেন, সে আবার খিষ্টেনদের তাড়াবে!'

'তোরা যদি নিজেরাই সব জানিস্ তবে আর আমি কথা বলি কেন?' বলে ন্যায়সঙ্গত অভিমান নিয়ে সোনা চুপ করল।

তখন সকলেই তাকে বলার জন্য অনুরোধ আরম্ভ করে দিলে। শেষটায় একটু নরম হয়ে সোনা আবার বলল, 'নেহরু কী বললে জানিস্? বললে, যে আমি তাইতেই আজী, কিন্তু মোচলমান তাড়াতে পারবনি। এদের আমি কথা দিইচি, ওরা যদি সমস্ত হিঁদু মেরেও ফেলে, তবু ওরা এ দেশে থাকবে। আর মোর আর কংগেসের যে-সব জমিদারী আছে, সেগুনোকে রেহাই দিবে হবে। নেহেরু খুব মস্ত জমিদার কিনা। টাটা কারখানার নাম শুনেছিস্?—সেটা

তো তার। কাশ্মীরের নাম শুনেছিস্?—সে জায়গাটাও তার। বর্ধমানের আজার চেয়েও অনেক বড় নোক নেহেরু।'

কে যেন বলল, 'তা নেহেরুর টাকা নাগবে তো রাশিয়ের কাছে না গিয়ে মোদের নিধি-বাগের থে' তো টাকা লিতে পারত!

আর একজন বলল, 'তবে নেহরু বল, আর যাই বল, জমিদারী আর থাক্‌বেনি। নিরঞ্জনবাবু এবার চাষীদের যা ক্ষেইপে তুলেছে, জমিদারদের জাহাজে ভর্তি করে সমুদ্দুর পার করে দে'ছাড়বে।'

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পরে অটবী একটু বিদ্রূপের হাসি হাসল। যে-লোকটা কথাগুলো বলেছিল সে অটবীর পাশেই বসেছিল। অটবীকে হাসতে দেখে বলল, 'বড় যে হাসলে ভাই?'

অটবী বলল, 'হাসার কথা বললে হাসবনি? জমিদারদের তেইড়ে দিতে হলে অমন এক লাখ নিরঞ্জনবাবুর দরকার হবে। তা'পর সেই এক লাখ নিরঞ্জনবাবুই আবার জমিদার হয়ে বসবে। ওরা তো ভদ্দরনোক। ভদ্দরনোক কখনো গরীবের বন্ধু হয়?'

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি জমি-জমা আছে নাকি গো?'

'নাঃ।'

'আমারও নেইকো। তবে জমিদারি থাকে যাক, যায় যাক, তাতে মোদের নাভও নেই ক্ষেতিও নেই। তার চেয়ে এস, দুটো সুখ-দুখের গপ্প করা যাক। মোর নাম নিবারণ। তোমার নাম কি ভাই?'

'অটবী।'

তারপর নিবারণ কয়েক মিনিটের মধ্যেই অটবীকে অনেক তথ্য জানিয়ে দিল। সে মাছ পাইকারী করে। পরশু তার চার টাকা লাভ হয়েছিল; কালকেও টাকা আড়াই লাভ ছিল; কিন্তু আজ শুধু মাছের দামের থেকেই দু'টাকা লোকসান গেছে। এছাড়া তো খরচা-খুরচিও আছে। কবে কার থেকে কি দামে সে মাছ কিনেছিল এবং কি দামে বেচেছিল, তার আন্দাজটা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে হুবহু মিলে গিয়েছিল, ইত্যাদি প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে গেল।

তারপর জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি নোকটা বড় ভাল অটবী। তা ইদিগে যাচ্ছ কোথায়?'

'কাগদ্বীপ।'

'তবে তো মোদের দেশেই যাচ্ছ। কার বাড়ী উঠ্‌বে? আত্মীয় হয় বুঝি?'

'কাগদ্বীপে কোথাও উঠ্‌বনিকো। ওখান থে' যাব গোঁসাইয়ের থানে।'

'ও। বেড়াতে যাচ্ছ তবে?'

'না। একেবারে চলে যাচ্ছি।'

'সম্‌সার ছেড়ে চলে যাচ্ছ? মনে খুব দাগা পেয়েছ, লয়? তা তুমি ভাগ্যিমান। ভগমান টেনেছেন তোমাকে। আমিও জেবনে কম দাগা পাইনিকো। কিন্তুক সম্‌সারের মায়া কাটাতে পারছিনিকো। মনে আকিঙ্ক্ষে আছে কিনা,—আকিঙ্ক্ষের নিব্বিত্তি না হলে তো ভগমান টানেন না। তা তোমার বৌটা বুঝি মরে গেছে ভাই?'

'না। পেইলে গেছে।'

'তাই। মনে বড় দাগা পেয়েছ। তুমি খুব ভাল নোক গো। যাওয়ার আগে মোর ঘরে দু'দিন থেকে যাবে, কেমন?'

অটবী তো ভাল লোক হবেই। এমন মনোযোগী শ্রোতা সে অনেকদিন পায়নি। তাছাড়া অটবীর মস্ত গুণ তার বৌ পালিয়ে গেছে। সম-ব্যথীর চেয়ে ভাল লোক আর কে হতে পারে!

কিন্তু নিবারণের বাড়ী এসে অটবী দেখল তার বৌ আছে ঘরে। কাক-দ্বীপের বাজারের কাছেই নিবারণের একখানি মাত্র ঘর। বাঁশের খুঁটি, টিনের ছাওনি। তবে সবটা এখনো বেড়া দিয়ে ঘিরতে পারেনি। আদ্ধেকটা ঘিরেছে বাখারির বেড়া দিয়ে, আদ্ধেকটা এখনো ফাঁকা পড়ে আছে।

সন্ধ্যেবেলা নিবারণ ডাকল, 'খেঁদীর মা, যা তো একটা পাঁট নে' আয়।' তারপর অটবীর দিকে ফিরে বলল, 'অনেকদিন খাইনি। বড্ড দাম। আজ তোমার সামনে একটা আনাই, কি বল?'

'তা আনাও। গোঁসাই-এর থানে গেলে গেলে তো আর এ-সব চলবেনি। যাওয়ার আগে একবার খেয়েনি।

মদ খেতে খেতে ঝাড়া ছু'ঘণ্টা ধরে নিবারণ তার জীবনের কাহিনী বলে গেল। তার বাপ ছিল চাষী। কিন্তু যা জমি রেখে গিয়েছিল তাতে চার ভাই-এর চলতে পারে না বুঝতে পেরে অল্প বয়সেই নিবারণ বেরিয়ে গিয়েছিল মাছের কারবার করতে। মাছের কারবারের কাঁচা পয়সা দেখে ছোট বেলার থেকেই তার এদিকে ঝোঁক ছিল। বাপ থাকতেই প্রথম বিয়ে করেছিল। বৌটা ভালই ছিল, কিন্তু বছর তিনেক পরে সবে যখন বিছানায় নিয়ে শোবার উপযুক্ত হয়েছে, তখনই ওলাওঠায় মারা যায়। হাতে তখন কিছু টাকা ছিল। কাজেই আবার একটা ডাগর দেখে কুমারী মেয়ে বিয়ে করে বসল। এ-বৌটিকে নিয়ে সাত আটটা বছর নিবারণের খুবই আনন্দে কেটে যায়। একমাত্র ছুঃখ ছিল যে বৌটা বাঁজা। তাছাড়া যেমন সে ছিল দেখতে সুন্দর, তেমন ছিল কাজে কর্মে ভাল, তেমনি তাকে যত্নও করত খুব। কিন্তু আট বছর পরে কী যে তার মতিচ্ছন্ন হল, নিবারণের একটা বন্ধুর সঙ্গে সে পালিয়ে গেল। তবু বৌটাকে নিবারণ খুব ভাল বলবে। কারণ, সে তখন বাড়ীতে ছিল না; তবু পালিয়ে যাওয়ার সময় সে তার একটা ছুঁচও নিয়ে যায়নি। তারপর নিবারণ একটি বিধবাকে রেখেছিল। তা সে মেয়েছেলেটা গুণ জানত। নিবারণকে এমন গুণ করেছিল যে দশ বছর ধরে টাকা জমিয়ে সে যে বাড়ী করেছিল সে বাড়ী তার নামে লিখে দিয়েছিল। তখন তার এক ভাই এসে জুটল। ভাইবোনে পরামর্শ করে তাকে বলল বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে। তা সে ছুটোকেই মারের চোটে স্বর্গ থেকে পাতাল অবধি দেখিয়ে ছেড়েছিল। তারা ফৌজদারী করলে, নিবারণের জেল হয়ে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে মনের ঘৃণায় এক বছর একা একাই ছিল। তারপর খেঁদীর মাকে নিয়েছে। তা' খেঁদীর মা ব্যবসা খুব ভাল বোঝে বটে, কিন্তু চুরির অপরাধে তার আগের স্বামী যে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তা নিবারণ জানে। তাই তাকে খুব চোখে-চোখে রাখে।

প্রত্যেকটি কাহিনীর ছোটখাটো খুঁটিনাটি বিবরণগুলি পর্যন্ত নিবারণ একবারও না থেমে একটুও না ভেবে বলে গেল। যেন সবটা তার মুখস্থ। অটবীর ধৈর্যে কুলুলে, সে হয়তো তার পঞ্চাশ বছরের

প্রতিদিনকার জীবনের তুচ্ছতম কাহিনীটি অবধি অনায়াসে শুনিয়ে দিতে পারে।

পরদিন নিবারণের আর কোলকাতা যাওয়া হল না। সন্ধ্যাবেলাটা ওখানে সাধারণতঃ মাছের নৌকা আসার সময়। আগের দিন সেই সময়টাই নিবারণ ব্যস্ত ছিল অটবীর সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে। খেঁদীর মা অবিশ্যি মাছের চেষ্টায় বেরিয়েছিল; কিন্তু মরা গণ বলে মাছের আমদানী এত কম ছিল যে সে বিশেষ মাছ কিনতে পারেনি। সের চার-পাঁচ কুচো চিংড়ী ছিল; সেইটে নিয়ে সে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে এল।

অটবী ঘুরে ফিরে নতুন জায়গাটা দেখে-শুনে বেড়াতে লাগল। কিন্তু যখনই যতবারই সে ঘরের দিকে এল, অবাক হয়ে দেখল নিবারণ বাইরের দাওয়ায় ঠায় বসে তামাক টানছে, আর খেঁদীর মা ঘরের মধ্যে এটা-সেটা সংসারের কাজ কোরছে বা দেখা শোনা করার নামে মেয়ে দুটোকে ধমকা ধমকি কোরছে। নিবারণ একবারও ঘরের ভিতরে যাচ্ছে না, বা খেঁদীর মা-ও একবারও বাইরে আসছে না। এমন কি সারাটা দিনের মধ্যে অটবী দেখতে পেল না যে তাদের মধ্যে কোন কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। উভয়ের মধ্যে যে যোগাযোগ আছে, তা বোঝা গেল শুধু এই দেখে যে এক পক্ষ মাঝে মাঝে এক আধটা ফরমাস কোরছে এবং আর এক পক্ষ মুখ বুজে তা তা তামিল কোরছে।

তার পরদিন রাত এগাড়টায় নিবারণ মাছ নিয়ে কোলকাতা চলে গেল। সকালে উঠে অটবী দেখল খেঁদীর মা বাজারে চলে গিয়েছে কুঁচো মাছ বেচতে।

খেঁদীর মা ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে এল। এতক্ষণ একা থেকে থেকে অটবী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, খুশী হয়ে বলল, 'বাজার হয়ে গেল বৌঠান? তবে এসদিনি, একটু বসে দু'দণ্ড দুটো কথা বাঁচা যাবে।'

খেঁদীর মা ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'বস, চা করেদি।' তারপর এক মেয়েকে চা কিনে আনতে দোকানে পাঠালো।

কালো, চোয়াল-উঁচু কুৎসিৎ মুখখানা থেকে যৌবন কবে বিদায়

নিয়েছে খেঁদীর মার। তবু তার রুচি চো-এর মত লজ্জা? মেয়ে মানুষ কত ঢং-ই যে জানে!

মেয়ের হাত দিয়ে চা পাঠিয়ে দিল খেঁদীর মা। একটু পরে কী একটা কাজে মেয়ে দুটোকে কোথায় পাঠিয়ে দিয়ে খেঁদীর মা এসে অটবীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাল পিছনের দাওয়ায়।

'বুড়ী মাগার নজ্জা দেখে হাসি পাচ্ছে, লয়? কী করব বল! মুনিষের সঙ্গে দুটো কথা বলতে কি আর মোর ইচ্ছে হয়নি? কিন্তুক উপায় নেইকো। মেয়ে দুটো মোর পেটে হয়েছে, কিন্তুক শেয়ালের জাত। যা দেখবে অমনি বাপের কানে নাগাবে।'

অটবী ভাল লোক, সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। তাই তার সঙ্গে দুটো মনের কথা বলার ইচ্ছা খেঁদীর মার সেই অবধি মনে রয়েছে। কিন্তু সুযোগ কোথায়?

যে সুযোগটা জুটেছে তাইবা কতক্ষণ টিকবে। খেঁদীর মা তাই খুব তাড়াতাড়ি করে নিজের জীবনের কাহিনী বলে গেল। আগের স্বামীটা খুব মার ধোর করতে। একদিন বাজার করে ফেরার পর মাত্র চার আনার পয়সা হিসাবে মিল না হওয়ায় তাকে মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে কিন্তু দিব্বি গেলে বলতে পারে একটি পয়সাও সে কোনদিন চুরি করেনি। এই স্বামীটা অত মারে না, কিন্তু তাকে ভীষণ সন্দেহের চোখে দেখে। চোরের মত থাকতে হয় তাকে।

চোরের মতই মিনিট পনেরোর মধ্যে সমস্ত কথা শেষ করে ফেলল খেঁদীর মা।

বলল, 'ইবার তুমি বাইরের দাওয়ায় গে বোস। আমি আন্না বান্না করি। মোর হাতের আন্না তোমার ভাল নাগ্‌তেছে?'

'খুব। তোমার হাত ভারী মিষ্টি।'

অটবী পা বাড়ালো।

'আর এক কথা, ভাল মুনিষের পো। এ-সব কথা ওর কানে যেন না যায় তা লে আর ওক্কে রেখ্‌বেনি।''

'নিশ্চিন্দি থাক বৌঠান। অত কাঁচা ছেলে পাওনি মোকে।'

বলে অটবী বাইরের দাওয়ায় নয়, হাটতে হাটতে একেবারে বাজারের মধ্যে

চলে এল। তার মুখে যেন হাসি আর ধরে না। পথের লোকেরা বিস্মিত হয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় বারবার সন্দেহের দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। অটবী ভ্রূক্ষেপও করল না।

নিবারণের আন্তরিকতার বাড়াবাড়িতে অটবী যেন মোটে স্বস্তি বোধ করতে পারছিল না। তার প্রকৃতি এখন এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে অত বেশী বন্ধুত্ব পাতানো আর ভালমানুষী যেন আর তার সইছে না। খেঁদীর মার সঙ্গে আলাপ করে এতক্ষণে অটবী যেন একটু আরাম বোধ করেছে। এতক্ষণে জানা গেল যে নিবারণ মোটেই ভাল মানুষ নয়। বৌ-টাকে ঘরে রেখেছে দাসী-বৃত্তি করার জন্য। তাকে সে ভাল তো বাসেই না; বরং সন্দেহ আর ঘৃণা আর অবিশ্বাস তার মনে এতই তীব্র যে তার ডাইনে বাঁয়ে চড় রেখে দিয়েছে পাহারা দেওয়ার জন্য।

এইটেই মানুষের আসল পরিচয়। স্বার্থপরতা আর ঘৃণা আর হিংসা, এইগুলো দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে এখানে মানুষ নামে এক রকমের লোক বাস করে। ভালবাসা দেখানো, মানুষের ভাল করা, এই সব জিনিষ যদি কোথাও দেখা যায় তো মনে করতে হবে, এ-সব শুধু সাময়িকই নয়, এর মধ্যে কোন ফাঁক আছে। জীবন ভরে কত দেখল অটবী, দেখতে দেখতে চোখে ছানি পড়ে গেছে।

এই জন্যই তো অটবী সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ঘৃণা করে বা হিংসা করে বা লোক ঠকিয়ে তার আর কোন লাভ হওয়ার আশা নেই। তাই সে পালিয়ে যাচ্ছে। যাদের লাভ হয়, তারা থাকে।

মানুষের সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করলে যাদের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারা সংসার করে। যেমন, নিবারণ সংসার কোরছে। ঠকানোর মত কোন লোক অটবীর নেই। ভাগ্যিস অটবী পালিয়ে যাচ্ছে!

নিবারণ ফিরে এলে অটবী বিদায় নিতে চাইল।

নিবারণ বলল, 'যাবে তো লিচ্চয় ! যে মুনিষ সম্‌সার ছেড়ে এসেছে তাকে ধরে রেখ্‌বে এমন সাধ্যি কার? তা আর হু'. একটা দিন থেকে যাও না দোস্ত। মনের কথা খুলে বলব এমন মুনিষ যে কতকাল পাইনি। থাকি

কারবারী নোকদের সঙ্গে ; কথা যা বলি সব টাকা-পয়সার কথা। ভিন্ন রকমের কথা কইবার নোক পেইছিলাম এক তোমাকে।'

অটবীও কম সেয়ানা নয়। দরদ দেখিয়ে বলল, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে মোর মনই কি চায় ? এমন বন্ধু শতকে একটি মিলবেনি। তা বেশ। কালকের দিনটা থেকে তবে পরসু যাই। না কি বল নিবারণদা ?'

পরসুদিন এলে দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর অটবী রওয়ানা হ'ল। নিবারণ আজ আর থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল না। কিন্তু তার কথা-বার্তায়, মুখের চেহারায় এ-কথা আর গোপন রইল না যে সে দুঃখিত হয়েছে।

খেঁদীর হাত দিয়ে পান পাঠিয়ে দিল খেঁদীর মা। পান চিবুতে চিবুতে অটবী বাড়ী ছেড়ে বাজারের দিকে পা বাড়াল। বাজারের ভিতর দিয়ে তার যাওয়ার পথ। সোজা যাবে নদীর ঘাটে, সেখান থেকে নৌকায় চড়ে খেয়া পার হবে ; তারপর ওপারে গিয়ে সোজা উত্তর মুখে।

কিন্তু বাজারে যাওয়ার জন্য বাঁক ঘুরতেই অটবীকে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। সেখানে খেঁদীর মা অপেক্ষা কোরছিল তার জন্য।

'যাচ্ছ ?'

'কী করব খেঁদীর মা ! মোকে যে যেতেই হবে।'

'তুমি ভাগ্যিমান, তাই যাচ্ছ। এ পোড়া সম্‌সারে মুখপোড়ারাই পড়ে থাকে।'

মনটা ভারী হয়ে এল অটবীর। কী বলবে ভেবে পেল না।

খেঁদির মা-ই আবার বলল, 'এত ভাল নোকটা চলে যাচ্ছে—তাও যে একবার শেষ দেখা দেখতে এসব তার জো নেই। শেষটায় পেইলে এইচি।'

'খেঁদীর মা, তুমি কিচ্ছু ভেবনি। আমি আবার এস্‌ব, তাতে ক্ষেতি কি ?'

একটু চুপ করে থেকে খেঁদীর মা বলল, 'পোনা মাছের টুক্‌রোটা লুকিয়ে এঁধেছিলাম। ভাল খেয়েছ তো ?'

'খুব ভাল। এত ভাল আন্না আর কি কখনো জুটবে ? কিন্তুক, তুমি যাও, খেঁদীর মা, কে আবার দেখে ফেলবে !'

চলতে চলতে পিছন দিকে না ফিরেও অটবী অনুভব করতে পারল, এক জোড়া কালি-পড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আশ্চর্য ! কী পেয়েছে এরা অটবীর মধ্যে ? কী গুণ আছে তার ? তার গুণের মধ্যে কোন পিছু টান নেই বলে মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনতে পারে। তারা মন খুলে তাদের দুঃখের কথা ওর কাছে বলতে পেরেছে,—সেটুকুর জন্য তাদের এতখানি কৃতজ্ঞতা বোধ ?

কিন্তু বেশী দূর অটবীর যাওয়া হয়ে উঠল না। যাওয়ার পথে শুঁড়ির দোকানটা পড়ে যাওয়ায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল। যাওয়ার আগে শেষবারের মত এই অতি প্রিয় বস্তুটার স্বাদ একটু নিয়ে নিলে ক্ষতি আর কি হবে।

দোকানের ভিতরে বেঞ্চি পাতা ছিল। একটা পাঁট নিয়ে বসে পড়ল অটবী। এক কথায় দু' কথায় সেখানে উপস্থিত খদ্দেরদের সঙ্গে খাতির জমে উঠল। তখন পাল্লা দিয়ে মদ খাওয়া সুরু হ'ল। প্রথমে পাল্লা দেওয়ার ঝোকটাই প্রধান ছিল ; কিন্তু পরে কোন অজ্ঞাত কারণে অটবী একেবারে মরীয়া হয়ে মদ খেয়ে চলল। এত মদ সে জীবনে কোনদিন খায়নি। পূরো দু' ঘণ্টা ধরে আশেপাশের সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে শুধু খেয়েই চলল। শেষ পাঁটটা যখন সে খাচ্ছিল, তখনই আর তার বিশেষ জ্ঞান নেই। বিড়বিড় করে করে কী যে বকে যাচ্ছিল, তার মানে না জানত সে নিজে, না বা বুঝতে পারল সেখানকার আর কেউ।

খানিকক্ষণ ঝিম মেড়ে মাথা গুঁজে পড়ে থাকার পর অটবী উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। টাল সাম্‌লাতে না পেরে ধুপ্‌ করে পড়ে গেল মেঝের উপর। এমন দৃশ্য দেখে চার দিক থেকে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। আর অটবীর মনে হ'ল বহু দূরের একটা হাস্যধ্বনির একটু অতি অতি ক্ষীণ রেশ তার শরীরের অনেক ভিতরে অবস্থিত ক্লিষ্ট মুহ্যমান চৈতন্য অনুভবে আঁচ করতে পারছে মাত্র।

দোকানের দুটি লোকে অটবীকে ধরাধরি করে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে এল। তারপর বহু কষ্টে টলতে টলতে হোঁচট খেতে খেতে সে কোন রকমে নিবারণের বাড়ীতে ফিরে এল। কী করে যে এল তা সে নিজেও বুঝতে পারল না। এমন

একটি বেহদ্দ মাতালকে দেখতে পেয়ে রাস্তার দু'পাশের জনতা উল্লসিত হয়ে উঠল। কেউ হাসল, কেউ টিটকারি দিল, বেশী উৎসাহী যারা তারা পিছনে পিছনে অনুসরণ করল। স্বাভাবিক সময়ে এমনটা ঘটলে অটবী রাগে অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। কিন্তু এখন সে কিছু বুঝতেও পারল না।

কোন রকমে নিবারণের ঘরের দাওয়ায় উঠেই অটবী মাটীর উপরেই অচেতন হয়ে পড়ে গেল। বোধ করি এতখানি নেশার মধ্যেও এটুকুন চেতনা তার ছিল যে হাটুরে মাতালদের মত পথে-ঘাটে পড়ে থাকা চলবে না। তাই মনের সমস্ত অবশিষ্ট শক্তিটুকু প্রয়োগ করে সে সীসার মত ভারী দেহটাকে এতদূর অবধি টেনে আনতে পেরেছে।

আজকে প্রকাশ্য জায়গায় পথ-চলতি অগুনতি লোকজনের সামনেই খেঁদীর মা তার সেবা করতে বসে গেল। খেঁদীকে দিয়ে বালিত বলাতি জল আনালো। সেই জল দিয়ে মাথা ধুইয়ে দিল ; তারপর মুখের ফেনা ধুইয়ে দিল ; তারপর শিয়রের কাছে বসে বাতাস করতে লাগল।

খানিক পরে অটবী একবার চোখ মেলে চাইতেই, খেঁদীর মা ব্যাগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'এখন এট্টুন্ ভাল বোধ হচ্ছে, ভাল মুনিষের পো ?'

'হু' বলে অটবী পাশ ফিরে শুল।

খেঁদীর মা উঠে গিয়ে এক গেলাস তেঁতুল-গোলা জল তৈরী করে নিয়ে এল।

'নক্ষীর মত চোখ বুজে এটুকুন খেয়ে ফেল দিনি।'

অটবী লক্ষ্মীর মতই চোখ বুজে জলটুকু নিঃশেষে পান করে ফেলল। তারপর সেই জায়গাতেই ভক্ ভক্ করে খানিক বমি করল। মাতাল মানুষের বমির তীব্র বিযাক্ত গন্ধে খেঁদী প্রভৃতির সে দলটি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিল, তারা সরে পড়ল। একমাত্র খেঁদীর মা ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে ভুতের মত বসে রইল।

কিন্তু বমিটা হয়ে যাওয়ায় অটবী একটু সুস্থ বোধ করল। এক সময় হঠাৎ খেঁদীর মার হাতখানা দু' হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল,' তোমার হাতখানা কী ঠাণ্ডা খেঁদীর মা।'

খেঁদীর মা জিজ্ঞেস করল, 'জীবনে অনেক দুক্ষু পেয়েছ, লয় ?'

'না, অনেক সুখ পেয়েছি।'

'তুমি যে মিছে কথা বলতেছ, তা জানি। মোরা গরীব দুক্খী নোক। গরীবের দুক্খু কেমন তা বুঝতে পারি।'

রাত প্রায় দশটার সময় নিবারণ ফিরে এসে ঘটনা শুনে বলল, 'তবে আর কালকেও 'গে' কাজ নেই দোস্ত। কালকে ভরা গণের মাছ এসবে বাজারে। যাওয়ার আগে কাকদ্বীপের বাজারটা একবার দেখে লাও। তা'পর পরশু যেওখুনি।'

নিবারণ খুব ব্যস্ত ছিল। কিছু মাছ আট্‌কিয়েছে; তাই নিয়ে তাকে এক্ষুনি কোলকাতা যেতে হবে। মাছ-টাছ প্যাক করা হয়ে গেছে। তার ফাঁকে চাট্টি খেয়েও নিতে হবে,—সে আর দাঁড়াল না।

পরদিন অনেক বেলায় তেঁতো বিস্বাদ মুখ নিয়ে, ভারী অবসন্ন দেহ নিয়ে অটবী ঘুম থেকে উঠল। তীব্র নেশার শেষ রেশটা এখনো মাথা থেকে কাটেনি। শরীরটা এখনো অল্প অল্প ঝিম্ ঝিম্ কোরছে।

দাওয়ায় এসে বসে অটবী মনে মনে হাসল। এরা তাকে একটা কেষ্ট বিষ্টু গোছের মানুষ বলে ভেবেছিল। সে সংসার ত্যাগ করে গোঁসাইয়ের থানে যাচ্ছে; কাজেই সে-ও একটা ছোটখাটো গোঁসাই। কালকের ঘটনায় এদের ভুল ভেঙে গিয়েছে। ওরা এবার বুঝতে পেরেছে, ও সেই গল্পের 'নীলবর্ণ শেয়াল' ছাড়া আর কিছুই নয়। সে একটা বেহদ্দ মাতাল; আর অমন করে মাতাল যারা হয় তারা যে নিতান্ত খারাপ লোক এ-বিষয়ে কি কারও মনে কোন সন্দেহ থাকে ?

তা এ একরকম মন্দ হল না। অটবী বাস্তবিক যা তারা আজ তাকে তাই বলে চিনতে পারবে। তারা এখন থেকে তাকে ঘৃণা করবে, অবজ্ঞা করবে। আর এই অবস্থাটাই অটবী ভাল বুঝতে পারে। ভালবাসা-টাসা জাতীয় ব্যাপারগুলো দেখলে সে আজকাল বড্ড অস্বাস্ত বোধ করে। ঘৃণা, অবিশ্বাস, প্রভৃতি জিনিষগুলো মানুষের জীবনে অনেক বেশী সহজ আর স্বাভাবিক। ভালবাসা-টাসাগুলো মনের সাময়িক বিকার মাত্র; ঘৃণা আর স্বার্থপরতা মানুষের স্থায়ী প্রকৃতি।

বাজারে যাওয়ার পথে খেঁদীর মা অটবীকে দেখতে পেয়ে ঘোমটাটা চোখ অবধি নামিয়ে দিল। চেনা মানুষকে দেখলে চেনা মানুষ যেমন করে হাসে, তেমনি করে হাসল। ও-হাসির অর্থ কি তা অটবা জানে। ও হাস বলছে, এতকাল আমাদের খুব ঠকিয়ে এসেছ দাদা। এবার তোমাকে চিনে ফেলেছি। তুমি আমাদের চেয়েও নীচু স্তরের জীব।

অটবী যে খুনী, ওরা কি তা-ও বুঝতে পারছে? কথাটা মনে হতেই কেমন একটা ঠাণ্ডা ভয়ের শিহরণ অটবীর সারা দেহে মনে খেলে গেল।

বাজারে মাছ বেচার কাজ শেষ করে খেঁদীর মা যখন ফিরে এল, তখনও অটবী ঘরের দাওয়ায় একই ভাবে বসে। ক'দিনের এই চিন্তাহীন আলস্যটা বেশ লাগছে অটবীর। তার জীবনে এমন সুযোগ আর জোটেনি কোনদিন।

অটবী বলল, 'আজ চলে যাচ্ছি খেঁদীর মা।'

কালকে মাতাল অটবীকে যত সহজে সেবা করেছে খেঁদীর মা, আজকে সুস্থ অটবীর সঙ্গে তত সহজে সে কথা বলতে পারল না। সঙ্গে খেঁদী রয়েছে। ঘোমটা টেনে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'বলে গিয়েছে, আজ তুমি গণের মাছ দেখবে। তা'পর কাল চলে যেও'খুনি।'

সন্ধ্যেবেলা অটবী বাজারে গিয়ে দেখল বাজারে মাছ ঢেলে পড়েছে।

সারা বাজারে যেন একেবারে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। নিবারণ আর খেঁদীর মা এ'কদিন মন্দার বাজারে যেন অবসন্নের মত ঝিমুচ্ছিল। আজ মাছ দেখে তাদের চোখ যেন আনন্দে নাচতে সুরু করল। তাদের চলা-ফেরা, কথার সুর পর্যন্ত যেন আজ বদলে গিয়েছে। এমন উত্তেজনা, যে তার মধ্যে অটবীর মত প্রিয় অতিথিও যেন আজ তুচ্ছ; তার সঙ্গে কথা বলার সময়ও আজ যেন নিবারণের নেই।

বাজারে ঢুকতেই যে আড়ৎটা পড়ে অটবী সেখানে গিয়ে দেখল যে লোকে লোকারণ্য। পাইকার, বেপারী, মাঝি, কুলি এবং সর্বোপরি অলস দর্শকদের ভীড়ে জায়গাটা গম্‌গম্ কোরছে। ওজোনের কাঁটায় অনবরত ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ কুলিরা টেনে তুলছে আর নাবাচ্ছে। আর একপাশে দাঁড়িয়ে কয়াল তাড়স্বরে

মাছের নিলামের সর্বোচ্চ দর ঘোষণা করে চলেছে। গদি-বিছানো চৌকীর উপর বসে আড়তের চশমা-আঁটা মালিক তাঁর তেল কুচ্‌কুচে লোভী মুখখানা কেবল চারদিকে ঘোরাচ্ছেন। এ-অঞ্চলের মধ্যে তিনি একজন বড় আড়ৎদার।

এত কাঁড়ি কাঁড়ি মাছের মধ্যেও, মানুষের ঠাসাঠাসি ভীড়ের মধ্যেও, মালিকের হরিণ-চক্ষু একটা কুকীর্তি আবিষ্কার করে ফেলল। নিজের জায়গাটা ছেড়ে তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন এবং তাঁতের ধুতিখানার কোঁচা দিয়ে রাস্তার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে একেবারে ঘরের দেওয়ালের একটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণে এসে পড়লেন। সেখানে একখানা শালপাতায় জড়ানো গোটা চারেক ছোট আকারের ভেট্‌কী মাছ পড়েছিল।

মালিক গর্জন করে উঠলেন, 'এ মাছ এখানে কে রেখেছে?'

হঠাৎ কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গেল। কথা বলতে বলতে লোকজন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।

ভীড়ের ভিতর থেকে কে উত্তর দিল, 'আজ্ঞে বাবু, আমি দেখেছি, বিপনে রেখেছে।'

বিপিনের দুর্ভাগ্য, সে কাছেই দাঁড়িয়েছিল। মালিক তৎক্ষণাৎ পায়ের একপাটি জুতো হাতে করে তুলে নিয়ে বিপিনের গালে মাথায় পিঠে যত্রতত্র আঘাত দিতে দিতে শুধু বললেন, 'শালার বেটা শালা, আমার চোখের উপরে চুরি করিস্? এতবড় সাহস?'

বিপিন, অতবড় বয়স্ক মানুষটা, একেবারে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মালিকের পা জড়িয়ে ধরল। বলল, 'বাবু, আমি চুরি করিনি; আমার কোন দোষ নেই।'

যে-মানুষ এত সহজে পা ধরতে পারে, তার প্রতি অটবীর বিশেষ মহানুভূতি জাগে না। তবু নিছক সেই জাঁদরেল আড়ৎদারটির প্রতি তীব্র ঘৃণা বসতঃই অটবী এগিয়ে গেল বিপিনের সাহায্যে।

বলল, 'বাবু, আপনি ভুল করে মারছেন। মাছ বিপিন চুরি করেনি, মাছটা ওকে মাঝি দিয়েছে খাবার মাছ হিসাবে।'

ভেটকী মাছ এনেছিল যে মাঝিটা সে তখনও দাঁড়িয়েছিল। কথাটা মিথ্যা হলেও সে অস্বীকার করল না।

রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত মাছের নিলাম চলল। তারপর রাত বারোটার মধ্যে সেই মাছ বরফ-যুক্ত হয়ে দু'তিনখানা লড়ি বোঝাই হয়ে রওয়ানা হল কোলকাতার উদ্দেশ্যে। সব মাছ উঠে গেলে দেখা গেল একজন আধা-ভদ্রলোক-গোছের উদ্বাস্তু তার মন দেড়েক মাছ নিয়ে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। কোন লড়িতে সে তার মাছটা তুলে দিতে পারে নি। অথচ মাছটা আজই কোলকাতা না পৌঁছাতে পারলে কাঁচা মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। লোকটা চারদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল।

শেষটায় সেই বিপিন নামের কুলিটি এগিয়ে গিয়ে বলল, 'বাবু, মোটর ষ্ট্যাণ্ডে মাছ নে' যান। ওখানে লড়ি পেয়ে যাবেন।'

লোকটি তাই করল। বিপিন এবং আর একজন কুলির মাথায় মালটা চাপিয়ে সে ষ্ট্যাণ্ডের দিকে রওয়ানা দিল।

অটবীরও আর কোন কাজ ছিল না। নিবারণ মাছ নিয়ে লাড়তে উঠে চলে গিয়েছে। সে-ও ওদের সঙ্গে ফিরল। ষ্ট্যাণ্ডে যাওয়ার রাস্তার উপরেই তার, অর্থাৎ নিবারণের বাড়ী।

পথের মধ্যে বিপিন এবং তার সঙ্গী অত্যন্ত ভার লাগছে বলে বোঝা দুটো নামালো। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বাবু, মজুরী কত দেবেন?'

'সে তো বাঁধা রেটই আছে তোমাদের। ঝুড়ি-পিছু ছ'আনা।'

'আজ্ঞে না, রেট-ফেট কিছু নেইকো। যার সঙ্গে যেমন কথা বার্তা ঠিক হয় তাই রেট। মোদেরকে দু'টাকা করে দিতে হবে বোঝা পিছু।'

অসহায় লোকটি একেবারে অধীর হয়ে উঠল। বলল, 'সে কি বলছ গো? এই সামান্য মাছের জন্য যদি কুলি ভাড়াই দু'টাকা দিতে হয়, তবে কারবার করব কি করে? লড়িগুলো তো মন-পিছু দু'টাকা নেয়, কোলকাতা পৌঁছে দিতে!'

বিপিন গোঁ ধরে বলল, 'ওর কমে হবে না বাবু। বুঝে দেখুন। তা বুঝে মালে হাত দোব।'

লোকটি অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল। আড়ৎ অনেকটা পিছনে পড়ে গিয়েছে। এখান থেকে হাঁক দিয়ে কোন লোক ডাকা যাবে না সেখানে গিয়ে অন্য কুলি যে ডাকবে, তাও—একা মানুষ—মাছ ফেলে রেখে যেতে পারছে না। অটবীর দিকে তাকালো লোকটা করুণভাবে।

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় অটবী গিয়ে বিপিনের টুঁটি টিপে ধরল। কিন্তু পরক্ষণেই বিপিনকে ছেড়ে দিয়ে অপ্রতিভভাবে বলল, 'না—না—কিছু না।'

তারপর লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি যে-ভাবে পারেন ওর সঙ্গে মিটমাট করে নিন। পরের ব্যাপারে আমি নাক গলাতে যাবনি বাবু।'

কি হয় না হয় দেখার জন্য অপেক্ষা না করেই অটবী বাড়ী ফিরল। মনে মনে হাসল একটু। তারই ভুল হচ্ছিল—বিপিন তো ঠিকই করেছে। আড়ৎদার শক্ত লোক; সে তার পায়ে ধরেছে। এ-কারবারীটা দুর্বল, অসহায়। বিপিন ঘাড় মুচড়ে তার থেকে দু' আনার জায়গায় দু' টাকা আদায় করবে। এই সাংঘাতিক দুনিয়ায় বেঁচে থাকার এ-ও তো একটা পথ। অটবী কোন পথই পায় নি; তাই পালিয়ে যাচ্ছে সংসার ছেড়ে।

নিবারণের বাড়ী এখন নিঝ্‌ঝুম। নিবারণ কোলকাতা চলে গিয়েছে মাছ নিয়ে। খেঁদীর মা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও আলো নেই, শুধু অটবীর জন্য নির্দিষ্ট ঘরটায় টিম্‌ টিম্‌ করে একটা লম্ফের আলো জ্বলছে।

ঘরে ঢুকে দেখল, তার জন্য যত্ন করে ঝুড়ি দিয়ে ভাত ঢাকা রয়েছে। ভাত খেয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে সে-ও শুয়ে পড়ল তৈরী বিছানার উপর।

এই বিছানায়, এই কাকদ্বীপে, আজ রাত্রেই তার শেষ শোয়া। কাল সে চলে যাচ্ছে অনেক দূরে। সে আর কোনদিন দেখতে আসবে না, একজন খেঁদীর মা কী করে স্বামীর সন্দেহ দৃষ্টি সহ্য করে দিন কাটাচ্ছে, বা একজন বিপিন কি করে অসহায় লোকদের ফাঁদে ফেলে বেশী পয়সা আদায় কোরছে। বেতুই গাঁয়ে, কালকেপুরে, মনসাপোতায়, তাদের জাতের হাজার হাজার লোক হাজার হাজার বিকৃত উপায়ে কোনরকমে বেঁচে থাকার পথ করে নেবে।

শুধু অটবী থাকবে না তাদের মধ্যে। গোঁসাই-এর থানে কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিতে পারলে নায়েব-খুনের কথাটা সকলে ভুলে যাবে। সে নিজেও ভুলে যেতে পারবে না কি? তারপর হয়তো কোন সময়ে ক্বচিৎ কখনো অটবীর নাম কথায় কথায় এসে পড়লে সকলে বলবে, অটবী বড় ভাল লোক ছিল,—তাদের মত পাপী-তাপী ছিল না। তাইতো সে ভগবানের কৃপা লাভ করেছে।

বাতাস আসবে বলে দরজা খোলা রেখে শুয়েছিল অটবী। খোলা দরজা দিয়ে কে ঘরে ঢুকে তার কপালে হাত রাখল। একটু ঘুমের ভাব এসেছিল; অটবী তাই চমকে উঠল। কিন্তু না, চমকে ওঠার কিছু নেই; এ হাতের স্পর্শ অটবীর চেনা।

'খেঁদীর মা?'

'চুপ। আস্তে। বাচ্চাগুলো ঘুইমে আছে,—জেগে উঠলে ওকে থাকবেনি। তুমি কালকে চলে যাচ্ছ। আর তো কথা বলতে পারবনি। তাই এলাম।'

খেঁদীর মার হাতখানা নিজের দু'হাতের মধ্যে নিয়ে অটবী আবেগ ভরে চাপ দিল। তার জীবনে এই শেষবার সে মেয়েমানুষের স্পর্শ লাভ করছে।

'কেন এস্‌বেনি, খেঁদীর মা? মোর কাছে এস্‌তে যদি তোর ভাল নাগে, তবে এস্‌তে দোষ কি?'

'আমিও তাই ভাবলাম। এমনিতে কক্ষনো এস্‌তে পারতুমনি। তুমি গোঁসাই-এর থানে যাচ্ছ,—তুমি কত উঁচু নোক,—বাবুদের মত উঁচু। কিন্তুক কালকে দেখলাম, তুমি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এলে। ত্যাখন মনে হল, তুমি খুব ভাল নোক, কিন্তুক মোদের মতই সামান্যি মুনিষ্যি।'

হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে খুজে নিয়ে খেঁদীর মার নরম ঠাণ্ডা বাহুমূলে জোরে চাপ দিল অটবী। আর এইটুকুন আদরেই খেঁদীর মার চাপা খুশীর হাসি শুনতে পাওয়া গেল। ওর মুখের খুব কাছে তার মুখখানা। ওর চুলের জমাট-বাঁধা আঁশ্‌টে গন্ধ নাকে ভেসে আসছে।

এতরাত্রে একটি পরপুরুষের ঘরে একটি মেয়েমানুষ কেন আসে অটবী তা জানে। এতে দোষের কী আছে? নিবারণ তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে এ-বাড়ীতে জায়গা দিয়েছে। সে সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত লোক, নিজের আত্মীয়স্বজনকে পর্যন্ত নাকি বাড়ীতে একা থাকতে দেয়নি। অথচ কী যে হয়েছে নিবারণের মনে ;—সে অনায়াসে একজন খুনীকে বিশ্বাস করে স্ত্রীর সঙ্গে একবাড়ীতে রেখে রোজ কোলকাতা যাচ্ছে। কাজেই, তার বাড়ীতে থেকে, তার ভাত খেয়ে, তারই বৌকে ফুঁসলিয়ে নেওয়া,—এইটেই অটবীর পক্ষে খুব স্বাভাবিক কাজ। এ পৃথিবীতে এমন ঘটনাই সাধারণতঃ ঘটে থাকে। যে একটি মানুষকে খুন করেছে সে এমন কাজ করবে না তো কে করবে?

অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে হাসল অটবী। বলল, 'খেঁদীর মা, একটু বোস। আমি এক্ষুণি আসছি।'

বাইরে বেরিয়ে এসে অটবী দেখল, একখানা আঁকশী ঘরের চালার উপর হেলান দিয়ে রয়েছে। কী যে অটবীর খেয়াল হল, সে আঁকশাটাকে একটু নাড়া দিয়ে দিল। টালীর ছাদের স্তরে স্তরে শিহরণ তুলে আঁকশীটা মাটীতে গড়িয়ে পড়ল ধপাস্ করে।

ও-ঘরে খেঁদী জেগে উঠে 'মা মা' করে কঁকিয়ে উঠল।

অটবী ঘরে এলে খেঁদীর মা বলল, 'কিসের শব্দ হল গো?'

'কী জানি। তোব মেয়ে জেগে উঠেছে।'

খেঁদীর মা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। তার মুখ যে কতখানি করুণ হয়ে উঠল, অন্ধকারে তা দেখা গেল না। অটবী তাকে আলগোছে ধরে তুলল। তারপর দু'হাত দিয়ে তার দু'হাত চেপে ধরল।

'তোর কথা মোর চেরকাল মনে থাকবে খেঁদীর মা।'

পরদিন সকালে বিপিন এসে উপস্থিত।

'অটবীদা, তোমার জন্যে কাজ ঠিক করে এইচি। বেপারীর নৌকোয় যেতে হবে আজ ও-বেলায়। তেইরী থেকো।'

এসেই কালকের উপকারের প্রতিদান। সবাই অটবীকে খাতির করার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন?

অটবী বলল, ‘খুশী হলাম বিপিন। কিন্তু আমি ও-বেলা গোঁসাই-এর থানে চলে যাচ্ছি।’

বিপিন মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল।

বিকেলবেলা অটবীকে বাজার অবধি এগিয়ে দিয়ে গেল নিবারণ। যেতে যেতে মনটা ভারী খারাপ লাগল অটবীর। মনে পড়ল খেঁদীর মার কথা, এবং আরও দূরের বেতুই গাঁর কথা। তবু মনে হল না সে ফিরে যায়। যে-মানুষ মিথ্যেমিথ্যি একটা খুন করেছে, সে-মানুষ কোন্ যুক্তিতে ফিরে যাবে? আর তার ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশায় কে-ই-বা বসে আছে!

নদীর ঘাটে এসে দেখল, খেয়া-নৌকা হেলে-দুলে রওয়ানা দিয়েছে ওপাড়ের পথে। কী ঝঞ্ঝাট! নৌকার এখন ও-পাড় হয়ে ফিরে আসতে অন্ততঃ দু’ঘণ্টা দেরী। ঘাটে আরও দু’একখানা জেলে-নৌকো বাঁধা রয়েছে বটে, কিন্তু, অটবী জানে, তারা কেরায়া নেবে না।

এমন সময় একখানা নৌকো থেকে কে ডাকল, ‘অটবীদা।’

অটবী তাকিয়ে দেখল, বিপিন পাটাতনের উপর বসে।

‘তোমার জন্য অপেক্ষে কত্তেছি অটবীদা। চলে এস।’

বিপিনের আহ্বান না শুনে এখন উপায় কী? খেয়ার প্রত্যাশায় পুরো দুটি ঘণ্টা এখন ঘাটের উপর একা একা বসে থাকবে কে? এ-সবই ভাগ্যের খেলা। অটবীর যাওয়ার পথে ভাগ্যই বারবার করে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে।

তিনদিনের দিন সকালবেলা বেপারীর নৌকায় অটবী আবার ফিরে এল। আবার এসে উঠল নিবারণের ঘরে।

অটবীকে দেখে নিবারণ অবাক হল। খবর শুনে বলল, ‘তোমার মনের আকিংখে এখনো যায়নি দোস্ত। তাই বারবার বাধা পড়তেছে। ভগমান তোমাকে টেনেও টান্তেছেন না। তুমি আর দিন কতক সমসারে থেকে যাও ভাই।’

এমন-কিছু রাগের কথা নয়। কিন্তু অটবী রেগে গেল।

‘এমন কথাটা মোকে বললে?’

'খারাপ কথা বল্‌লাম ?

'এমন খারাপই-বা কী ? বারবার তোমার ঘরে এস্‌তেছি, বিরক্ত কত্তেছি !—তা দুটো কথা শুনাবেই তো !'

নিবারণ অবাক হয়ে বলল, 'তুমি মোকে বিরক্ত কত্তেছ—কখন বললাম ? তোমার মাথার ঠিক নেই দোস্ত।'

'তা হবে।'

বলে রাগে গড়গড় করতে করতে অটবী বেরিয়ে গেল। রাগটা তাজা থাকতে থাকতে সাত তাড়াতাড়ি গিয়ে নিবারণের ঠিক পাশের বাড়ীর একখানা ঘর ভাড়া করে ফেলল।

বেশ গঞ্জ জায়গা হয়ে উঠেছে কাকদ্বীপ। পয়সাওয়ালা লোকেরা চারদিকে বাড়ী-ঘর তুলছে ভাড়া পাওয়ার লোভে। নিবারণের পাশের বাড়ীটাও ভাড়া দেওয়ার জন্য তৈরী। অটবী যখন প্রথম আসে, তখনও বাড়ীটা তৈরী হচ্ছে। সামনের বড় ঘরখানা ঠিক নিবারণের ঘরের মত, তিন-কোঠাওয়ালা। পিছনে একটু তফাতে বাড়ীওলা ছোট আর একখানা ঘর করিয়েছে দরকার মত নিজে থাকতে পারবে বলে। তা অটবী নিতে পারে ঘরখানা দু-এক মাসের জন্য।

নিবারণের কাছে ফিরে এসে বলল, 'ঘর ভাড়া লিলাম একখানা, দোস্ত।'

নিবারণ দুঃখিত হল।

'মিছিমিছি মোর উপর আগ করে ঘর ভাড়া করলে ? কেন, মোর ঘরে কি জায়গা হতনি ?'

অটবী বুঝিয়ে বলল, 'আগ করে লয়। ভেবে দেখলাম, তোমার কথাটা ঠিক। মোর মনটা তেইরী হয়নি। তাই দিন কতক থাকব এখানে নিরিবিলিতে। একটা কাজকম্মের চেষ্টা দেখ,—খেতে হবে তো !'

সেদিনটা গেল ; তারপর দিন রাত্রে নিবারণও গেল মাছের বোঝা নিয়ে কোলকাতার পথে, আর তার পিছনে পিননে খেঁদীর মা-ও এসে উঠল অটবীর ঘরে। অটবী লম্ফ জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছিল তার জন্য।

এমনি করে একটি সামান্য দুঃখিনী কুরূপা মেয়ের আকর্ষণে অটবী ছ'মাস রয়ে গেল কাকদ্বীপে। মিছিমিছি একটি খুন করার দারুণ আত্মগ্লানিতে এবং জীবনের প্রতি ধিক্কারে সে সংসার ত্যাগ করবে বলে ঠিক করেছিল। বাদ সাধল একটি কুরূপা মেয়েমানুষ।

ছ'মাস ধরে মেয়েটি স্নেহ সিঞ্চন করে করে তার মনকে সুস্থ করে তুলল। তখন সে নিজের মনের কাছে স্বীকার করল, মানুষ মানুষকে শুধুই ঘৃণা করে না, শুধুই মানুষ নিজের স্বার্থ দেখে না; মানুষ মানুষকে ভালও বাসে।

এবং তারপর খেঁদীর মার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কটার জন্য তার মনে ভয় দেখা দিল। যেদিনই নিবারণ বাড়ীতে থাকে না সেদিনই রাত্রের আঁধারে লুকিয়ে পরের বৌ তার ঘরে আসছে, তবু ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় এতদিন তার ছিল না। ধরা যদি পড়ে তো পড়বে; তাতে তার ভারী বয়ে যাবে! সে নিবারণের খায় না, পরে না, বা তার বাড়ীতে থাকেও না। কাজেই বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ তো তার বিরুদ্ধে কেউ আনতে পারবে না।

এখন ভাবল, নিবারণ তার বন্ধু তো বটে। বন্ধুর বৌ-য়ের সঙ্গে গোপনে প্রেম করাটা কি ভাল? ধরা পড়ে গেলে তাদের সংসারটা হয়তো ভেঙ্গে যাবে। অটবী কি তখন খেঁদীর মার দায়িত্ব নিতে পারবে?

কি করে পারবে? খেঁদীর মার ভিতর দিয়ে সে যে রাধাকে চিনতে পেরেছে। এমন-কি অপরাধ করেছে রাধা যার জন্য তাকে সে ত্যাগ করবে? রাধা এখনো একা আছে কিনা তার তো খোঁজ করে দেখা উচিত।

কিন্তু খেঁদীর মার কাছে সে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ বলেই তাকে একদিন এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে গোপনে, কাউকে না জানিয়ে, কাউকে কিছু না বলে।

অটবী যখন এই রকম ভাবছিল, তখন একদিন সুযোগও জুটে গেল। কোলকাতার বাজার থেকে নিবারণ খবর নিয়ে এল, বৈঁতুই গাঁয়ে নাকি একটা বড় রকমের দাঙ্গা হয়ে গেছে। আগ্রহে, উদ্বেগে অধীর হয়ে সেদিন শেষরাত্রেই অটবী রওয়ানা হ'ল দেশের মাটীর উদ্দেশ্যে। যেমন ভেবে রেখেছিল, কাউকে কিছু বলল না, কাউকে ইঙ্গিতেও কিছু বুঝতে দিল না।

ডায়মণ্ডহারবারে সাতটার গাড়ী ধরল। মনে হ'ল, গাড়ীটা যেন বড্ড আস্তে চলছে। তার মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারছে না। সেদিন মনে হয়েছিল বেঁতুই গাঁ একটা জঙ্গল, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ওঁছা জঙ্গল। আজকে ফেরার পথে মনে হচ্ছে, বেতুই গাঁ তার জন্মভূমি, তার বত্রিশ নাড়ীর সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা।

বেতুই গাঁ-এর লোকগুলোর ছবি এক এক করে চোখের সামনে ভেসে উঠল! তাদের কাঁরও প্রতিই অটবী হয়তো সুবিচার করেনি। বলরাম আর নিতাই আর নবীন, এরা সবাই চিরকাল তার বিরুদ্ধে অন্যায় করে শত্রুতা করেছে, এতটা হয়তো সেদিন সে না ভাবলেও পারত। সে নিজেই কি তাদের বিরুদ্ধে কম অন্যায় করেছে? এমন কে আছে যার প্রতি সে অন্যায় করেনি? নিজের ভাগনে নিধু আর ভাগনে-বৌ গোপা,—সে একটু চেষ্টা করলেই তাদের মধ্যেকার ভুল-বোঝাবুঝিটা নিবারণ করতে পারত,—করেছিল কি সে-চেষ্টা? রাধার কথা তো না বলাই ভাল। রাধার প্রতি সে যা খারাপ ব্যবহার করেছে, একেবারে পায়ের জুতো হলে তবেই কোন বৌ-এর পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব ছিল। রাধা ছিল তেজী মেয়ে, তাই সইতে না পেরে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর পরী? না, পরীকেও সে আর দোষ দিতে পারে না। পরীকে মানব-কন্যা ভেবে সে তার উপর লোভ করেছিল। কিন্তু পরীতো মানব-কন্যা নয়, দেব-কন্যা। অত অত্যাচারী স্বামী, কিন্তু বড় ঘরের মেয়েদের মতই অচলা তার পতি-ভক্তি। তাই তো সে অটবীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

আজকে বড়বাবুর ঘরে সে কত দুঃখে আছে কে জানে! একটা ছবি দেখেছিল, কোথায় মনে নেই,—অশোক গাছের তলায় রুক্ষকেশা সীতা দাঁড়িয়ে,—অনাহারে, অত্যাচারে মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তবু কী আভা! যদি কেউ আজ পরীকে দেখতে পায় তো সে-ও পরীর ঠিক ঐ রকম চেহারাই দেখতে পাবে।

সকালবেলার ট্রেনে একটা জানলার পাশে বসেছিল অটবী। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগছিল সারা মুখে, আর তার উষ্ণ স্নায়ু-মণ্ডলের উপর একটা শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছিল। এই ঠাণ্ডাটুকু তারী ভাল লাগল

অটবীর। কোন কোমল, তুলোর মত নরম আর সুগন্ধযুক্ত কোন যুবতী নারীর চুলের স্পর্শ যেন।

চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল চাষের মাঠ আর মাঠ,—তাতে হেমন্তের আধ-পাকা ফসলের সমারোহ। আর রয়েছে গাছ; কোথাও একটা গাছ অটবীর মতই একা নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বা গাছের প্রাচুর্য জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। মাঝে মাঝে দু'একখানা গ্রামও চোখে পড়ছে। যা কিছু অটবীর দৃষ্টিতে পড়ছে, তার মধ্যেই অটবী মানুষের হাতের ছাপ দেখতে পাচ্ছে। বাংলা মায়ের এই নয়ন-জুড়ানো শ্যামলিমা,—এর সবটাই মানুষের সৃষ্টি। মানুষের হাতের ছোঁয়া পেয়েই প্রকৃতির এই আশ্চর্য প্রফুল্লতা। সেই মানুষের সমাজ ছেড়ে অটবী কোথায় দূরে সরে যেতে চেয়েছিল!

খানিক দূরে একটু ছায়ায়-ঢাকা গ্রাম অনেকক্ষণ পর্যন্ত গাড়ীখানার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে পিছিয়ে পড়ল। বেতুই-গাঁয়ের অনতিদূরের কোন চলন্ত ট্রেন থেকে বেতুই-গাঁকেও ঠিক এমনি করে ছুটে চলতে দেখা যেত। লক্ষ লক্ষ গ্রামের মধ্যে একখানি গ্রাম বেতুই-গাঁ। সেই হত-দরিদ্র গ্রামখানির ধুলোর মধ্যে অটবীর মন হারিয়ে গেছে।

মাটী নাকি মানুষের মা। অভিমান করে দামাল ছেলে অটবী মাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আজ আবার মায়ের ডাক কানে এসে পৌঁছুচ্ছে; অটবী ফিরে চলেছে। সেই মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে আবার কি অটবী নিজের ভাঙ্গা সংসার, ভাঙ্গা মনকে নতুন করে মেরামত করে নিতে পারবে না? সেখানকার মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কটাকে সে বিষাক্ত করে রেখে এসেছিল। তাকে কি আবার সুন্দর করে গড়ে তোলা যাবে না? নিবারণ, নবীন, নিধু, রাধা,—তারা কি তাকে পূর্ণ মনে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে? না কি পুরোনো দিনের কথা মনে করে মুখ গোমড়া করে বসে থাকবে?

আঠারো

কিষ্টবাবুর কালীদহের ভেড়ীর পাশেই কালাচাঁদবাবুর মরেলডাঙ্গার ভেড়ী। এতকাল নিজেই চাষ করে এসেছেন ভেড়ীটা; সম্প্রতি নোনা অঞ্চলের দিকে নজর বেশী দেওয়ায় এ-ভেড়ীটা ইজারা দিয়েছেন নটবরবাবুকে এই ভেড়ীটা নিয়েই একদিন বিরোধ ঘনিয়ে উঠল।

বেতুই গাঁ-এর একটি আট দশ বছরের ন্যাংটা ছেলে স্বষ্যি একটা বড়শি নিয়ে জাওলা মাছ ধরছিল মরেলডাঙ্গায়। ভেড়ীর এক ভোজপুরী দারোয়ান দেখতে পেয়ে বীর বিক্রমে এগিয়ে এল। একটা মেটে হাঁড়িতে যে কটা মাছ ধরা ছিল সে হাঁড়ি উলিটয়ে তা জলে ফেলে দিল। বড়শিটা কেড়ে নিয়ে ভেঙে তিন টুকরো করে ফেলল। তাতেও খুশী না হয়ে সে স্বষ্যিকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল জলের ভিতর দিকে।

'শালা, আজ তোকে জলে চুবিয়ে মারব। একশো দিন 'নশেধ করি শুনিস্‌নি!'

ঠিক সেই সময়ে সেই বাঁধ দিয়ে যাচ্ছিল বিন্দু। খদ্দেরকে দেওয়ার জন্ম মাথায় এক ঝুঁড়ি পোড়া রেলের কয়লা নিয়ে চলেছিল। স্বষ্যির চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে তাকিয়ে দেখল ব্যাপারটা। তাদেরই গাঁয়ের ছেলে, স্বষ্যি না হয়ে ওতো লক্ষ্মীও হতে পারত কার্তিকও হতে পারত! আত্মরক্ষার তাগিদে মরীয়া হয়ে সে একাই মাথার ঝুঁড়ি নামিয়ে ফেলে ভাঙা বড়শির মোটা টুক্‌রোটা নিয়ে জলে নেমে দারোয়ানের পিঠের উপর মারতে লাগল প্রাণপণ শক্তিতে। তা কাঁচা কঞ্চির দেহ-ভংগী নধর-কান্তি হলেও তার আঘাত মেয়েমানুষের হাতের মত নরম নয়। দারোয়ান ঘাড় বেঁকিয়ে বিন্দুকে দেখে দু'একবার বললও, 'এই মাগী, ফাঁদ না দেখবি তো পালা।' কিন্তু কে আর তার কথায় কান দিচ্ছে। ভিজে হাত বলে এক হাতে স্বষ্যিকে ধরে রেখে আর এক হাতে বিন্দুকে ঠেকানোর চেষ্টা করেও পারল না। অগত্যা দারোয়ানজী স্বষ্যিকে ছেড়ে দিয়ে বিন্দুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

'তবে রে মাগী !'

কিন্তু মুখের কথা শেষ না হতেই পিছন থেকে স্থয্যি এমন এক ধাক্কা মারল যে দারোয়ান টাল সামলাতে না পেরে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল হোগলা-পচা জলের মধ্যে।

স্থয্যি আর বিন্দু হাসতে হাসতে হাসতে বাঁধে উঠে এল। বিন্দু ঝুড়ির থেকে কয়লার টুক্‌রো নিয়ে ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলল, 'আয় না ইদিগে, কত বড় মরদ দেখি !'

দারোয়ান নাক দিয়ে মুখ দিয়ে বেশ খানিকটা জল খেযে নিয়েছে। বন-জঙ্গলের বুনো মেয়েমানুষের পাল্লার মধ্যে যাওয়াটা সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করল না। জলের মধ্যে হোগলার বনের ভিতব দিয়ে ছুটল।

কিন্তু ভেড়ীর চার চার জন বিশালাকায় ভোজপুরী দারোয়ানের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। পানু ফিরছিল বাড়ীর দিকে বাঁধ ধরে। তারা তাকে ধরে বেধরক মার-পিট করে গায়ের ঝাল মেটালো।

এরপর স্বভাবত ই গাঁয়ের লোকেরা ধরে নিল মরেলডাঙ্গার ওরা তাদের গাঁযের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তখন গাঁযের সবাই কাজকর্ম সেরে ফিরে এসেছে। বলরামকেও ডাকিয়ে আনা হ'ল তার কর্মস্থান থেকে।

সমস্ত শুনে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলরাম বলল, 'ওদের অত বাড় বাড়তে দেওযা চল্‌বেনি। এর পিতিকার করতে হবে। জাওলা মাছ ভগমানের দেওযা মাছ—পয়সা দে' চারা ফেলে তেইরী করা মাছ লয। ভগমান তার গায়ে নিখে দেননি, বাবা সকল, এ মাছটা অমুকের। তবু মোরা সব মাছ লুটেপুটে খেতে যাচ্ছিনি। কিন্তুক মোদের ছেলে-ছোকরারা যদি দুটো একটা মাছ বড়শিতে ধরে তো তাতে বাধা দেওয়া চল্‌বেনি।'

নবীন বলরামকে জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, 'বলাদা' তুমি আছ মোদের মাথা। মোদের ভাবনা কি ?'

বলরামকে ঘরের দিকে ধেয়ে আসতে দেখে বিন্দুর বুক শুকিয়ে গেল। খবর পেয়ে কর্তা নিশ্চয়ই আগুন হয়ে ছুটে আসবে, এবার প্রবল বেগে বিক্রম প্রকাশ হবে। বলরাম কাছে আসতেই আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে হাত তুলে বলল,

তা মোর দোষটা কি? গাঁয়ের ছেলেটাকে মারছে দেখে মুই কি পেইলে এসব?'

বলরাম কাছে এসে বিন্দুর গালে আদর করে ঠোকনা দিয়ে বলল, 'সাবাস্ মাগী! কুকুরকে ঠ্যাঙা মেরেছিস্, ঠিক করেছিস্ দেখতেছি, তুই-ই মোর মান রাখলি। তোর শুক্‌নো হাড়গুলোর মধ্যে জিনিষ আছে। তুই মোর যুগ্যি বৌ।'

বিন্দু হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। সে জানত, সুখ, আনন্দ এ-কথা শুধু রূপকথাতেই শোনা যায়। কে জানত যে মানুষের জীবনেও তা আছে আর এত সহজে তা পাওয়া যায়—স্বামীর একটি মিষ্টি কথাতেই। সারা দিনের মধ্যে নানান বাড়তি কাজের ভীড়ে বিন্দু তার নিয়ম-বাঁধা জীবনে এই একটুখানি নিয়মের ব্যতিক্রম রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে লাগল।

দুপুরবেলা মরেলডাঙ্গার ভেড়ীতে পনেরো-বিশ জন কর্মচারীর মধ্যে অধিকাংশই একটু আধটু বিশ্রামের আয়োজন করে নিয়েছে। কেবল জন ছয় সাত হতভাগ্য কর্মচারী ম্যানেজারের হুকুমে আশ্বিনের মেঘ-ভাঙা হুল-ফোটানো রোদের মধ্যে বাঁধে বাঁধে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। পাঁচশো বিঘা ভেড়ীর বিস্তীর্ণ বাঁধের উপর এই ক'জন লোকের চোখ রাখা সম্ভব নয় আর অতখানি গরজও কারও ছিল না। তারা তো আর জানতো না বর্ষার জলে পরিপুষ্ট হোগল বনের মধ্যে তাদের আপ্যায়িত করার জন্য বন্ধুরা গোপনে এসে অপেক্ষা করছে। হাওয়ায় হোগলা বন একটুখানি দুলল কি দুলল না তা তারা লক্ষ্যও করল না। কিন্তু সেই হাওয়াই হঠাৎ মানুষের রূপ ধরে তাদের ঘাড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের বন্দুক শরকী প্রভৃতি আত্মরক্ষার অস্ত্রগুলো সব রয়েছে আলা ঘরে। হাত আটকা ছিল লাঠিতে। সেই লাঠি কেড়ে নিয়েই আক্রমণকারীরা তাদের পিটুনি দিল। পানুকে যারা মেরেছিল তাদের দু'জনকে পাওয়া গেল টহলদারদের মধ্যে। আর দু'জন ছিল এক ছপ্পরে শুয়ে। কোন্ ছপ্পরে তারা থাকে তা অবিশ্যি আগেই জানা ছিল। তাদের ছপ্পর থেকে টেনে বের করে এনে মার দেওয়া হল। বেছে বেছে শুধু এই চারজনকে মাত্রা বজায় রেখে মার লাগিয়ে পানুকে মারার প্রতিশোধ

নিয়ে * আক্রমণকারীরা সরে পড়ল। চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে সাহায্যকারী বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে এল। ততক্ষণে আক্রমণকারীরা যার যার ঘরে গিয়ে বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছে।

এই গোটা পরিকল্পনাটাই ছিল বলরামের। তার মনের সম্পূর্ণ সায় আছে এমন একটা কাজ পেয়ে বলরাম যেন বেঁচে গিয়েছে। গ্রামবাসীদের সাধারণ উত্তেজনার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিতে পেরে বলরামের মনে হল তার বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে। দিনের পর দিন নিজের নিঃসঙ্গতার অন্তঃপুরে থেকে থেকে সে যেন বুড়িয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখল, না, সে তো বুড়ো হয়নি, সে তো এখনো পুরোদস্তুর যুবক। কী যে ভাল লাগল, কী যে বিস্ময় বোধ হল !

দশ বছর আগের বলরামকে ফিরে পেয়ে গাঁয়ের লোকেরাও কম অবাক হল না। তারা তো আর জানে না কত ঝড় বলরামের মনের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে !

নবীন বলরামের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, 'বলাদা, স্বীকার কত্তেছি, তুমি মোদের গুরু হওয়ার যুগ্যি।'

বলরাম খুসী হয়ে হাসল।

'কিন্তুক্ দ্যাখ্ ছোঁড়ার দল, এখনো মোরা অ্যানেক জলের তলে। মনে রাখিস্ কথাটা। যুদ্ধু লাগলে শেষ সাম্‌লানোই আসল সাম্‌লানো।'

দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপারে বলরামের অভিজ্ঞতা প্রচুর। প্রখর দূরদৃষ্টির সঙ্গে সে তার সৈন্যবাহিনীকে রাতের জন্য তৈরী করল। বেতুই গাঁয়ে ঢোকার তিনটি পথ, তিনটি পথেই সে সুবিধাজনক স্থানে দু'জন করে পাহারাদার মোতায়েন করল। পালা করে পাহারাদার বদ্‌লানোর আয়োজনও ঠিক হল। সন্দেহজনক কিছু দেখলে তারা হুইস্‌ল্ বাজিয়ে গাঁয়ের লোকদের সতর্ক করে দেবে। এদিকে গাঁয়ের মেয়েছেলেরা যার যার ঘরে থাকবে বটে, কিন্তু পুরুষেরা সব একবাড়ীতে জড়ো হয়ে থাকবে। সঙ্কেত পেলেই তারা ঘর ছেড়ে পরিত্যক্ত বেতুইওয়ারা ভেড়ীর হোগ্‌লা বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু খবর্দার ! দলপতির নির্দেশ ছাড়া তারা যেন কেউ কিচ্ছুটি না করে।

আশ্চর্য অনুমান বলরামের। রাত ঠিক বারোটার সময় শত্রুদের পনের-ষোল জনের একটি দল কিষ্টবাবুর ভেড়ীর বাঁধ দিয়ে কালীবাবুর ভেড়ীর পুব-পাড় দিয়ে গাঁয়ে ঢুকল। বলরামের বন্দোবস্তের ফলে সারা গাঁয়ে একটিও ব্যাটাছেলের দেখা পেল না শত্রুপক্ষ। বিফল মনোরথ হয়ে তারা দু' জন দু'জন করে সার বেঁধে ফিরে গেল খৈতুইওয়ারার মাঝের বাঁধ ধরে। তারা জানতেও পারল না যে যাদের জন্য তারা এসেছিল তারা তাদের থেকে মাত্র আট দশ হাত দূরেই হোগলা বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র আছে; তারা ইচ্ছে করলে ঐখানে ঐ সময়ে ভেড়ীর তলায় পচা কাদার মধ্যে তাদের বসবাসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিতে পারে।

সবাই নিরাপদে পার হয়ে গেল। শুধু সকলের পিছনের দুটি হতভাগার ঘাড়ের উপর কারা ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং তারা এতটুকু চীৎকার করার আগেই পাকানো গামছা এসে তাদের মুখ বন্ধ করে দিল।

এত নিকট দিয়ে শত্রুরা যাচ্ছে; অনেকেরই হাত নিস্‌পিস্‌ কোরছিল, কিন্তু কিছু করার উপায় ছিল না। দলপতির কড়া আদেশ, তার নির্দেশ ছাড়া কেউ হাতের আঙুলটাও বাঁকাতে পারবে না।

শত্রুপক্ষ নিরাপদ দূরত্বে চলে চলে গেলে সকলে বেরিয়ে এসে বলরামকে ঘিরে ধরল।

'বলাদা, এটা তোমার কেমন কাজ হল গো? ওদের এটটু শিক্ষে দেওয়া হলনি,—ওদের আস্পদ্ধা তো আরও বেড়ে যাবে।'

বলরাম হেসে বলল, 'দ্যাখ্‌, মার ধর করাটা কঠিন কাজ লয়রে। এমন কি দু' চারটে খুন-জখম করাও কঠিন লয়। কিন্তুক জের সামলানোটা তার চেয়ে খুব কঠিন। মোরা গরীব নোক; হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ মোরা করতে পারবনি।'

যে দুটি লোককে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন চেনা বেরিয়ে পড়ল। সে কিষ্টবাবুর ভেড়ীর কর্মচারী। প্রথমটায় তো সে কিছুই বলবে না, শেষে হৃৎপিণ্ড বরাবর শড়কিটা তাক্‌ করে এবং হাত দু'খানা দু'জনে দু'দিক থেকে মুচ্‌ড়িয়ে ধরার পর সে মুখ খুলল। তার মুখ থেকে যা শোনা গেল তাতে সবাই তাজ্জব হয়ে গেল।

মরেলডাঙ্গার ইজারাদার নটবরবাবু নাকি বিকেলবেলাই কিষ্টবাবুর কাছে এসেছিলেন। ওদের গাঁ আক্রমণ করতে হলে তাঁর লোকজনকে কিষ্টবাবুর ভেড়ীর উপর দিয়ে যেতে হবে। তাই কিষ্টবাবুর সম্মতি আদায় করার জন্য তিনি এসেছিলেন। তা, একজন সম-ব্যবসায়ীকে এইটুকু মাত্র সাহায্য করবেন তাতে তাঁর আপত্তি হবে কেন? তবে, তিনি পরামর্শ দিলেন, একবার জমিদার কাঞ্চন রায়ের সম্মতিটা নিয়ে নিতে পারলে তাঁদের উভয়ের পক্ষেই কাজটা অনেক পাকা হবে।

কাঞ্চন রায়ের বাড়ীর পথটি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য লোকটি গিয়েছিল নটবরবাবুর সঙ্গে। সেখানে জমিদার আর নটবরবাবুর মধ্যে যে কথা হয় তা সে বাইরে থেকে আড়ি পেতে শুনেছিল। অত বড় বড় লোক—তাদের গলাও তো তেমনি বাজখাঁই! তা দেখা গেলে ওদের বিরুদ্ধে জমিদারেরও অভিযোগ নেহাৎ কম নয়। অনেক খেদের সঙ্গেই তিনি নাকি বলেছেন যে তিনি ওদের অনেক উপকার করেছেন; কিন্তু প্রতিদানে এমন কি তাঁর বাক্যি পর্যন্ত তারা মান্য করে না। ওদের উৎপাতে বেতুইওয়াড়া ভেড়ীর এমন বদ্‌নাম হয়েছে যে ইজারা নেওয়ার জন্য খদ্দের পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা নাকি তাঁর নায়েবকেও খুন করেছে। এতো সবের পরেও ওরা নাকি আব্দার ধরেছে ওদের প্রত্যেককে দশ বিঘা করে জমি দিতে হবে। ওরা নাকি অকূলে ভেসে যাচ্ছিল; তিনি ওদের জায়গা দিয়ে সাহায্য-পত্তর দিয়ে বসিয়ে এখন চুরির দায়ে ধরা পড়েছেন!

নিজের ভেড়ী রক্ষা করার জন্য যদি নটবরবাবু বজ্জাতগুলোর বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার দরকার বোধ করেন, তবে তাতে জমিদার আপত্তি করবেন কেন? কারবারীর দুঃখ তিনি বোঝেন। তবে কথা এই যে আজে-বাজে লোককে দু'চারঘা দিয়ে কোন লাভ নেই। মারলে মারতে হবে পালের গোদাগুলোকে, যেমন বলরাম, নবীন, কালা, যজ্ঞেশ্বর। মারটা যেন পোষা বেড়ালকে যেমন আদর করে চাপড়ান হয় তেমন না হয়। দু'একটা যদি নিকেশ হয়ে যায় তো ভাবনা সেই, তিনি আছেন পিছনে।

লোকটিকে কেষ্টবাবুর অনুমতি নিয়ে নটবরবাবু দলের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন পালের গোদাদের বাড়ীগুলো চিনিয়ে দেওয়ার জন্য।

নবীন বলল, ‘শুন্‌লে বলাদা? মোরা আরও ভাবতেছিলাম বাবু বাউস খালিতে দু'হাজার বিঘে জমি মামলায়জিতে নিলে স্রেফ ফোকটের উপরে, এবারে মোদের জমিটা মিলতে পারে। বাবু তো ত্যাখন সেই কথাই বলেছিলেন।’

কালা বলল, ‘তা মোদের লাশ পোড়ানোর জন্যি জমি তো বাবু দেবেই কী বল যজ্ঞেশ্বরকা’? বাবুর য্যাখন এত ইচ্ছে ত্যাখন যাই মোরা সার সার করে বিছানায় মরে পড়ে থাকি গে।’

সকলের মুখ উত্তেজনায় থম্ থম্ কোরছে। আশা-ভঙ্গের দুঃখটা যেন উত্তেজনায় ইন্ধন জুগিয়েছে।

বলরাম যেন খুব বিস্মিত বা দুঃখিত হল না। এই জমিদারকে তারা হাতে ধরে সিংহাসনে বসিয়েছিল বলে তাঁর উপর তাদের একটা দুর্বলতা ছিল। তিনি তাদের ভাল করবেন এমন বিশ্বাসও ছিল। কিন্তু তারপর জল অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছে। অনেক ঘটনার ভিতর দিয়ে সে বুঝেছে, এরা কখনো দেয় না, শুধু লোভ দেখায়—গরীব মানুষকে বোকা পেয়ে ভুলিয়ে রাখার জন্য। জমিদার দেখেছিল বটে একজনকে রানাঘাটে। আর একজন তেমন জমিদারকে দেখতে পাওয়ার জন্য সে অনেক জমিদার মহাজন বড় কারবারীর দরজায় দরজায় ঘুরেছে। তেমনটি আর মেলেনি ; মেলার আশাও নেই।

লোকটিকে বলরাম ছেড়ে দিল এই শর্তে যে সে যে ধরা পড়েছিল এ কথা গোপন রাখতে হবে।

পরদিন সকাল বেলা ভাগবতবাকা এসে বলরামকে জাগিয়ে তুলল। রাত-জাগা চোখ নিয়ে বলরাম মাদুরটা বিছিয়ে দিল।

মাদুরে বসে ভাগবত বলল, ‘তারপর বলা, তুইও শেষতক্ ঐ চোরেদের সঙ্গে জুটলি? এতে তোর কি ভাল হবে?’

‘তাছাড়া আর কী করব বলদিনি ভাগবতকা’? জাওলা মাছ, ভগমানের দেওয়া মাছ, মোদের ছেলে ছোকড়ারা দু'একটা ধরে থাকে। তার জন্যে ওরা মারধর করবে, দাঙ্গা হাঙ্গাম করবে, এ কেমন কথা?’

ভাগবতের একটু রাগ হলেও বুঝিয়ে বলল, ‘ভগমানের দেওয়া মাছ হলেও ও'দের জায়গার তো বটে। সে মাছ ধরলে চুরি করা হবেনি?’

'তা ছাড়া, বুঝলে ভাগবতকা'—বলরাম একটু ভেবে বললে, 'তোমার মত অত সুক্ষু ন্যায্য অন্যায্য বিচের করে গরীব নোকে পারবেনিকো। আর দশজনে যা করে, ন্যায্য হোক অন্যায্য হোক, তার সঙ্গে থাকা ভাল। কথায় বলে, দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ; দশজনে মিলে নরকে যতি যেতে হয় তো তাতেও সুখ আছে।'

ভাগবতকাকা বুঝল, আর একজন হতভাগ্যের সামনে স্বর্গের দুয়ার চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল একটা।

বলরাম আবার বলল, 'তাছাড়া বুঝলে ভাগবতকাকা, সৎ হলে তাতে ওদের নাভটা বেশী হয়, কিন্তুক ওরা মোদের আধ পয়সার সুবিধেও বেশি দেয় না। তবে আর সৎ হয়ে নাভ কি? পরলোক তো অ্যানেক দূরে।'

ভেড়ীতে গিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার পর কিষ্টবাবু ডেকে পাঠালেন বলরামকে। কিষ্টবাবু আগের রাত্রে ভেড়ীতেই ছিলেন।

বলরাম আসতেই বললেন, 'তোকে কাজে জবাব দিলাম, বলরাম। তুই হারামজাদা চোরদের সঙ্গে জুটেছিস, দাঙ্গা-হাঙ্গাম করেছিস। কে তোকে বিশ্বেস করে কাজে রেখবে?'

'কাজে জবাব দাও তাতে আমি খুশি আছি। কিন্তুক গালমন্দ করেবেনি তা'বলে বলে দিচ্ছি।'

'গালমন্দ করবে না, পূজো করবে। তুই একটা পাজিব পা-ঝাড়া!'

বলরাম তেমনি শান্ত গলায় বলল, 'দ্যাখো কিষ্টবাবু। তোমার ই কারবারটা মোরা হাতের জোরে ডাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম। তা মনে রেখবে, কারবারটা চল্‌তেছে মোদের দয়ায়। মোরা যতি অন্যর'ম ইচ্ছে করি, তো তোমাকে চাকৃতি বাকতি গুটিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে হবে।'

'বটে? থানা পুলিশ নেই বুঝি?'

'বাবু, তার আগে তোমার বছরে লাখ টাকা আয়ের কাজটা ছাড়তে হবে। মোদের আর কী করবে? জেলে দেবে? তা জেলের মামারা চাড্ডি চাড্ডি ভাত তো না দে' পারবিনি।'

কথাটা বুঝলেন কিষ্টবাবু। দিন কতক আগে বেতুইওয়াড়া ভেড়ীতে যা

হয়েছিল সে কথা মনে পড়ল। বিকেলে বেলা বলরামকে আবার ডাকিয়ে এনে কাজে পুনর্বহাল করতে লজ্জায় অপমানে মাথা কাটা গেল। পায়ের জুতোর সুখতলার সামিল বলে যাদের মনে করেন, তাদের হুমকি যদি মেনে চলতে হয় তো তার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি আছে? সরকারের অক্ষমতাকে মনে মনে ধিক্কার দিলেন কিষ্টবাবু।

দিন তিনেক পরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে জরুরী ওয়ারেণ্ট বলে গাঁয়ের থেকে দশ বারো জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল পুলিস। কিন্তু তাদের হাজতে থাকতে হল মাত্র একটি বেলা। বিকেলেই, আশ্চর্য, জমিদারের নায়েব এসে জামীন দাঁড়িয়ে তাদের খালাস করে আনলেন। কিন্তু অন্যান্যবারের মত তবু এবার যেন জমিদারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কেউ গদগদ হয়ে উঠল না।

পরদিন প্যায়দা এসে জানালো জমিদার-বাড়ীতে সালিশ-নিষ্পত্তির জন্য সভা বসবে কাল সকালে। তারা যেন যায় সকলে। মরেলভাঙ্গার নটবর বাবুও আসবেন। তারা একটা অন্যায় কাজ করেছে বটে; কিন্তু বিপদে আপদে জমিদার যদি তাদের না দেখেন, তবে আর কে দেখবে? প্রজা যদি কুপুত্র হয় তা বলে জমিদার তো আর কু-পিতা হতে পারেন না।

ইতিমধ্যে বেতুই গাঁয়ের একেবারে ভরা-ভরতি অবস্থা। গাঁয়ের বিপদের কথা শুনে নিধু এসেছে, কানাই এসেছে, যারা যারা কাজে কর্মে বাইরে ছিল, সবাই এসেছে। এমন কি সকলকে অবাক করে দিয়ে রাধা পর্যন্ত এসেছে। বলেছে, অটবী তো নেই, তাই 'পিতিনিধি' হিসাবে তাকে আসতে হল।

পরদিন সকালবেলা সদলবলে বলরাম জমিদারের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। গড়িয়া স্টেশনের কাছাকাছি এসে, আশ্চর্য, দেখা হয়ে গেল অটবীর সঙ্গে অটবী তক্ষুনি ট্রেন থেকে নেমে সবে বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়েছে।

অটবী তো শুধু বিদেশে কাজে গিয়েছিল, ফিরে এল, তাই নয়। অটবী যে একেবারে চলে যাচ্ছে বলে বেরিয়েছিল। অটবীকে পাওয়া মানে হারানো মাণিক ফিরে পাওয়া। সকলের মধ্যে একটা আনন্দের জোয়ার খেলে গেল। প্রত্যেকে একে একে কোলাকুলি করল অটবীর সঙ্গে।

বলরাম বলল, 'ভাগ্যিস্ মোদের সঙ্গে তোর দেখা হয়ে গেল অটবী! না'লে

আজ তোর হাড় গোড় ভাঙত। যেতিস্ তো সেই মরেলডাঙ্গার ভেড়ীর বাঁধ দে।'

'কেনগো? গেলে কী হত?'

'ওদের সঙ্গেই তো মোদের হাঙ্গাম চলতেছে।

গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে অটবীও চলল জমিদার বাড়ী। বরাবর সে এমনি করে যায় দলপতি হিসাবে। আজ সে গাঁয়ে নেই, গাঁয়ের লোকেরা তবু অনাথ হয়ে যায়নি। আজকে দলপতি হয়েছে বলরাম।

জমিদারের বৈঠকখানায় ঢুকতেই জমিদার আর সকলকে ঘর থেকে বার করে দিলেন। তিনি তেমনি তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে বসে, হাতে গড়গড়ার নল। গদির উপর আর এক পাশে বসে আছেন নটবরবাবু।

তারা খালি বেঞ্চিটার উপর বসতে যেতেই জমিদার রাগে ফেটে পড়লেন।

'খবর্দার। বস্‌বিনি ওখানে! চুরি করবি, দাঙ্গা হাঙ্গাম করবি, আমার নাম ডুবাবি আবার রাজাসনে বসার সখ! ভুঁয়ের উপরে বোস্ সব বোস্।'

কেউ আর বেঞ্চির উপর বসল না। কিন্তু মাটীতেও কেউ বসতে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল।

'কী-রে—বস্‌বিনি মাটীর উপর?'

বলরাম বলল, 'না।'

'জমিদারের সামনে মাটীতে বসতে তোদের মান খোয়া যায়? দেখ্‌লেন নটবরবাবু, ছোটলোকের আস্পর্দ্ধা কেমন বেড়েছে আজকাল? তারপর বল্ তোরা, দারোয়ানকে ঠেঙিয়েছিস্, ভেড়ীর কর্ম্মচারীদের মেরেছিস্—এ-সব কী শুনছি, বল্? কার জমিদারীতে বাস করিস বলে মনে কোরছিস্‌রে?'

বলরাম নিরুত্তেজ অথচ স্পষ্ট গলায় বলল, 'আজ্ঞে কত্তাবাবু, আপনার জমিদারীতে বাস কোত্তেছি। মোরা জানি, আপনার জমিদারীতে বাঘে গরুতে এক পুকুরে জল খায়। কিন্তুক আপনিই বিচের করুন—জাওলা মাছ ভগমানের দেওয়া মাছ; তা মোদের ছেলে-ছোকড়ারা বড়শি দে দুটো একটা ধরে থাকে। তা'বলে দারোয়ান তাকে মারবে?'

'চুরি করলে মারবে নি? তা দারোয়ান মেরেছিল তো তোরা নটবরবাবুর কাছে নালিশ করতে পারতিস্! জানিস্ তো, ইনি সাক্ষেৎ মহাদেব!'

'ওরা নিরীহ পানুকে মারধর করল। ওরা রাতের বেলা গাঁয়ের উপর হামলা করল।'

জমিদার উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিলেন। চিরকাল তিনি দেখেছেন, চোখ গরম করে রাগারাগি করলে এরা তৎক্ষণাৎ দোষ স্বীকার করে পায়ের উপর এসে পড়ে। আজ এদের হল কি?

'তা এখন কী করবি? ইনি তো ফৌজদারী ঠুকে দিয়েছেন! আমি ছাড়িয়ে না আনলে এতক্ষণ তো হাজতে থাকতিস্ বাছাধনেরা!'

বলরাম তেমনি অকম্পিত গলায় বলল, 'আজ্ঞে কত্তাবাবু, সবই তো আপনার কাজ। ওরা আতে হামলা করল, তাও আপনার কাজ। ওরা নালিশ করল, তাও আপনি করিয়েছেন। আপনি ছাড়িয়ে আনবেন না তো কে আনবে?'

আজ এদের হল কি? চিরকাল এদের রক্ষকের ভুমিকায় অভিনয় করে এদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। এবার কি চারপো কলি পূর্ণ হয়েছে? না কি এদের পিছনে কালাচাঁদটা আছে? সেইরকম একটা কথা শুনেছেন বটে তিনি। কথাই আছে, মেড়া কোঁদে খুটির জোরে!

রাগে গা জ্বলে গেল জমিদারের, অথচ এদের সঙ্গে আপোষ তাঁকে করতেই হবে। কালাচাঁদের খপ্পরে তিনি এদের কখনোই পড়তে দিতে পারেন না।

প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক বাগ্‌বিতণ্ডার পরে আপোষ হ'ল। ওদের ছেলে-ছোকড়ারা বড়শিতে জাওলা মাছ ধরলে তাদের কেউ মারবে না। কিন্তু তারা যেন যথাসাধ্য ছোক্‌ড়াগুলোকে সামলিয়ে রাখে। মরেলডাঙ্গার বাঁধ দিয়ে তারা বিনা বাধায় গড়িয়া যাতায়াত করতে পারবে। আর নটবরবাবুও মোকদ্দমা তুলে নেবেন।

অটবীর উপর চোখ পড়তেই জমিদারকে কেমন ক্রুদ্ধ দেখিয়েছিল। তবে তিনি মোলায়েম করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে এলি অটবী।'

'এজ্ঞে, আজকেই।'

জমিদারের সেই মুখখানা দেখে অটবীর মনে হল, সবারই মনে হল, এ-আপোষ কোন স্থায়ী আপোষ নয়। এ শুধু উভয় পক্ষ থেকেই সাময়িক দম নেওয়া মাত্র। জমিদারের সঙ্গে শেষ বোঝা-পড়ার দিন তাদের আস্‌ছে সামনে।

বাইরে বেরিয়ে এসে অটবী বলরামের হাত ধরল। এর আগে একবার সে বলরামকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিল; কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল, সে বন্ধুত্বটা নিছক মুখের। তাদের দু'জনের মনের মাঝখানে সেদিন ছিল আকাশ-প্রমাণ ফাঁক। আজ মনে হল, বলরাম তার প্রকৃত বন্ধু হয়েছে,—সেই ফাঁকটা বুজে নিরেট নিখাদ সোনা হয়ে গিয়েছে।

তার ধারণা ছিল, তাদের গাঁয়ে প্রকৃত মানুষ বলতে কেউ নেই। তারা যে-কেউ লোভে বা ভয়ে অনায়াসে প্রভু-জাতির পা পর্যন্ত চাটতে পারে। তারা ভেড়ীওলাদের মাছ চুরি করে শুধু লোভে পড়ে'; ভেড়ীওলাদের অন্যায় লাভের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রতিবাদ হিসাবে নয়। সে ছিল, তা-ই বিভিন্ন সময়ে সে প্রভু-জাতির আস্ফালনের সামনে নিজেদের মান সম্মান খানিকটা বজায় রাখতে পারত।

কিন্তু অনেকদিন সে ছিল না; তার গাঁয়ের লোকেরা তাই বলে প্রভু জাতির পায়ের কাদা হয়ে যায় নি। প্রভু জাতির রক্ত-চক্ষুর সামনে তারা আগের মতই, হয়তো আগের চেয়েও শক্ত ভাবে, মাথা তুলে রুখে দাঁড়িয়েছে। যে চিন্তাটাকে এতকাল সে তার একার নিজস্ব চিন্তা বলে মনে করে এসেছে, তাতে তার বিরক্তির, ক্লান্তির অবধি ছিল না, আজ দেখল, সে চিন্তা তার একার নয়। আশ্চর্য, তাদের গাঁয়ের সবাই বরাবর একইভাবে চিন্তা করে এসেছে, অথচ সে শুধু তা জানত না। তাদের জাতির লোকদের এইটেই বিশেষত্ব, তারা একইরকম ভাবে, একইরকম চিন্তা করে, একইরকম কাজ করে। এ শুধু আজ বলে নয়। যুগ যুগ ধরে তাদের জাতির মানুষদের গভীর অন্তরাত্মার নিচে একটা ঐকতানের সুর বয়ে চলেছে। এই ঐকতানের সুর তাদের কর্মে জুগিয়েছে আনন্দ, তাদের দুঃখে জুগিয়েছে সান্ত্বনা, তাদের রক্ষা করেছে বিপদে-আপদে, আর, তাদের সবার মাঝখানে গড়ে তুলেছে এক অচ্ছেদ্য ভালবাসার সেতু।

একদিন সে একটি নরহত্যা করেছিল। নিরঞ্জনবাবুর নেতৃত্বে সোনারপুরের লোকেরাও করেছিল। এ দু'এর পার্থক্য আজ যেন সে একটু একটু বুঝতে পারছে।

প্রভু-জাতির সঙ্গে নিরন্তর বিরোধই হল তাদের অস্তিত্বের মূল শর্ত। এই বিরোধ চলে তাদের চুরি-চামারির মধ্যে, দরদস্তুরির মধ্যে, চাকরি-বাকরির মধ্যে, এমন-কি পাইকার হিসাবে তাদের কেনা-বেচার মধ্যে, এমন কি তাদের নিজস্ব পারিবারিক সমস্যায়, আবার সময়ে বা প্রকাশ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামায়! ভিন্ন আকারে এই বিরোধ চলেছিল তাদের বাপেদের আমলে। তারও আগে, তাদের ঠাকুর্দাদের আমলে। ভিন্ন আকারে এই বিরোধ চলবে তাদের ছেলেদের জীবনে, তার পরে নাতিদের জীবনে, তার পরে প্র-নাতিদের জীবনে। এ-বিরোধের শেষ নেই, যেমন শেষ নেই জীবনের। এই বিরোধে তাদের শক্তির উৎস এইখানটায় যে তারা একই ভাবে চিন্তা করে, একই ভাবে কাজ করে। ঐকতানের সুরটা অবিশ্যি মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়; তখনই বিপত্তি সৃষ্টি হয়;—যেমন হয়েছিল তার জীবনে। তখনই দেখা দেয় সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রভু-জাতির বিরুদ্ধে তাদের সহজাত ঘৃণা ঘুরে এসে আঘাত করে নিজের জাতের লোকদের।

কিন্তু এমন কেন হয়? কেন এমন করে মাঝে মাঝে তাল কেটে যায়? এ কাজ কার? এ কি কারও চরিত্রের ত্রুটি? এ কি ভগবানের লীলা? এ কি মানুষের কারসাজি?

গাঁয়ের দিকে ফিরে যেতে যেতে অটবী অবাক হয়ে চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। চন্‌চনে রোদ উঠেছে আকাশে। গাছ-পালা, মাঠ, বাড়ীঘর, সব যেন বসে গিয়েছে সেই রোদে চান করতে। মাঠে মাঠে ধান গাছগুলো আধ শুকনো হয়ে এসেছে। গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ে' একে অন্যের সঙ্গে জড়াজড়ি হয়ে গিয়েছে। আর সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে আধ-পাকা ধানের শীষগুলো এখন স্পষ্ট চেনা যায়। মাঠের আলের উপর দিয়ে, ভেড়ীর বাঁধের উপর দিয়ে তাদের যাওয়ার পথ। পথের মধ্যে মাঝে মাঝে এখনো কাদা শুকায়নি। দু'এক জায়গায় বর্ষার তোড়ে সেই যে বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে এখনো তা মেরামত করা হয়নি। হয়তো একখণ্ড বাঁশ পাতা রয়েছে ভাঙা জায়গাটায়

উপর দিয়ে যাতায়াতের সুবিধার জন্য। সমস্তই সেই অতি-পরিচিত দৃশ্য, অতি পুরাতন ব্যবস্থা। এমন অভ্যাসের সামিল হয়ে গিয়েছে এই রাস্তা ওদের কাছে যে বোধকরি কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে দিলেও ওরা অনায়াসে আন্দাজে পা চালিয়ে চালিয়ে বাড়ীতে গিয়ে উঠতে পারবে।

অত্যন্ত পুরাতন, পরিচিত পৃথিবীকে মাত্র ছ'মাসের ব্যবধানের পর আজ নতুন বলে মনে হচ্ছে অটবীর চোখে। পুরোন মাকে আজ যেন সে নতুন করে ফিরে পেয়েছে। মায়ের স্নেহ-সজল মুখখানি অভ্যাসের একঘেঁয়েমীতে যেন চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল। আজ কিছুদিনের অদর্শনের পর মাটীর সমস্ত পরিচিত বাহ্য রূপকে অতিক্রম করে তার স্নেহার্দ্র হৃদয়টিই যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে অটবীর কাছে।

আহার দিয়ে, বাসস্থান দিয়ে আলো-বাতাস দিয়ে আর সহস্র অদৃশ্য উপায়ে রস-সঞ্চার করে এই পৃথিবী তাদের বাঁচিয়ে রাখে। এই মাটী-মা-কে অবজ্ঞা করে, অস্বীকার করে, দূরে চলে যাওয়া মানুষের কাজ নয়। তুমি সাময়িকভাবে দূরদেশে যেতে পার, কিন্তু চিরকালের জন্য মাটী-মাকে পরিত্যাগ করে তুমি পালিয়ে যাবে, এ চিন্তা অমানুষিক।

কত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষের জীবন এগিয়ে চলে। নিজেকে, নিজের জগৎকে ভাঙতে-ভাঙতে গড়তে-গড়তে চলতে থাকে মানুষের অবারিত পথ-চলা। এই পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তন যোগাযোগের সেতু রচনা করে রাখে আমাদের পৃথিবী। তাই-তো দীর্ঘ অদর্শনের পর পুরোন বন্ধুকে দেখেই আমরা চিনতে পারি। তাইতো বিশ বছর ত্রিশ বছর পিছনের দিকে দৃষ্টি দিয়েও সেই বহু আগের অর্বাচীন আমির সঙ্গে আজকের আমির একত্বকে অনুভব করতে পারি। সেইজন্যই মানুষ বদ্‌লায়, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালবাসার মৃত্যু নেই। সেই ভালবাসার সঙ্গে পৃথিবীর অনির্বাণ ভালবাসা মিশে গিয়ে এক অখণ্ড ঐক্যের সূত্র রচিত হয়।

শত পরিবর্তনের ভিতরেও এই ভালবাসার বন্ধনটিকে অটুট রাখতে হবে। একবার যদি এই বাঁধন ছেঁড়ে তবে পৃথিবীর অজস্র হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা আর স্বার্থপরতার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। সেই নীচতার

মধ্যে তোমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে, কুঁকড়ে, ক্লিষ্ট মৃতপ্রায় হয়ে পড়বে। একদিন অটবীর জীবনে যে তাই হয়েছিল। ভালবাসার সূত্রটি হারিয়ে গিয়েছিল, আর জীবন-যাপনের রাশি রাশি ক্লেদ তার সারা দেহ-মনকে প্লাবিত করে দিয়েছিল।

নিজের ঘরের মানুষদের সঙ্গে ভালবাসার স্থির বিন্দুটি অব্যাহত থাকলে তবেই জীবনের ক্ষেত্রে সঠিক কর্ম-পন্থার সন্ধান পাওয়া যায়। জীবনে হয়তো হিংসাদ্বন্দ্ব আছে; হয়তো তা অপরিহার্য বেঁচে থাকার জন্য এবং নিজের মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য। কিন্তু আর এক মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা তোমার জীয়ন-কাঠি নয়, নিজের মানুষের প্রতি ভালবাসা ই তোমার জীয়ন-কাঠি।

একদিন অটবী ভুলে গিয়েছিল এই সত্য। সেদিন এই জীবন হয়ে গিয়েছিল রুক্ষ মরুভুমি; শুধু প্রাণহীন নয়, প্রাণ যেন যন্ত্রণার সামিল হয়ে গিয়েছিল। আর কোনদিন যেন অটবীর তেমন ভ্রান্তি না হয়।

এদিকে পায়ে পায়ে তারা গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে। কথা-বার্তা চলছে থেমে থেমে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে অটবী। মন আজ ভরে গিয়েছে অটবীর। আজকে কথা বলার দিন নয়, অনুভব করার দিন।

'কালার একটি ছেলে হয়েছে।' বলরাম বলছিল।

এর আগে কালার দু'টি মেয়ে হয়েছিল, একটি ছেলের বড় সখ ছিল কালার। কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় অটবী খবরটা পেয়ে ভারী খুশি বোধ করল।

'বেশ বেশ! একটি ছেলের জন্য বড্ড আকিংক্ষে ছেল কালার।' অটবী বলল।

খানিকপরে কার কার খবর নেওয়া হয়নি ভাবতে ভাবতে যজ্ঞেশ্বরের কথা মনে পড়ে গেল। অটবী জিজ্ঞেস করল,

'যজ্ঞেশ্বরকা' ভাল আছে বলাদা?'

বলরাম ইতস্তত করে বলল, 'আছে। তবে তার বড় দুঃখু। ছেলে দুটি মানুষ হলনি ;—তাকে তেইড়ে দিয়েছে বাড়ী থেকে।'

'সে কি ? তবে এখন আছে কোথায় যজ্ঞেশ্বরকা ?'

'সেই উত্তুরের পড়ো ভিটেতে একখানা চালা তুলে লিয়েছে।'

বাইরের স্বার্থপরতা তাদের ঘরে এসে আঘাত করেছে, অটবী ভাবল। অনেক কাজ আছে তার গাঁয়ে। নিজেদের নিজেদের মধ্যে যে ঝগড়া, বিবাদ ছোটলোকোমি চলছে তাকে সে আস্তে আস্তে জয় করতে চেষ্টা করবে। প্রত্যেকে যাতে প্রত্যেকের অনিষ্ট চিন্তা ভুলে ইষ্ট চিন্তা করে সেই মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। গাঁয়ে অটবীর অনেক কিছু করার আছে।

গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে তারা পরস্পরের থেকে ছাড়াছাড়ি হল। নিজের বাড়ীতে যখন পা দিচ্ছিল অটবী, তখন তার মন প্রসন্ন, পরিপূর্ণ।

কত মাস ধরে মানুষের হাত পড়েনি অটবীর বাড়ীতে,—লক্ষ্মীছাড়ার মত চেহারা হয়েছে বাড়ীর। বাড়ীর আঙিনা আগাছায় ভরে গিয়েছে। দু'খানা ঘরের একখ্যানাও আর অভগ্ন নেই। তা হোক। মানুষের হাত পড়লে দু'দিনের মধ্যেই এ-বাড়ী আবার ঝক্‌ঝকে তকতকে হয়ে উঠবে।

নিধু ছিল বাড়ীতে। বাড়ীতে সে এখন থাকে না,—গাঁয়ের গোলমালের খবর পেয়ে এসেছে। বাড়ীতে মেয়েছেলে নেই ; নিধু নিজেই রান্না-বান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অটবীর সাড়া পেয়ে এক লাফে উঠানে নেমে এল। এক মুখ হেসে কথা বলার আগে ঢিপ্ করে প্রণাম করল একটা অটবীকে।

'আজ কী সুখের দিন!—মামা এসেছ? ঈশ্! কতকাল দেখি না তোমাকে!'

অটবী নিধুকে রান্না-বান্নায় হাতে হাতে সাহায্য করতে চেয়েছিল। নিধু কিছুতেই রাজী হল না। অগত্যা অটবী ঘরখানাকে একবার ঝাড় দিয়ে একটু পরিষ্কার করে নিয়ে দাওয়ায় এসে বসল একটা জলচৌকি পেতে। ফাঁকে ফাঁকে নিধুর সঙ্গে আলাপ চলতে লাগল।

নিধুর সঙ্গে আলাপ করে কিন্তু অটবী তেমন খুশি হতে পারল না।

নিধু কশবার এক লোহা-ঢালাই-এর কারখানায় কাজ করে। গাঁয়ের লোকদের প্রতি রক্তের টান অনুভব করে বলে সে বিপদের কথা শুনে গাঁয়ে ছুটে এসেছে। কিন্তু সারাটা সময় সে কাটাল তাদের কারখানার মিস্ত্রিদের গল্প করে। একজন সাধারণ মিস্ত্রি আশী-নব্বই টাকা মাইনে পায়; একজন ওস্তাদ মিস্ত্রি অনায়াসে দেড়শো টাকা অবধি মাইনে পায়,—ঠিক একজন ভদ্রলোকের সমান রোজগার। কাজেই তাদের লাইনে মিস্ত্রি না হতে পারলে সুখ নেই। মিস্ত্রি হওয়া অবিশ্যি সোজা কাজ নয়! কাজ শেখানো না শেখানো মিস্ত্রিদের মর্জি। তাদের মর্জি পাওয়ার জন্য তাই কর্মচারীরা তাদের পিছনে জোঁকের মত লেগে থাকে। তাদের রেষ্টুরেণ্টে খাওয়ায়, সিনেমায় নিয়ে যায়। ভারী ঝামেলার ব্যাপার! নিধুকেও করতে হয় এ সব কিছু কিছু বাধ্য হয়ে।

নিধুর অনর্গল বকুনির মধ্যে একটু ফাঁক পেয়ে অটবী বলল, 'একবারটি গোপার কাছে যা নিধে। মোর মনে লিচ্ছে, বেচারার কোন দোষ নেই। তুই মিছে সন্দ' করেছিস্।'

নিধু অমনি গাই-গুঁই সুরু করল।

'তাই তো মামা। কালকেই কারখানায় জয়েন করার কথা আছে।'

নিধু যে একটি অপরিচিত ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করল তা অটবীর কান এড়াল না।

'তাতে কিরে? আজই চলে যা না। কাল সকালবেলা ফিরে এস্‌বি।'

'সেই তো মামা। মোটে চল্লিশটে টাকা পাই মাসে। মিস্তিরি শালার পেছনে যাচ্ছে দশটাকা উড়ে। ত্রিশ টাকায় দু'জনার চলবে? এ তো গৈ-গাঁ লয়, কোলকেতা শহর!'

'লিয়ে আয় বৌটাকে। তা'পর ও-ও একটা কাজ-টাজ জুটিয়ে লিবে।'

নিধু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল।

'তবেই হয়েছে মামা! কোলকাতার মাগীরা কি কাজ-কম্মো করে! তাদের শুধু ফষ্টি-নষ্টি! কোলকেতাটা তো পাড়াগাঁ পাওনি মামা!'

অটবী বুঝল, একটা অসম্ভব আশার স্বপ্নে নিধুর চোখ বিভোর হয়ে আছে। ঘর, সংসার, বৌ, সব তার চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়েছে।

'তবে অন্ততক একবারটি দেখা করে আয় মেয়েটার সঙ্গে।'

'দেখি মামা। তবে সেইটেই দেখি চেষ্টা করে।'

কিন্তু অটবী বুঝল, নিধু যাবে না। গোপার কথা ভেবে অটবী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

বিকেল অবধি অটবী অপেক্ষা করল, কিন্তু রাধা ফিরে এল না। রাধা বোধকরি তবে বাজার থেকে একেবারে তার নতুন ডেরায় গেছে। অগত্যা অটবী বের হল রাধার খোঁজে। কোথায় থাকে জেনে নিল গাঁয়ের লোকদের থেকে।

ঢাকুরিয়ার রেল-লাইন পার হয়ে নির্দিষ্ট বস্তীতে এসে অটবী রাধার দেখা পেল না। তবু ভাগ্য ভাল, জিজ্ঞেস করতে করতে একজনের কাছে রাধার খবর খানিকটা পাওয়া গেল। অপেক্ষাকৃত শস্তায় অপেক্ষাকৃত ভাল ঘর পেয়ে রাধা নাকি কশ্‌বার কোন্ একটা বস্তীতে চলে গিয়েছে। কোন্ বস্তীটা সঠিক জানা না গেলেও কশ্‌বায় গিয়ে অটবী ঠিক রাধাকে খুঁজে বার করতে পারবে। কটা আর বস্তী আছে কশ্‌বায়!

সেখান থেকে বেরিয়ে অটবী রাস্তায় নেমে একটু দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কোন্ পথ ধরে যাবে। এমন সময় অটবীর মনে হল, রাস্তার ও-পাশের অল্প একটু দূরের একখানা ঘরের জানলা দিয়ে একটি ভদ্রঘরের মেয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভদ্রলোকের মেয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে এ-কথা বিশ্বাস করতে না পেরে অটবী ইতস্ততঃ করতে লাগল। হাতখানা কিন্তু অধ্যবসায়ের সঙ্গে ঠিক অটবীকে লক্ষ্য করেই যেন ডাকছে। আশে-পাশে তাকিয়েও অটবী আর কাউকে দেখতে পেল না যাকে ও হাতখানার পক্ষে ডাকা সম্ভব। তবে বোধকরি মেয়েছেলেটি তাকেই ডাকছে। ঘরে কোন পুরুষমানুষ নেই, অথচ জরুরি কোন দরকার পড়েছে। তাই ডাকছে। খুব সামান্য কোন কাজ হলে অটবী হয়তো করে দিতে পারে। কিন্তু কোন ভারী কাজ হলে বাপু অটবী স্রেফ 'না' করে দেবে; অটবীর অত সময় নেই।

জানলার কাছে এসেও অটবী মেয়েটিকে চিনতে পারে নি ; মেয়েটির নির্দেশে যখন সে ঘরের পাশের পথটা ধরে দরজার দিকে গেল তখন গলার স্বর শুনেও সে মেয়েটিকে চিনতে পারে নি। যখন ঘরের ভিতর ঢোকার পর মেয়েটি হাসল, তখন সেই হাসি শুনে অটবী পরীকে চিনতে পারল।

এমন আচম্কা-ভাবে অটবীকে পেয়ে পরীর মনের, মুখের, সে যে কী অবস্থা তা বুঝিয়ে বলা যায় না। অদ্ভুৎ ভাবে নিঃশব্দে হাসল পরী, সেই হাসিতে আগ্রহ, আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি সব-কিছু ছিল। অথচ হাসি সত্ত্বেও তার চোখ-দুটো কেমন ছল-ছল করতে লাগল।

কী যে বলবে পরী, অটবীকে নিয়ে কী যে করবে তা যেন সে ভেবে পাচ্ছে না। শেষে অটবীর হাত ধরে অতি যত্নের সঙ্গে তাকে শোভন ছাপড় খাটের উপর পাতা বিছানায় বসাল।

'এস, বস অটবী। কী! লজ্জা কত্তেছে নাকি? এমন বালাই তো ছিলনি তোমার কোনদিন!'

তারপর একটু থেমেই আবার বলল, 'ঈশ্! কতকাল পরে তোমাকে দেখলাম, কতকাল!'

বলেই তার মনে হল, শেষের কথা কয়টাই আগে বলা উচিত ছিল এবং উল্টোপাল্টা কথা বলেছে ভেবে আরও ঘাব্ড়িয়ে গেল। এমন ভাবে তাকিয়ে রইল অটবীর দিকে যেন দেখা তার কোনদিনই শেষ হবে না।

বিছানার উপর বসে পড়ে অটবী একটু হাসল। সে হাসিতে যে বিদ্রূপ মিশানো ছিল পরী তা বুঝল না।

'বেশ ভালই তো আছ দেখতে পাচ্ছি, পৈরী।'

তীক্ষ্ণ পরীক্ষকের দৃষ্টিতে অটবী পরীকে দেখছিল। বিলাস, আরাম এবং পরিতৃপ্তির ছাপ পড়েছে পরীর প্রতি অঙ্গে অঙ্গে। আগের চেয়ে একটু মোটা হয়েছে ; মাংসপেশীগুলো বিশ্রাম পেয়ে অনেক কোমল হয়ে গিয়েছে ; রদ্দুরে পুড়ে পুড়ে গায়ের রঙে যে তামাটে ভাবটা দেখা দিয়েছিল তা চলে গিয়ে রঙটা আরও উজ্জ্বল আরও ফরসা হয়ে উঠেছে ; মুখের চামড়ায় কঠোর পরিশ্রমের যে রুক্ষ দাগগুলি ছিল তাও আয়াসে এবং প্রসাধনে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দামী

তাঁতের শাড়ী পরেছে পরী, চুল বেঁধেছে খোঁপা করে, হাতে-গলায় সোনার গয়না দিয়েছে। প্রথমে ভদ্রলোকের মেয়ে বলে যে মনে হয়েছিল পরীকে,— ঠিকই হঠাৎ দেখলে তাকে ভদ্রলোকের মেয়ে নয় বলে মনে করার কোন উপায়ই নেই। অবিশ্যি ভাল করে লক্ষ্য করলেই পার্থক্যটা বোঝা যায়। চাল-চলনে কথা-বার্তায়, সাজ-পোষাকে ভদ্রলোকের মেয়ের যে সূক্ষ্ম খানদানির ছাপ থাকে, তা কোথায় পাবে চাষীর ঘরের মূর্খ মেয়ে পরী! লোম-ওঠা দাঁড়কাক ময়ূরের পুচ্ছ পরলেই কি ময়ূর হয়ে যায়?

অটবীর কথায় পরী আহত হয়ে বলল, 'ভাল আছি? এমন ভাল যেন আমার শত্তুরও থাকে না কখনো!'

'তা কী হয়? তোর শত্তুর যদি এত ভাল থাকবে তবে তোকে হিংসে করবে কে?'

পরী এবার হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ফেলায় অটবীর সেই আগেকার পরীর কথা মনে পড়ে গেল :

'তুই সেই আগের মতই আছিস্ অটবী। তেমনি কাটা কাটা কথা বলতেছিস্! কথা থাক। মোকে নে' চল আজই। এক্ষুনি। এখানে মোর যেন নিশ্বাস বয় না।'

অটবী দেরী করে ধীরে ধীরে বলল, 'যাবি যে, মোর ঘরে কিন্তুক এমন চাপড় খাট নেইকো, এমন পোষাক-আসাকও নেই।'

পরী রেগে বলল, 'তোর ঘর মোকে লতুন চেনাবি, লয়?'

'লতুন করেই তো চিনতে হবে তোর। মুনিষটা লতুন হয়েছিস্, পুরোনো কথা মনে থাকবে কেন?'

পরীর এবার সন্দেহ হল, অটবী নিছক ঠাট্টা কোরছে না।

'তুই মোর উপর আগ করেছিস্ অটবী? কেন? মোর কী দোষ? বড়বাবু মোকে জোর করে ধরে নে' এইচে সে-দোষ মোর লয়!'

'দোষের কথা কে বলতেছে গো? বড়বাবু কত আরামে রেখেছে। এত সুখ কে দিতে পারে?' অটবীর মুখ গম্ভীর, কথাগুলো বলছে, যেন ধারালো তীর ছুঁড়ে দিচ্ছে পরীর গায়ে।

পরী রেগে বলল, 'খুব সুখ দেখতেছিস্ বুঝি মোর, অটবী? এইরকম চিনেছিস্ তুই মোকে? জানিস্, চোখের জল না ফেলে কোনদিন আমি খাই না? জানিস্, বড়বাবু জোর না করলে এই বিছানায় কখনো শুইনি, মাটীতে শুই? এখানে শুতে গেলেই তোর কথা মনে পড়ে আর কান্না পায়!'

অটবী অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, মেয়েমানুষ কী আশ্চর্য অভিনয় করতে পারে! পরী এমন চমৎকারভাবে কথাগুলো বলছে যে যে-কোন সাধারণ লোকের কাছে মনে হবে, কতই না আন্তরিকতা ওর কথায়!

'বড়বাবুর উপরে এর মধ্যে তোর অরুচি ধরল পৈরী?'

পরী এগিয়ে এসে অটবীর দু'খানা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে নিয়ে ব্যাকুল ভাবে বলল, 'ও সব কথা থাক অটবী। মোকে তাড়াতাড়ি নে' চল। বড়বাবু টের পেয়ে গেলে যাওয়াই বন্ধ করে দেবে। বড় সাঙ্ঘেতিক লোক!'

'মোর মনে অত সখ নেইকো পৈরী। বেশ সুখে আছি, মোকে বেশি বিরক্ত করিসনি।'

কেন অটবী এমন ব্যবহার কোরছে পরী কিছুতেই ভেবে পেল না। কোন অন্যায় কথা বলেছে সে এই অল্প সময়ের মধ্যে? আর অন্যায় কিছু বলে থাকলেও অটবী কি পরীকে চেনে না?

শেষে মনে হল অটবী হয় তো তার উপর অভিমান করেছে। সেটা স্বাভাবিক। তার দেহের উপর অটবীর যে কামনা ছিল সে দাবী সেদিন সে মেটায় নি। কী করে মেটাবে? সেদিন যে তার ঘর ছিল, ঘরে ছিল তার আশ্রয়দাতা। তারপর একদিন কী করে কে জানে তার স্বামীর ঘর ভেঙে গেল। এক অসহায় বেড়াল ছানার মত সে বড়বাবুর খপপরে এসে পড়ল। কিন্তু বড়বাবুর কাছে তো সে নিজেকে বিকিয়ে দেয়নি। বড়বাবু তাকে দখল করেছেন গায়ের জোরে। সে দোষ কি তার?

তাই বলে সে কি পচে গেছে? কই বড়বাবুর সঙ্গে আছ বলে সে তো তার মনে এতটুকু পরিবর্তন অনুভব করতে পারে না। এই বড়লোকী জীবনের প্রতি তার না আছে এতটুকু মোহ, না আছে এতটুকু আসক্তি। সে আবার তার

আগের জীবনে ফিরে যেতে চায়। অটবী যদি তাকে গ্রহণ করে, তবে অটবীর সঙ্গেই সে আবার সংসার গড়বে। খেটে-খুটে সুখে-দুঃখে সংসার চালিয়ে নেবে। পাঁচজনকে ভালবাসবে, পাঁচজনের ভালবাসা পাবে।

অটবীকে সে যে পূরো মনে গ্রহণ করতে চাইছে তা কি অটবী বিশ্বাস করছে না? নাকি অটবীর অভিমান হয়েছে, সে অভিমানটা ভাঙা দরকার? বেশ, নিজেকে সে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে অটবীর অভিমান ভাঙবে।

পরী গিয়ে অটবীর পাশে গা ঘেঁসে বসল। তাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের উপর একটা চুমু খেল। অটবী তবু যেন কাঠ হয়ে বসে, যেন তামাসা দেখছে। কেন? অটবী তবে কি আরও বেশী চায়? পরী তার গা ধরে আকর্ষণ করে বলল, 'আর কি চাস্ অটবী? বল্, দ্যাখ, তোকে মোর না দেওয়ার কিছু নেই।'

অটবী আর সহ্য করতে পারল না। বিদ্যুৎ-গতিতে দাঁড়িয়ে উঠে শুধু বলল, 'ছেড়ে দে মোকে। শিগগির! বেশ্যা!'

তারপর জোর করে পরীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

যে পৃথিবীতে পরী নেই সে-পৃথিবীতে কি মানুষ থাকে না? থাকে। অটবীর পরী মুছে গিয়েছে তার জীবন থেকে। তবু অটবী বেঁচে থাকবে সমাজের মধ্যে। মানুষের মধ্যে সে থাকবে, মানুষের সঙ্গে সে মিশবে। মানুষের কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে সে কাজ করবে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে রাগে দুঃখে অটবীর চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে আসতে চাইল। এই মেয়েটাকে সে কোনদিনই চিনতে পারল না। ওর জীবনে মেয়েটা এল উল্কার মত। প্রাণ যেন বন্যা হয়ে নেবে এল, আর ভেঙে চুরমার করে দিল ওর মনের ভারসাম্য। কিন্তু যখনই মেয়েটা সম্পর্কে যাই সে মনে করেছে, দেখেছে মেয়েটা তার বিপরীত। একবার ভেবেছিল, পরী একটা নষ্ট মেয়েমানুষ। কিন্তু দেখল, সে নষ্ট তো নয়ই; তাকে নষ্ট করাও সম্ভব নয়, ভারী শক্ত সে। একবার ভেবেছিল, সে বুঝি তাকে প্রকৃতই ভালবাসে কিন্তু দেখল তার মন তার অত্যাচারী স্বামীর কাছেই পড়ে আছে। আবার

একবার ভেবেছিল, সে সতীলক্ষ্মী ভদ্দর লোকদের ঘরের মেয়েদের মত। কিন্তু দেখল, সে এক বড় লোকের ঘরের অতি নীচ-জাতীয়া রক্ষিতা।

পরীকে দেখে অটবীর মনে হল সে তারই কলঙ্কিত অতীতের একটা অংশ। সেই অতীতে সে একটি নরহত্যা পর্যন্ত করেছিল। মনে হল, অতীতটাকে সে ভুলে যেতে চাইছে, কিন্তু অতীত তার পিছনে পিছনে ছুটছে।

তা ছুটুক। তবু আজ সে এগিয়ে চলবে সামনের দিকে। তার আর তার সঙ্গীদের মধ্যে যে ঐকতানের সুরটি বইছে আজ সে তার সন্ধান পেয়েছে।

যে-পৃথিবীতে পরী নেই, সে-পৃথিবীতে কি মানুষ বাস করে না?

সারাদিনের রৌদ্র-স্নাত স্নিগ্ধোজ্জ্বল আকাশে তখন স্তরে স্তরে মেঘ জমেছে। আশ্বিনের আসন্ন শীতের হ্রস্ব দিনের বিকাল এরই মধ্যে ছায়া-ঘন হয়ে এসেছে।

অটবীর অপরাধ-কুণ্ঠিত মনেও তখন বেদনা-ঘন ঘন-নীল মেঘের ছায়া নেমেছে স্তরে স্তরে।

সকালবেলার রৌদ্র-স্নাত পৃথিবীতে অটবী অনুভব করেছিল তার অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা অবসানের পর মেঘে-ঢাকা সন্ধ্যেবেলায় তার মনে হল এর মধ্যেই সেই অন্তর অনেকখানি খালি হয়ে গিয়েছে। চকিতের জন্য একবার ইচ্ছে হল আবার সে কাকদ্বীপেই ফিরে যাবে। খেঁদীর মার আঁচলের আশ্রয়ে বাকি জীবনটা পালিয়ে পালিয়ে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু না, তা হয় না। গাঁয়ের মাটীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে সে শপথ নিয়েছে, আর কখনো নিজের জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে না।

সে ধরে নিয়েছিল, বিকৃত চিন্তার দ্বারা চালিত হয়ে একমাত্র সে-ই বুঝি বিকৃত পথে চলে গিয়েছিল। গাঁয়ের লোকদের আর সকলেই মোটামুটি শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে, একমাত্র সেই পড়ে গিয়েছিল নর্দমায়। নিধুকে আর পরীকে দেখে এখন সে বুঝতে পারছে, পরিবর্তনের ঝড় আর সকলের জীবনের উপর দিয়েও সমান বেগেই বয়ে চলেছে। ঝড়ের দারুণ ঝাপটার মুখে দাঁড়িয়ে আসল সামলিয়ে রাখা বড় সহজ কাজ নয়।

সকালবেলায় ভেবেছিল, যাদের মনে ক্লেদ জমেছে, যাদের গায়ে সহরের স্বার্থপরতার ছোঁয়াচ লেগেছে, তাদের সে টেনে তুলবে। টেনে ফিরিয়ে আনতে পারবে কি সে নিধুকে? নিধুর নামটা মনে আসতেই অটবীর মন বিরূপ হয়ে উঠল। এক অসম্ভব মরীচিকার আকর্ষণে অন্ধের মত নিধু ছুটে চলেছে। তার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান এখন একটি বেশি-মাইনের চাকরি জোগাড় করা। তার অত ভালবাসার বৌ তার কাছে মিথ্যে হয়ে গিয়েছে; সংসার, ধর্ম সব তার কাছে এখন তুচ্ছ। এই সাঙ্ঘাতিক বিষকে যে কী করে টেনে উপড়িয়ে ফেলা যায় তার মন্তর তো জানা নেই অটবীর।

পরীকেই কি ফিরিয়ে এনে সুস্থ জীবনের সন্ধান দেওয়া যায়? নামটা মনে আসতেই দারুণ ঘৃণায় অটবীর মনটা সঙ্কুচিত হয়ে এল। একদিন ছিল যেদিন অটবীর মনে জান্তব ভাবটাই প্রধান ছিল। পরীকে সেদিন সে অল্প দামে কিনে নিতে চেয়েছিল। আর একদিন সে রামচন্দ্রের স্বর্ণ-সীতার মত অনায়ত্ত পরীর একটি আদর্শ মূর্তি তৈরী করে দেবীর আসনে বসিয়েছিল। কিন্তু দেখতে পেল, পরী সত্যি অল্প-দামের মেয়ে। সেদিন পরী নাগালের বাইরে ছিল, কিন্তু তার সারা অন্তর জুড়ে ছিল পরী। আজ পরী নাগালের মধ্যে; কিন্তু তার এত বড় মনের মধ্যে পরীর জন্য একবিন্দু স্থানও আর অবশিষ্ট নেই। তার অন্তর খালি হয়ে গিয়েছে, খাঁ খাঁ করছে; তবু সে ফাঁকা জায়গায় পরীকে এনে বসানো অসম্ভব। যে বিচ্ছেদ মনের, সে বিচ্ছেদের কি কোন সীমা আছে? পরীকে বাদ দিয়েই জীবনকে তার গড়ে তুলতে হবে।

[কিন্তু জীবনের কাজ যে মূর্তি ভাঙার কাজ। মানুষের ঠুনকো আদর্শকে ঢেলা মেরে ভেঙে খান খান করে দেয় যে তার নাম জীবন। এই সত্য অটবী জানতে পারবে কবে?

জীবনের দুই ভিন্ন খাদ ধরে তাদের জীবন বয়ে এসেছে—অটবীর আর পরীর। ভিন্ন জীবন-ধারার ভিন্ন যুক্তি-শাস্ত্র তাদের চরিত্রকে, প্রকৃতিকে, চিন্তাধারাকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলেছে। মাঝে মাঝে তারা উভয়ের নিকটবর্তী হয়েছে। পরস্পরের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়েছে প্রকৃতিগত একাত্মতার জন্য। কিন্তু পরস্পরকে তারা বুঝে উঠতে পারেনি কোনদিনই। তারা পরস্পরকে

ভালবেসেছে, আবার আঘাতও দিয়েছে, আবার ভালবেসেছে। সাধারণ মেয়ে হলে হয়তো পরী ভালবাসার কাছে আত্মসমর্পণ করে সুখী হতে পারত। কিন্তু পরী ব্যক্তিত্বশালিনী, নিজের স্বকীয়তাকে হারিয়ে ফেলা তার পক্ষে অসম্ভব। আপন মনের অহঙ্কারে সেদিন সে জীবনে একনিষ্ঠাকে পরম মূল্যবান বলে মনে করেছিল। অটবীর আক্রমণকে সে প্রতিহত করেছিল, কারণ অটবী ডাকাত নয়। কিন্তু ডাকাতের হাতে একদিন তার দর্প চূর্ণ হয়ে গেল। সেদিন অতি দুঃখের মধ্যে, জীবনের চরম লাঞ্ছনার মধ্যে পরী আবিষ্কার করেছিল, সে লাঞ্ছিতা, পরী তবু পরীই আছে। তবু সে সুন্দর করে জীবনকে গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখে। সমস্ত লাঞ্ছনা অপমানের উপরে সত্যি, সে জীবনকে ভালবাসে। ভালবাসে সেই দারিদ্র্য-মলিন পরিশ্রম-ক্লান্ত তাদের নিজস্ব স্বাধীন জীবন ধারাকে। সেদিন সে অটবীর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য তৈরী হয়েছে। কিন্তু অটবী তখন কোথায়? ভিন্ন জীবন-যাত্রার যুক্তিতে অটবীর ধ্যান-ধারণা আজ ভিন্ন খাদে বইতে শুরু করেছে।

আজ পরী তার পরের দেওয়া ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে অঝোরে কাঁদছে। হারাণো মাণিক এত কাছে এসে ফিরে গেল এ-দুঃখের সান্ত্বনা মিলবে কোথায়? আর মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অটবী নিজেকে ভাগ্যবিধাতার আসনে বসিয়ে পরীর জন্য শাস্তি-বিধান রচনা কোরছে!

অটবী জীবনকে ফিরে পেতে চায় তার নিজের শর্তে। হায়! জীবন যে কোন শর্ত মানে না!]

নিধু আর পরীর কথা ভাবতে ভাবতে অটবীর মন যখন খুব খারপ হয়ে গিয়েছিল, তখন আবার তার মনে পড়ল বলরাম-কালা-নবীনদের কথা। তাদের মধ্যে সে অনেক নতুন বন্ধু লাভ করেছে। সকাল বেলার প্রথম উচ্ছ্বাসে যে ঐক্য-বন্ধনের মধ্যে সমস্ত আপন জনকে সে দেখতে পেয়েছিল, বিকেলের পরিমার্জিত চিন্তায় সে ঐক্যবন্ধনকে নিশ্ছিদ্র মনে হল না। তা হোক্। সব ভাল বোধ করি জীবনে কখনো পাওয়া যায় না। প্রিয়জনের পদস্খলনের ব্যথায় বুক যদিও টন টন কোরছে, তা করুক. তবু যা সে অনেক দুঃখে ফিরে পেয়েছে অটবী তা আর হারাতে রাজী নয়।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক অটবী কখন যে গাঁয়ের দিকে চলতে সুরু করেছিল সে-খেয়াল তার ছিল না। অনেক দূর চলে এসে হঠাৎ তার মনে পড়ল। তাই তো, যার উদ্দেশ্যে সে বেরিয়েছিল তার খোঁজ না করেই সে যে ফিরে চলেছে! কাজ যে বাকি রয়ে গেল,—রাধাকে খুঁজতে হবে যে।

অটবী থমকে দাঁড়ালো। তখন গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। একবার ভাবল, বৃষ্টিও পড়ছে, আজকের মত বাড়ী ফিরে গেলে কেমন হয়? রাধার খোঁজে না হয় আর একদিন বের হওয়া যাবে।

মনে দারুণ ভয়। পরী যেমন করে হারিয়ে গিয়েছে, রাধাও যদি তেমনি করে হারিয়ে গিয়ে থাকে?

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অটবী অনেকক্ষণ ইতস্তত করল। যারা বৃষ্টির ভয়ে এদিক-ওদিক দৌড়িয়ে পালাচ্ছিল তারা অবাক হয়ে অটবীকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তারপর একসময় অটবীর মনে পড়ল, ভয় দেখে পালিয়ে যাবে, অটবী নামক লোকটি তো তেমন ধাতু দিয়ে গড়া নয়। রাধার খোঁজে তাকে যেতে হবে। আজই।

ক্লান্ত ভারী পা নিয়ে অটবী আবার ঘুরে দাঁড়াল। তখন মোটা মোটা ফোঁটায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে।

কলকাতা,
পৌষ, ১৩৬২—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

—শেষ—